শ্রেয়সী

মাসিক পত্র

সম্পাদিকা—শ্রীকিরণবালা সেন

নব বৎসরে করিলাম পণ
লব স্বদেশের দীক্ষা
তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
হে ভারত লব শিক্ষা।

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা বৈশাখ, ১৩২৯ সাল

সূচনা

এই পত্রিকা খানির নাম অনেকেরই ভাল জানা আছে। এই নামটি পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে শ্রীমতী হেমলতা দেবীর উদ্যোগে ছোট মেয়েদের একটী সাহিত্য সভা ছিল। সেই সভার ছোট মেয়েদের লেখা এবং বড় মেয়েদেরও কিছু কিছু লেখা লইয়া ১৩২৪ সালে শ্রেয়সী প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেক দিন এই পত্রিকা খানি বাহির হয় নাই। এতদিন পরে শ্রেয়সী নূতন করিয়া পুনরায় প্রকাশিত হইতেছে।

আগাগোড়া নিত্য নিয়ত আপনাকে সজীব সতেজ রাখা অল্প সাধনার কথা নয়। যে সব কাগজ চিরাদন নিয়মিত প্রকাশিত হইয়া আপন অপারামত জীবনা শাক্তর পরিচয় দিয়া আসিয়াছে তাহাদের মত সৌভাগ্য ও সামর্থ্য ইহার নাই। তেমন কীর্ত্তি ও যশ দাবী না কারয়াই ইহা বাহির হইতেছে।

কতক গাছ আছে যাদের পাতা সারা বৎসর নবীন ও সবুজ থাকে। আবার এমন অনেক গাছও আছে যাহা দুর্দ্দিনে,

শ্রেয়সী

মাসিক পত্র

সম্পাদিকা—শ্রীকিরণবালা সেন

নব বৎসরে করিলাম পণ
লব স্বদেশের দীক্ষা
তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
হে ভারত লব শিক্ষা।

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩২৯ সাল

সূচনা

এই পত্রিকা খানির নাম অনেকেরই ভাল জানা আছে। এই নামটি পুজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে শ্রীমতী হেমলতা দেবীর উদ্যোগে ছোট মেয়েদের একটী সাহিত্য সভা ছিল। সেই সভার ছোট মেয়েদের লেখা এবং বড় মেয়েদেরও কিছু কিছু লেখা লইয়া ১৩২৪ সালে শ্রেয়সী প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেক দিন এই পত্রিকা খানি বাহির হয় নাই। এতদিন পরে শ্রেয়সী নূতন করিয়া পুনরায় প্রকাশিত হইতেছে।

আগাগোড়া নিত্য নিয়ত আপনাকে সজীব সতেজ রাখা অল্প সাধনার কথা নয়। যে সব কাগজ চিরদিন নিয়মিত প্রকাশিত হইয়া আপন অপারমিত জীবনী শক্তির পরিচয় দিয়া আসিয়াছে তাহাদের মত সৌভাগ্য ও সামর্থ্য ইহার নাই। তেমন কীর্ত্তি ও যশ দাবী না করিয়াই ইহা বাহির হইতেছে।

কতক গাছ আছে যাদের পাতা সারা বৎসর নবীন ও সবুজ থাকে। আবার এমন অনেক গাছও আছে যাহা দুর্দ্দিনে;

শ্রেয়সী

সব ফুল ফল পাতা ঝরাইয়া দিয়া দুর্ভাগ্য প্রাণহীনের মত কোনো মতে দিন কাটায়, অকস্মাৎ বসন্তের বায়ুতে নূতন প্রাণের স্পর্শে তাহার জীবনের পরিচয় টুকু দিয়া নবজীবনের দেবতাকে প্রণামটী করিয়া লয়। আমাদের এই পত্রিকাটী আজিকার শুভ দিনের প্রাণপ্রদ সমীরণে পুনরুজ্জীবিত হইয়া নবজীবনের দেবতাকে আপনার প্রণামটুকু জানাইতেছে। ধনীর গৃহের মত ঐশ্বর্য্য বা আড়ম্বর প্রকাশ করিবার মত ভাগ্য ও ইহার নয়। রাজপুরীতে যেদিন দীপালীর মহোৎসবে নানা মহামূল্য ঝাড়লণ্ঠন জ্বলিতেছে, আতস বাজির ধুমধাম চলিতেছে, সেদিন পল্লীবধূ সন্ধ্যার শুভ মুহূর্ত্তে আপন সামান্য মাটীর ক্ষুদ্র কল্যাণ-দীপ খানি দেব মন্দিরের দ্বারে বা তুলসী মঞ্চের নীচে বা নদীর তীরে রাখিয়া গলবস্ত্র হইয়া সকলের কল্যাণে ভূমিনত প্রণাম করিয়া সন্ধ্যার ক্ষণটী পবিত্র করেন। সারারাত্রি জ্বালাইয়া রাখিবার মত তৈল-সমৃদ্ধি ও হয়তো তাঁর নাই তবু সকলের চির কল্যানের জন্য প্রণাম করিবার মত ভক্তি তাঁর আছে। এই যে সকলের শ্রেয়োবুদ্ধির প্রার্থনা এই শ্রেয়সীর সম্বল। বাহিরের সমৃদ্ধি যতই কম হউক ইহার অন্তরের কল্যাণ কামনা কাহারও অপেক্ষা কম নহে, তাই প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত সব অবস্থাতেই সকলের জন্য ইহার কল্যাণ প্রার্থনা টুকু অব্যাহত আছে ও থাকবে।

এই আশ্রমে যে কয়টী মেয়ে আছেন তাঁহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ যাহাতে ঘনিষ্টতর হয় এবং আত্মীয়তার যোগ দৃঢ়তর হয় ইহাই সকলের ইচ্ছা ছিল, এই সঙ্কল্পেই দুইবৎসর যাবত শ্রীমতী প্রতিমাদেবীর প্রস্তাবে একটী সম্মিলনী এখানে স্থাপিত হইয়াছে। মেয়েদের এই সম্মিলনীতে আলাপ আলোচনা আমোদ প্রমোদ সব কিছুরই ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা আছে। এই সম্মিলনীর নাম আলাপিনী। কিন্তু এই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই এই সম্মিলনীটি আর আবদ্ধ থাকিতে পারিতেছে না। বাহিরের সঙ্গে ইহার একটী যোগ স্থাপনার প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। আকাঙ্ক্ষাটি বড় অথচ ইহার সামর্থ্য অল্প তাই অতি সঙ্কুচিত ভাবেই ইহাকে অগ্রসর হইতে হইবে।

নববর্ষের প্রথম পুণ্য দিনে আবার এই শুভ কামনা লইয়া শ্রেয়সী আপন কর্ত্তব্যে হাত দিল। এই শুভ দিনে সকলের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। সকলের সম্মিলিত শুভ ইচ্ছা ও বিধাতার আশীর্ব্বাদই ইহার একমাত্র সম্বল। এই পাথেয়ের বলে ইহাকে নানা অসুবিধার মধ্যে চলিতে হইবে। বিধাতার আশীর্ব্বাদ ইহার উপর বর্ষিত হউক। ইহার ঐশ্বর্য্য, গৌরব, ও শোভা যতই ক্ষীণ হউক না কেন ইহার সংকল্প যেন কখনও হীন না হয়। দৈন্যে কখনো লজ্জিত না হইয়াও কল্যাণ ও সেবার নিত্য জাগ্রত থাকিবার মত শক্তি ইহার থাকে মঙ্গলময়ের কাছে ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীকিরণবালা সেন।

পথহারা

১

আজকে আমি কত দূরে
যে গিয়ে ছিলেম চলে,
যত তুমি ভাবতে পারো
তার চেয়ে সে অনেক আরো,
শেষ করতে পারব না তা'
তোমায় বলে 'বলে'।

২

অনেক দূর সে আরো দূর সে
আরো অনেক দূর।
মাঝ খানেতে কত যে বেত,
কত যে বাঁশ কত যে ক্ষেত
ছাড়িয়ে ওদের ঠাকুর বাড়ী
ছাড়িয়ে তালিমপুর।

৩

পেরিয়ে গেলাম যেতে যেতে
সাত কুশী সব গ্রাম।
ধানের গোলা গুন্‌ব কত
জোদ্দারদের গোলার মত,
সেখানে যে মোড়ল কা'রা
জানিনা তার নাম।

৪

একে একে মাঠ পেরলুম
কত মাঠের পরে!
তার পরে উঃ, বলি, মা. শোন
সামনে এল প্রকাণ্ড বন
ভিতরে তার ঢুকতে গেলে
গা ছম্‌ ছম্‌ করে!

৫

জাম তলাতে বুড়ি ছিল,
বল্‌লে "খবরদার"!
আমি বল্লেম বারণ শুনে
"ছ-পন কড়ি এই নে গুনে!"
যতক্ষণ সে গুন্‌তে থাকে
হয়ে গেলাম পার।

৬

কিছুরি শেষ নেই কোথাও
আকাশ পাতাল জুড়ি।
যতই চলি যতই চলি
বেড়েই চলে বনের গলি,
কালো মুখোস্‌ পরা আঁধার
সাজে জুজু বুড়ি।

৭

খেজুর গাছের মাথায় বসে
দেখ্‌চে কা'রা ঝুঁকি।
কা'রা যে সব ঝোপের পাশে
একটু খানি মুচ্‌কে হাসে
বেঁটে বেঁটে মানুষ গুলো
কেবল মারে উঁকি।

৮

আমায় যেন চোখ টিপ্‌চে
বুড় গাছের গুঁড়ি।
লম্বা লম্বা কা'দের পা যে
ঝুলছে ডালের মাঝে মাঝে
মনে হচ্ছে পিঠে আমার
কে দিল সুস্‌সুড়ি।

৯

ফিস্‌ ফিসিয়ে কইচে কথা
দেখতে না পাই কে সে।
অন্ধকারে দুদ্দাড়িয়ে
কে সে কারে যায় তাড়িয়ে
কি জানি কি গা চেটে যায়
হঠাৎ কাছে এসে।

১০

ফুরায় না পথ ভাবচি আমি
ফিরব কেমন করে'
সাম্‌নে দেখি কিসের ছায়া,—

ডেকে বলি "শেয়াল ভায়া,
মায়ের গাঁয়ের পথ তোরা কেউ
দেখিয়ে দেনা মোরে।"

১১

কয়না কিছুই, চুপ্‌টি করে'
কেবল মাথা নাড়ে।
সিঙ্গিমামা কোথা থেকে
হঠাৎ কখন্ এল ডেকে,
কে জানে, মা, হালুম করে
পড়ল যে কার ঘাড়ে।

১২

বল্ দেখি তুই, কেমন করে
ফিরে পেলেম মাকে?
কেউ জানে না কেমন করে',—
কানে কানে বল্‌ব তোরে?—
যেম্‌নি স্বপন ভেঙে গেল
সিঙ্গিমামার ডাকে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রুদ্র বৈশাখ।

বৈশাখের বৈলক্ষণ—

আহারে অরুচি, শয়নে অতৃপ্তি, কর্ম্মে ক্লান্তি, পঠনে ঢুলুনি, পানে আসক্তি, জীবনে অভক্তি।

বৈশাখী শীতলা ভোগ—

পরিপক্ক সজিনাখাড়া, তেজহীন নির্ব্বিষ মরীচ, অথাদ্য অপক্ক কুষ্মাণ্ড। বীজভরা নির্গুণ বেগুন—কলহ প্রিয়া বর্ষীয়সীর ন্যায় তিক্ত, নীরস ও দুষ্পাচ্য।

রৌদ্র তপ্ত দ্বিপ্রহরে—

নয়ন-বিদ্ধকারী প্রাণ মন-হারী চরাচর-বিনাশী খর রৌদ্র। বিটপীকুঞ্জে 'ঘুঘু'র করুণস্বর ও নিস্তব্ধ গৃহে মক্ষিকার গুঞ্জন। সহসা অদূরে উড্ডীয়মান চিলের হৃদয়-বিদারক চিঁহি স্বরে ধ্যান-মৌন মধ্যাহ্নের তন্দ্রা ভঙ্গ।

জলহীন জলাশয়ের পঙ্ক-অঙ্কে নিমজ্জিত অর্দ্ধ নিমীলিত-নেত্র স্থূলকায় মহিষরাজ।

সরসী-তটে মৎস্য-সন্ধানী সুচতুর বৃদ্ধ বকের সুখ-তন্দ্রা উপভোগ।

ধূলাচ্ছন্ন বিশ্ব, অবসাদমগ্ন চিত্ত। অনন্ত অগ্নি প্রবাহে অসহ্য গাত্রদাহ।

তপ্ত অঙ্গে সিক্ত বসন-প্রয়োগ ও সঘন সশব্দ তালপত্র-বীজনে কিঞ্চিৎ উপশম।

ধীর সন্ধ্যা-সমীরে—

স্নেহ-ময়ীর স্নেহ-কর স্পর্শে মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চার। মলয়-স্পর্শ-সুখ-কাতর জর্জ্জর তনু; ধরণী-অনুরাগ-রাগ রঞ্জিত বসন প্রান্ত শ্বাসরুদ্ধ-বদ্ধগৃহে ফিরিয়া শেষে প্রাণান্ত হা হন্ত!

গভীর নিশীথে—

নিদ্রার আবেশে, মশকের সকরুণ গুণ্ গুণ্ গীত শ্রবণে অধীর আনন্দাবেগে চটাপট্ তাল সংযোগে অভিনব তাল লয়ের সৃষ্টি

বিনিদ্র রজনী অবসানে—

আঁখি ঢুলু ঢুলু, নিদ্রালস তনু।
"বদন মলিন, ক্লান্ত চরণ মন উদাসীন"

চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত।

দারুণ দুঃখে সুগভীর সান্ত্বনা—

কাঁচা আমের ঝোল, কলায়ের দাল, পান্তা ভাত।: দগ্ধ আম্রের তরল সুধা।

দুরন্ত ঝড়ে পড়ন্ত আম্র সংগ্রহ। ইতি
আম পড়ে টুপ্ টাপ্
বুড়ি খায় গুপ্ গাপ্"।

সুরসাল জ্যৈষ্ঠ

জৈষ্ঠের ফলার—

বীচে খেঁড়ো, হাজা পটল, দড়িশাক, টোকো পাকা আম।

রসালো জৈষ্ঠের ঘোরালো রসের অবতারণা—

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড অথচ আর সে 'বৈশাখী' রুক্ষ মূর্ত্তি নাই। ভৈরবের ভস্মকারী রুদ্র নেত্রে ঈষৎ জলের আভাস। রৌদ্র ঝলসিত নীল নভে জলদের সজল ছায়াপাত। মুক্তারাজি-নিভ স্বেদবিন্দু উদ্গমে, মানবের তাপিত শুষ্ক ত্বকে শীতল বারি সিঞ্চন।

গন্ধভারাক্রান্ত বায়ু হিল্লোলে—

হে মরুৎ মলয় পবন! এই ঘোর গ্রীষ্মে তোমার মৃদু সঞ্চালিত তীব্র মধুর হিল্লোল, নাসিকারন্ধ্রের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া ঘর্ম্ম গন্ধ-আকুলিত প্রাণকে একেবারে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে।

মেঘ দরশনে—

তৃষিত চাতক সম অনিমেষ নয়নে উর্দ্ধমুখে চাহিয়া দিন যাপন। "তাপিত শুষ্কলতা বর্ষণ যাচে যথা"।

গগন মণ্ডলের মেঘের সহিত বদন মণ্ডলের নিরন্তর ভাবের পরিবর্ত্তন। দিগন্তে মেঘ দেখিলে তাপক্লিষ্ট-মুখে হাসির অরুণাভা।

মেঘ অপসরণে—

হৃদয়াকাশ ঘন মেঘাবৃত, ললাটে গভীর চিন্তা-রেখা-পাত, অপ্রসন্ন ভ্রূকুটি, গম্ভীর আনন। এ যেন গগনে বদনে মেঘ ও রৌদ্রের কৌতুক খেলা!

নিদ্রাভঙ্গে অপরাহ্নে—

রক্তপানে সুপুষ্ট ছারপোকার অত্যাচারে দ্বিপ্রহর ব্যাপী সুদীর্ঘ নিদ্রা হইতে অকালে জাগিয়া, ঘর্ম্মাক্ত দেহে জীবনের অসারত্ব বোধ। হিম শীতল 'বরফ জল' এর জন্য বিদগ্ধ প্রাণের সতৃষ্ণ কাতরতা। শেষে সুস্নিগ্ধ সুকোমল তাল সেবনে বরফের দুঃখ উপশম করণ।

(সন্ধ্যা রাত্রে) তপ্ত শয্যায় উত্তপ্ত কল্পনা—

হে ধূম্রাবগুণ্ঠিতা, চক্রমুখরিতা কলিকাতা! আমরা মানস-নয়নের সম্মুখে তোমার কুজ্‌টিকার আবরণ ভেদ করিয়া মানব স্কন্ধারোহী-পেটিকা-বন্দী, কুলফি'র শুভ্র তুষার শৃঙ্গ উদয়ে, কলিতে গিরি-রাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলিয়া ভ্রম হইতেছে।

(মধ্যরাত্রে) মুমূর্ষুর বিলাপ—

কোন্ রাক্ষসীর মন্ত্রবলে, বক্ষ-স্পন্দন-রহিত-স্তব্ধ প্রকৃতি। দুঃশঙ্কাভীত বায়ু নিস্পন্দ, নিশ্চল। আহা! এ দুঃসময়ে বিদ্যুৎ-অন্তরাল বাসিনী, অনিল-সহচরী, কোথায় তুমি? তোমার সদা-লীলায়িত পক্ষে বসন্ত সখাকে বন্দী করিয়া মাথার উপরে, অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় একবার অবিরাম নৃত্য করিয়া যাও! অয়ি প্রাণ বিমোহিনি নটিনি! দেববাঞ্ছিত তোমার ঐ ক্ষিপ্র-লঘু-তড়িৎ-চরণের তালে তালে ভক্তের হৃদয়ে পুলকের উত্তাল তরঙ্গ তুলাও।

তোমার অঞ্চল-বায়ে মলয়বায়ের তুফান ছুটাইয়া তবপঙ্ক-তল-লীন নিদাঘ-পীড়িত হতভাগ্যদের নয়ন মুদ্রিত করিয়া দাও। গ্রীষ্মে তারা যেন পরম সুখে নাসিকা ধ্বনিতে গৃহতল কাঁপাইয়া তোমার পাদ-বন্দনা করিতে পারে, হে বরদে, প্রসন্ন হইয়া এই বর দাও।

মেঘ মেদুর আষাঢ়।

আষাঢ়ের সজীবাগ—

হাজা পটল, জোলো ঝিঙ্গে, পচা আলু, কোসো আমড়া।

• বাদল মেঘে—

ধূলি ধৌত সুচিক্কণ পত্র শোভিত বন রাজি। দূর বনের ভিজা গন্ধে, সজল বাতাসে উতলা মন।

কাব্য পাঠে নিমগ্না, উন্মনা, ষোড়শী—অধরে হাস্য নয়নে জল। অপর কক্ষে, তাস হস্তে, ছক্কা পঞ্জার দুরূহ সমস্যার মীমাংসা সাধনে ব্যাপৃতা, তন্ময় চিত্তা, সখী পরিবেষ্টিতা গৃহিনী—পিক্‌দানি শোভিতা, তাম্বুল রাগ রঞ্জিতা। কাগজের নৌকা ভাসাইতে তৎপর বালক দলের সফলতার জয়ধ্বনি ও উল্লসিত করতালিতে মুখরিত গৃহ প্রাঙ্গন। দীপালোকে, আধো আলো আধো ছায়ায়—শয্যাতলে জননীর বক্ষলগ্ন ঘুমন্ত শিশু। বাক্‌পটু স্নেহময়ী পিতামহীর আশ্চর্য্য কাহিনী শ্রবণে অঞ্চল নিবদ্ধ কৌতূহলী বালকের দুরু দুরু হিয়া। রূপকথার রূপকাঠির স্পর্শে সাগরের দুরন্ত তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল মন আজ শান্ত, সুপ্ত।

পতন মুখর রাত্রে—

ঘোর তিমিরাবৃত রজনী। গভীর সুপ্তি মগ্ন ধরণী। ঘরে বাহিরে মেঘ-মন্দ্র-রব—গৃহে নাসিকা, বাহিরে মেঘ। যদি কভু বজ্র নিনাদে সুখ নিদ্রার ব্যাঘাত হয় তবে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার নূতন উদ্যমে নাসিকা গর্জ্জন। মনে হয় এমন বাদল রজনী বিধি বুঝি কেবল নাক ডাকাইয়া ঘুমাইবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

শুধু বিঘোর ঘুম ঘোরে,
গরজে নাক, বড় জোরে,
বাঘের ডাক মানে পরাভব!
আঁধারে মিশে গেছে আর সব।

ভ্রয়োস্পর্শ।

Parables from Nature হইতে অনুবাদ

কফি ক্ষেতের উপর অস্তরবির সোনার আলো এসে পড়েছে। প্রজাপতি তার আলো ছায়ায় মেশানো সুন্দর ডানা দুটো মেলে কফি পাতার উপর এসে বসলো। তারপর অস্তোন্মুখ সূর্য্যের দিকে চোখ মেলে চেয়ে অসংখ্য ছোট ছোট গুটীপোকার জন্মদিয়ে সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই এ পৃথিবী ছেড়ে কোন এক অজানা দেশের উদ্দেশ্যে চলে গেলো। যাবার বেলায় কফিপাতার উপর যে গুটীপোকা চঞ্চল গতিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তাকে ডেকে বলে গেলো "বাছা আমার এই ছোট সন্তান গুলোর লালন পালনের ভার তোমার উপর দিয়ে যাচ্ছি। দয়া করে তুমি এদের একটু খোঁজ খবর নিও। আর বাছা একটা কথা বিশেষ করে বলে যাই, এদের সকাল বেলাকার স্নিগ্ধ শিশির আর সুকোমল ফুলের মিষ্টি মধু ছাড়া আর কিছু যেন খেতে দিওনা। তুমি যা খাও তা বাছা এদের সইবেনা। এ আমি নিশ্চয় তোমায় বলে যাচ্ছি"। প্রজাপতি বেশ নিশ্চিন্ত মনে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলো আর তার সন্তান গুলোর রক্ষণা

বেক্ষণের ভার দিয়ে গেলো তার মত এক অজ্ঞ গুটীপোকার উপর। এই ভেবে তো গুটীপোকার সে রাত্রিতে ঘুমই হলোনা। সে এই পৃথিবীর কিছুই জানেনা বোঝেনা; তার পৃথিবী এই কফিক্ষেতের মধ্যেই সমাপ্ত। তার ডানা নেই, পাখীর মত সে উড়তে জানেনা। পা নেই; রান্না-ঘরের পাশে যে বিড়াল ছানা আর ধেড়ে কুকুরটা দিন রাত্রি বসে বসে ঝিমোয় তাদের মত সে এত তাড়াতাড়ি এদিকে ওদিকে চলা ফেরাও করতে পারেনা। কফিপাতার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে গুটি মেরে মেরে চলতেই তার কত পরিশ্রম। সে আবার প্রজাপতির সন্তানদের ভার গ্রহণ করবে? গুটিপোকা মনে মনে ঠিক করলে এসম্বন্ধে সে রান্নাঘরের কুকুরটার কাছে কিছু পরামর্শ চাইবে। কিন্তু কুকুরটা হয়তো পরামর্শ দিতে এসে কফিপাতা মাড়িয়ে চ্যাঁচামিচি করে এমনি কাণ্ড বাধাবে যে প্রজাপতির সন্তানরা তার পায়ের নীচে চাপা পড়েই ভবলীলা সাঙ্গ করবে। এই সব নানারকম ভেবে গুটীপোকা কুকুরকে এসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করার চিন্তা ত্যাগ করলে। কিন্তু, এসম্বন্ধে কাছ থেকে পরামর্শ তো চাইতেই হবে! রান্না ঘরের বিড়ালটা যা চুপ চাপ গম্ভীর গোছের ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলে লেজ নেড়ে, মিউ মিউ ডাক ছেড়ে তার পর মাথাটা একটু নীচু করেই বোধহয় সব প্রশ্নের সে মীমাংসা করে দেবে। তার পর দ্বিতীয় বাক্য বলতে গেলে ফোঁস করে হয়তো বা থাবাই বসিয়ে দেবে। অনেক চিন্তার পর গুটীপোকা ঠিক করলো এসম্বন্ধে আকাশের দিগন্তরে ঐ যে চিলটা গান গাইতে গাইতে উড়ে যাচ্ছে, তার কাছ থেকে পরামর্শ চাইবে। গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্দুরে যখন গাছ পালা সব নিঝুম হয়ে থাকে, কফিক্ষেতের পাশের রান্না ঘর থেকে লোক জনের চলা ফেরার শব্দ বন্ধ হয়ে যায় তখন সেই নিস্তব্ধ দুপুরে গুটীপোকার জ্ঞানে কতদিন আকাশের শেষ প্রান্ত থেকে বাতাসের সঙ্গে চিলের গান ভেসে এসেছে। সেই প্রখর রৌদ্দুরেও তার বিরাম নাই। সে আকাশের একেবারে অপর প্রান্তে উড়ে গিয়ে পৃথিবীকে পরিষ্কার করে দেখে নিচ্ছে তার সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান লাভ করে নিচ্ছে। এই চিলের কথা যেমনি মনে হওয়া গুটীপোকার সব দ্বন্দ্ব ঘুচে গেলো। সে সে বাতাসকে ধরে পড়লো। বল্লো "ভাই চিলকে যদি একবারটী আমার কাছে ডেকে আনো। বড়ই উপকার হয়"। বাতাস তো পরোপকার করতে পারলে মহাখুসী বল্লে "ভাই তা আর পারিনে?" বলে সন্ সন্ করে সে দ্রুত ছুটে চল্লো চিলকে ধরে খবরটা শুনিয়ে দিতে! একটু পরেই চিল এসে বল্লে "কি বাছা গুটীপোকা আমায় তোমার কিসের প্রয়োজন?" গুটীপোকা হাত জোড় করে বল্লে "হে পক্ষীরাজ! এক প্রজাপতি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার বেলায় তার সন্তানদের লালন পালনের ভার আমার উপর অর্পণ করে গেছেন। আমি অজ্ঞজীব মাত্র এসম্বন্ধে কিছুই জানিনে। আপনি যদি দয়া করে এসম্বন্ধে আমায় কিছু পরামর্শ ও সদুপদেশ দেন তবে বড়ই উপকার হয়"। চিল মাথা নেড়ে বল্লে "বৎস এর পূর্ব্বে তো আমি এসব লক্ষ করে দেখবার মত বস্তু বলে ভাবিনি। এ সম্বন্ধে কেউ আমায় প্রশ্নও করেনি। আচ্ছা এবার যখন আমি আকাশের গায়ে উঠবো এ সম্বন্ধে সব সংবাদ তোমায় এনে দেবো।" বলে চিল আকাশের গায়ে উড়ে গেলো। গুটীপোকা বসে বসে সময় গুণতে লাগল; চিল আর আসেই না। শেষে যখন সন্ধ্যে হয় হয় তখন চিল তার স্বাভাবিক গম্ভীর গলায় গাইতে গাইতে কফি ক্ষেতের কাছে নেমে এলো। সে এসেই মহা উল্লাস প্রকাশ করে বল্লে "বাছা খবর তো সব সংগ্রহ করে আনলুম, কিন্তু তুমি আমার সব কথা বিশ্বাস করবে কি? গুটী পোকা মাথানেড়ে বল্লে "বিশ্বাস করাই আমার ধর্ম্ম, নির্ভয়ে বলে যান, আপনার কোন কথাই আমি অবিশ্বাস করবোনা।" চিল বল্লে "তা হলে প্রথমে প্রজাপতির সন্তান বা কি খায় সেটা বলেনি। তারা তোমারই মতন কফির পাতা খায়।" গুটীপোকা চোখ বড় বড় করে চিলের দিকে চেয়ে রইলো। প্রজাপতি তো তার

বরং সে বলেছিল তার মতম কফিপাতা খাওয়া তার সন্তান-দের সইবেনা। চিল গুটী পোকার আশ্চর্য্য চোখ দুটো এড়িয়ে গিয়ে বল্লে "আর বাছা তারা তোমারই মতন একদিন গুটীপোকা হয়ে কফির পাতায় পাতায় ঘুরে বেড়াবে। তখন তোমারই মতন হয়তো আর কোন প্রজাপতির সন্তানের ভার তাদের উপর এসে পড়বে।" এবার গুটীপোকা আর স্থির থাকতে পারলে না সে যে চিলের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবে কথা দিয়েছিলো সে সে কথা একেবারে ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে বল্লে "হে পক্ষীরাজ তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো? আমি মনে ভেবেছিলাম তুমি দয়ালু, আমার মতন ক্ষুদ্র জীবের প্রতি তোমার অসীম দয়া, কিন্তু এখন দেখছি তুমি নিষ্ঠুর।" এই বলে গুটীপোকা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো। চিল বল্লো "অজ্ঞজীব বলেছিলাম তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না" এই বলে কিছু দূর উড়ে গিয়ে আবার নেমে এসে চিল বল্লে আরেক কথা তোমায় শুনিয়ে যাই বাছা; যদিও জানি তুমি এবারও আমার কথা বিশ্বাস যোগ্য মনে করবে না। কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই বলছি যে তুমিও এমনি চিরকাল গুটীপোকাটীই থাকবে না, প্রজাপতি হয়ে ডানা মেলে আকাশের গায়ে উড়ে যাবে।" এবার গুটীপোকার চোখ জ্বলে উঠলো সে রেগে বল্লে "চালাকি করবার আর জায়গা খুঁজে পেলেনা বুঝি? তাই আমার মত ক্ষুদ্র জীবকে নিয়ে ঠাট্টা করতে এলেন।" বলতে বলতেই গুটীপোকার মনে হলো কারা সব যেন তার চারি পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাশে ফিরে তাকাতেই সে দেখলো অসংখ্য গুটীপোকা কফি ক্ষেতের পাতায় পাতায় গেছে আর নির্ভয়ে কফি পাতা ফুটো করে করে সে গুলোকে পেটে পুরছে। দেখেতো গুটীপোকার চোখ বিস্ময়ে স্থির হয়ে রইলো। প্রজাপতির সন্তানদের এই পরিণামে আশ্চর্য্য হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার হৃদয় আনন্দে নেচে উঠলো। তবে তো চিলের কথা সবই বিশ্বাস যোগ্য, তবে সেওতো একদিন প্রজাপতি হয়ে ডানা মেলে আকাশের গায়ে মিশে যাবে! আনন্দে তার বুক ভরে উঠলো। সে ঘুরে ঘুরে সব গুটীপোকাকে এই সুখবরটী শুনিয়ে দিয়ে এলো। কেউ তার কথা বিশ্বাস করলোনা। সবাই উপহাস করলো ঠাট্টা করলো। কিন্তু গুটীপোকা কোথাথেকে এক অটুট বিশ্বাস হৃদয় খুঁজে পেলো। তার বলে সে সব উপহাসকে সহ্য করে রইলো। তার পর প্রজাপতি হয়ে সন্তান প্রসব করে সে যখন এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলো তখন যাবার সময় সেই বিশ্বাস বুকে বেঁধে নিয়ে গেলো, বলে গেলো "এবার বিশ্বাকে যখন হৃদয়ে বাঁধতে পেরেছি' তখন এ বিশ্বাস নিয়েও পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারবো যে এ পৃথিবীর পরপারে আরেক পৃথিবী আছে, যেখানে সদাই সুখ, সদাই শান্তি।

শ্রীমালতী সেন।

লেবুর আচার।

উপকরণ।—১সের লেবু, ১পোয়া নুন, ১পোয়া কাঁচা লঙ্কা।

প্রণালী—প্রথমে লেবুগুলি তিন টুকরো করে কেটে একটা পাথর কিংবা কলাইয়ের পাত্রে রাখ। পরে তাতে নুন লঙ্কা দিয়ে মেখে পাত্রটী উনানে চড়াও। যখন নুন গলিয়া জল হইয়া গিয়া দুই চার ফুট ফুটিতে থাকিবে তখন নামাইয়া রাখিবে। পরে একটা শিশি কিংবা অন্য কিছুতে ভরিয়া রাখিবে। এই আচার ১বৎসর পর্য্যন্ত বেশ থাকে।

শ্রীমতী সুরমাদেবী।

সাপুড়ের গল্প

(শ্রীস্নেহলতা দেবীর ইংরাজী গল্প হইতে অনুবাদ।)

তখন সুদূর বিস্তৃত বালুকার তীরে সমুদ্রের উপর সূর্য্যাস্ত হইতেছিল। স্থানটি উড়িষ্যার একটি নির্জ্জন প্রান্তে অবস্থিত। যতদূর দৃষ্টি যায় দূরে কেবলই ঘন বনের সারি, আরও দূরে নীলগিরি পর্ব্বত যেন আকাশের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে. চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি সুন্দর শান্ত। আকাশ বর্ণ-ছটায় উদ্ভাসিত।

ক্রমে চারিদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, হঠাৎ কানে বাঁশীর একটি ক্লান্ত সুর আসিয়া পৌঁছিল বুঝিলাম তাহা কোন্ এক সাপুড়িয়ার বাঁশীর সুর। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম একটি লোক আমার বাড়ীর দিকে আসিতেছে, তাহার দিকে চাহিয়া মনে হইল লোকটি দীর্ঘায়তন ও সুন্দর। পশ্চাতে আর একটি সুন্দরী রমণী, তাহার বয়স হইয়াছে, উভয়কে দেখিলেই বুঝা যায় তাহারা মাতা পুত্র। নিকটে আসিয়া তাহারা যুগপৎ আমাকে সেলাম করিল। ছেলেটির বয়স অধিক নহে, সে আমাকে অতি শ্রদ্ধার সহিত জিজ্ঞাসা করিল "মাইজী, সাপের খেলা দেখিবে?" আমি ইতিপূর্ব্বে বহুবার সাপের খেলা দেখিয়াছি, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ ঔৎসুক্য থাকায় বলিলাম "হাঁ দেখিব"।

মাটীতে তাহার ঝুড়ি নামাইয়া সে নিজে তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিল, বাঁশীটি লইয়া বাজাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে নানা রঙের কতকগুলি সাপ বাহির হইয়া তাহার সর্ব্ব-শরীরকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। লোকটি যেন তবুও সন্তুষ্ট হইল না, এবং কি একটার আশায় যেন অপেক্ষা করিয়া রহিল। বাঁশীর সুরে একটি ব্যগ্রতা প্রকাশ পাইতেছিল, কি মধুর সে সুর। প্রাণমন যেন মাতাইয়া তোলে, আমি অবাক হইয়া ভাবিলাম এই নিরক্ষর দরিদ্র সন্তানকে এমন সুর শিখাইল কে?

অবশেষে একটি প্রকাণ্ড শাদা সাপ ঝুড়ি হইতে বাহিরে আসিল। সাপের গায়ে কোন দাগ নাই রঙটা যেন মাখ-নের মত, বড় বড় চোখ দুটি তারার মত জ্বল জ্বল করিতে লাগিল। এমন সুন্দর শাদা সাপ আর কখনও দেখি নাই, মন্ত্রাহতের ন্যায় এই সাপটির দিকে তাকাইয়া রহিলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম "দেখ সাপুড়ে, তোমার সাপ গুলি দেখে মনে হয় যেন মানুষ, ওদের চোখের দৃষ্টি যেন ওদের অন্তরকে প্রকাশ করছে"।

সাপুড়িয়ার বাঁশী হইতে মুখ তুলিয়া শান্তস্বরে কহিল "মাইজী আত্মার মুক্তি না হইলে, সে কোন না কোন আকারে পৃথিবীতে থাকিয়াই যায়। হয়ত এই সব সর্প-দেহের মধ্যেও মানবাত্মা বিরাজ করিতেছে"। সকল হিন্দুরই এক ধর্ম্ম, সেকথা আমার মনে ছিল না, সেইজন্য অতি সাধারণ এক সাপুড়িয়ার মুখের এই রকম কথায় একেবারে অবাক হইয়া গেলাম। বলিলাম "তোমার ধর্ম্ম এই কথা বলে, কিন্তু আমরা জানি যে এই সকল জীবের আত্মা নাই।" সে উত্তর করিল "ইহার মানে কি মাইজী? তোমার ধর্ম্ম একেবারে উল্টা ও অদ্ভুদ। একজন বাবু আমাকে বলিয়াছেন যে বাঁদর হইতেই মানুষের জন্ম—অথচ তুমি বলিতেছ এ সকল জীবের আত্মা নেই"।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম শাদা সাপটি তাহার প্রকাণ্ড মাথাটি তুলিতেছিল, তাহারই দিকে শ্রদ্ধাপূর্ণ নয়নে তাকাইয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম "কি অপূর্ব্ব সুন্দর সাপ"। "হাঁ মাইজী অতি সুন্দর ঠিক এইরকম আর একটি সাপ দেখিয়াছিলাম। তোমাকে একটি সত্য গল্প বলিতে পারি, সেই গল্প শুনিলে তুমি বুঝিবে তোমার ধর্ম্ম কতখানি ভুল"। জিজ্ঞাসা করিলাম সাপের গল্প? সে বলিল "হাঁ"। সাপ গুলি ঝাঁড়িতে তুলিতে তুলিতে সে তাহার মাতার দিকে চাহিয়া বলিল "মা তুমি আরও ভাল বর্ণনা করিতে পারিবে, তুমিই বল"। তাহার মা বলিল "আচ্ছা বাছা আমিই বলি এই বলিয়া সে তার শাড়ীর আঁচলটি মাথায় তুলিয়া দিয়া

কোলের উপর দুটি হাত জোড় করিয়া বসিল তারপর বলিতে আরম্ভ করিল—

"আমার স্বামী একজন সাপুড়িয়া ছিলেন, তাঁহার বংশে অনেক পুরুষ হইতেই এই ব্যবসায় পর্যায় ক্রমে চলিয়া আসিতেছিল। যখন তিনি বালক তখন তাঁহারই গ্রামেই একটি বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। আমার স্বামী তাঁহাকে যেমন ভয় করিতেন তেমনি ভালও বাসিতেন। তাঁহাদের কোনও সন্তানাদি হয় নাই। যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, আমার স্বামী পাঁচ বৎসরের জন্য বিদেশ যাত্রা করিলেন, এই পাঁচ বৎসর আমার সপত্নী স্বামীর জন্য ধীর চিত্তে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। স্বামী দীর্ঘকালের পর এক অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। এই দ্বিতীয়া স্ত্রী তাঁহার অত্যন্ত ভালবাসার পাত্রী হইয়াছিলেন, আমার বড় সপত্নীও তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন। কিছুদিন পরে সন্তানাদির কোন আশা না দেখিয়া তিনি আমায় তৃতীয়া পত্নী রূপে গ্রহণ করিলেন। বিবাহের দুই বৎসরের মধ্যেই আমার একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল—এই পুত্রকে সকলেই অত্যন্ত ভালবাসিতেন।

আমাকে আমার মাতা সপত্নীদিগের সহিত 'ঘর' করিতে দিতে পছন্দ করিতেন না বলিয়া আমি পিত্রালয়েই বাস করিতাম।

আমার পুত্র জন্মের অল্পদিন পরেই আমার মধ্যমা সপত্নী ওলেরায় মারা গেলেন আমার স্বামী শোকে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়ায় আমি স্বামীর গৃহে আসিয়া বাস করিতে লাগিলাম, এখন হইতে তিনি সাপুড়িয়ার ব্যবসা ছাড়িয়া দিলেন, বাঁশী বাজাইতে খুব ভাল বাসিতেন বলিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তিনি ঘরের দাওয়ায় বসিয়া বাঁশী বাজাইতেন। এমন সময় একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। যেরকম সাপ আজ দেখিতেছে মাইজী ঠিক এমনি সুন্দর একটি সাপ প্রতিসন্ধ্যায় আমাদের ঘরের সম্মুখে নির্জ্জীব প্রায় হইয়া বাঁশী শুনিত। সে সময় তাহার চক্ষু দেখিলে মনে হইত যেন কোনো মন্ত্রদ্বারা তাহাকে বাঁধিয়া ফেলা হইয়াছে; একদিন আমার স্বামী তাহার দিকে ধীরে ধীরে গিয়া দাঁড়াইলেন, সাপটি তাঁহাকে দেখিয়াই নিকটের এক জঙ্গলে গিয়া প্রবেশ করিল।

এইরূপে দশবৎসর কাটিয়া গেল, সাপটির নিয়মের কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না। আমার পুত্রের একাদশ বৎসর বয়স হইলে স্বামী প্রাণত্যাগ করিলেন। আমার বড় সপত্নী তাঁহার অনুগমন করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন "দেখ, যখন চিতা জ্বলিয়া উঠিবে তখন সেই শাদা সাপটিও চিতারোহন করিবে, কেহ তাহাকে বাধা দিওনা, সে আমাদের প্রিয় ভগিনী হীরা, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি সে সর্পরূপ ধারণ করিয়া আছে।"

আমি ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম, কিন্তু মাইজী, এ কথা মিথ্যা নহে। সমস্ত দিন ধরিয়া চিতা সজ্জিত হইল, গ্রাম গ্রামান্তর হইতে দলে দলে লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল। আমার ভগিনী, লাল চেলীর কাপড় ও নানা বহুমূল্য অলঙ্কারে নব বধূর ন্যায় ভূষিত হইলেন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া স্ত্রীলোকটি থামিল, কিছুক্ষণ পর পুত্রকে বলিল "আমি আর সেই সতীর মৃত্যু বর্ণনা করিতে পারিনা, তুমি ত সে জায়গায় উপস্থিত ছিলে, বাকিটুকু তুমি শেষ করিয়া দাও"।

ছেলেটি বলিল "যখন আসিয়া চিতায় আরোহণ করিল, সকলে উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল "সাপ, সাপ মারো মারো। কিন্তু আমি তাহাদের বাধা দিয়া বলিলাম "উনি আমার বিমাতা, উঁহাদের পুণ্য মিলনে বাধাত করিও না"। সাপটি ক্রমে ক্রমে স্বামীর পা দুইটি জড়াইয়া পড়িয়া রহিল"। গল্প শেষ হইলে, তাহারা উভয়ে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া বহিয়া ঝড় আসিল, এই ঝড়ে তাহাদের কি করিয়া বিদায় দিই, মনে করিয়া উপযুক্ত বক্‌শিস দিয়া সে রাত্রে তাহাদের সেই খানেই থাকিতে বলিলাম।

আমার মনে হইতে লাগিল এই অদ্ভুত ব্যাপার কি করিয়া সত্য হইতে পারে! মৃত্যুর রহস্য কি চিরকাল মানুষের কাছে রহস্যই থাকিয়া যাইবে?

কবির ভাষায় মনে পড়িল,

> 'প্রলয়ে সৃজনে না জানি কার যুক্তি,
> ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা;
> বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
> মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।'

শ্রীরমা দেবী

Printed & Published by—Jagadananda Roy, at the Santiniketan Press, Santiniketan.

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ সাল

শ্রেয়সী

মাসিক পত্র

সম্পাদিকা—শ্রীকিরণবালা সেন

মূল্য, বার্ষিক সডাক ২৲ টাকা।

শ্রেয়সী

মাসিক পত্র

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্য মেত
স্তৌ সম্পরীত্য বিধিনক্তি ধীনাঃ
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্থ সাধুর্ভবতি।
হীয়তেহর্থাৎ য উ শ্রেয়োরণীতে॥"

"শ্রেয়ঃ প্রেয় সবাইকে পায়।
দেখে' বেছে' ন্যায় যে যেটা চায়॥
যে ন্যায় শ্রেয়—সে পায় কূল।
যে ন্যায় প্রেয়—খোয়ায় মূল॥"

কঠোপনিষদ্।
১ম অধ্যায়, ২য় বল্লী, ২য় শ্লোক।

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ সাল

শ্রেয়সীর কথা

মানুষের একটী দিক্ ক্রমাগতই চাচ্ছে অন্য পাঁচজনের মধ্যে আপনাকে ছড়িয়ে দিতে অন্যের সুখদুঃখের উদ্যম উৎসাহের অংশ নিতে ও আপনার সুখদুঃখের অংশ তাদের বিলিয়ে দিতে। এ না হলে মানুষ বাঁচ্‌তে পারে না। আপনার ভিতরকার এক মহা আহ্বানে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে মিলে পরস্পরের কাছ থেকে সহানুভূতি লাভ করে, আপনার জীবনী শক্তি সংগ্রহ করে—বল লাভ করে—

অতীতের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখি মানুষ কতবার উঠে পড়ে লেগেছে এই আহ্বান অগ্রাহ্য করতে—আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে তৃপ্ত থাক্‌তে চেষ্টা করেছে—একাকী আপনার বলে উন্নত হতে চেয়েছে—উচ্চ আকাঙ্খা নিয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছে—কিন্তু তেমন সফল হয়েছে কি? এখন ক্রমশঃই মানুষ স্পষ্টতর ভাবে অনুভব করছে সহানুভূতি ও সহযোগীতা রূপ উৎসব দ্বার বন্ধ করে দিলে তার

তাই ছোট বড় দলবদ্ধ হয়ে আপনাদের ভাবের আদান প্রদানে পুষ্ট হয়ে—আপনাদের উদ্যমকে একীভূত করে দিয়ে কতপ্রকার কল্যাণকর কাজে মানুষ প্রবৃত্ত হচ্ছে।

আমরা সেই মহা আহ্বানে আমাদের আপন আপন ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে মিলতে এসেছি।

বর্ত্তমান বাঙলার নবীনারাই শ্রেয়সীর প্রাণ, তাঁদেরি লেখা দিয়ে তাদেরি আঁকা দিয়ে শ্রেয়সীকে সাজাতে হবে।

এই তরুণ প্রাণের চঞ্চলতা ও অসম্পূর্ণতা অনেক আছে কিন্তু নানা দিক্ দিয়া এই অনুষ্ঠানটিকে উপলক্ষ্য করে তারা আনন্দকে বরণ করে নেবে। এই আমাদের মিলিত ইচ্ছা আনন্দের মধ্যে দিয়ে কর্ম্ম আপনিই রূপ গ্রহণ করবে।

* * * * * *

প্রথম সংখ্যার শ্রেয়সীতে অনেক ছাপার ভুল ত্রুটী রহিয়া গেছে আশা করি পাঠকগণ সে দোষ ক্ষমা করবেন। শ্রেয়সী পূর্ব্বে হাতের লেখায় বাহির হইত এবং শ্রীমতী শান্তা দেবী বি এ,র সম্পাদিকতায় ইহা এক বৎসর যাবৎ সুন্দর রূপে চলিয়াছিল। পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রেয়সীর জন্য উপনিষদ হইতে শীর্ষোক্ত শ্লোকটি অনুদিত করিয়া দিয়া আমাদের অত্যন্ত অনুগৃহীত করিয়াছেন।

জনৈক নবীনা

চিঠি

কল্যানীয়াসু।

তোমার ওখানে আবার ছেলেদের খাওয়া আরম্ভ হয়েছে এতে আমি বিশেষ আনন্দ বোধ করচি। বিদ্যালয়ের ভোজনশালার চেয়ে তোমার ওখানে খাওয়া ভাল হবে বলেই যে খুসী হচ্চি তা নয়। একজন কেউ মনের সঙ্গে যত্ন করে ওদের খাইয়ে দিচ্ছে এইটেই ওদের পক্ষে সবচেয়ে উপাদেয়। মানুষ ত শুধু কেবল রসনা দিয়ে খায়না সে হৃদয় দিয়ে খায়। সেই সর্ব্বাঙ্গীন খাওয়াটি সবচেয়ে দরকার শিশুদের। সেইটে ছেলেরা তোমার ওখানে পাবে এইটে বিদ্যালয়ের পক্ষে সব চেয়ে কল্যাণকর। জগৎসংসারে সকল কাজের মধ্যেই মেয়েদের একটি বিশেষ কাজ আছে, কেবলমাত্র ঘরসংসারের মধ্যে নয়। পৃথিবীর কোথাও একথাটা আজও সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়নি কিন্তু না হয়ে থাকবার জো নেই—জগতের কর্ম্ম ক্ষেত্রের এই অসম্পূর্ণতা মানব প্রকৃতি কোনো মতেই চিরদিন বহন করবেনা। আমাদের হতভাগ্য দেশে নারী শক্তিকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে ঘরের কোণে নির্ব্বাসিত করে বোঝবার পর্য্যন্ত শক্তি আমাদের নেই। আমার বিদ্যালয়ে সেই অভাবটি যথার্থ-ভাবে যদি দূর হতে পারে তাহলে আমি খুব খুসী হই। এটাকে সম্ভবপর করে তুলতে গেলে এজন্য আমাদের কঠিনরূপে প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের অনেক দিনের সংস্কার ও অনভ্যাস বড় ভয়ানক বাধা—তার দ্বারা ব্যাঘাত প্রাপ্ত হওয়াতেই পরস্পরের সম্বন্ধ সহজ হতে পারে না—সর্ব্বদাই সেটা সম্বন্ধে চেতনার অতিশয়তা ঘটে। ধীরে ধীরে এই গ্রন্থি মোচন হয়ে গেলে সংসারে কি সুন্দর কি পূর্ণরূপে পবিত্র হয়। আমাদের অনভ্যাসের ব্যবধানের গা ঘেঁসে কলুষ জমে জমে উঠে এমন ঘন হয়ে উঠেছে যে আমাদের জীবন ক্ষেত্রের অধিকাংশ স্থান থেকেই আমরা জননীকে একেবারে বিদায় করে দিয়েছি আমাদের সমাজের পনেরো আনা অংশ মাতৃহীন, তেমন দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে? পাপের দ্বারাই আমরা মাকে বিদায় করি, আবার মায়ের চোখের উপর থাকিনে বলেই পাপ বেড়ে উঠে। এমন করে কখনই মঙ্গল হতে পারে না। আমাদের সমা-

আজ সকালে আমরা লণ্ডনে এসে পৌচেছি। * * * * যে ঠিকানায় আরবারে ছিলুম আসচে সপ্তাহে সেইখানে যাব—এখন সেখানে জায়গা খালি হয়নি। আমরা ওলিম্পিক বলে যে জাহাজে চড়ে আটলাণ্টিক পার হয়েছি সেই জাহাজটা বোধ করি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় জাহাজ। শান্তিনিকেতন থেকে বাঁধ পর্য্যন্ত যতটা, ততটা লম্বা হবে। আমরা যে ডেকের ক্যাবিনে ছিলুম—সে ডেকটা পঞ্চমতলার ডেক্‌ অর্থাৎ তার উপরে থাকে থাকে আরো চার তলা ক্যাবিন আছে এবং তার নীচেও অনেক তলার কাবিন। এর থেকে বুঝতে পারবে জাহাজটা কত উঁচু। তা ছাড়া শয়নাসন আরাম বিরাম আহার বিহারের যে ব্যবস্থা সে একটা আশ্চর্য্য ব্যপার। ছদিন মাত্র মেয়াদ কিন্তু এই ছদিনের জন্যে রাজকীয় আয়োজন এই বিপুল ভোগের বোঝা বহন করে বেড়াবার যে শক্তি তা কল্পনা করলে বিস্মিত হতে হয়—কোথাও লেশ মাত্র মলিনতা বা শিথিলতার চিহ্নটুকু নেই এত বড় একটা উদ্যোগ কিন্তু কোনোখানে প্রয়াসের কোনো লক্ষণ বাইরে থেকে দেখা যায় না! আমাদের মস্তিষ্কে হৃৎপিণ্ডে পাকযন্ত্রে যেমন অহরহ একটা বিচিত্র এবং বৃহৎ চেষ্টা চলছে—অথচ আমরা সমস্তকে যেমন অনায়াসে বহন করে নিয়ে হেসে খেলে বেড়াচ্ছি এ কতকটা যেন সেই রকম। যে শক্তি পরিপূর্ণ মাত্রায় জাগ্রত ও সচেষ্ট থেকেও আপনাকে সুবিহিত পারিপাট্যের মধ্যে সমাবৃত রাখতে পারে তাকে দেখে মনের মধ্যে সম্ভ্রম জন্মায়—বিশেষতঃ এই জিনিষটা আমাদের দেশে আমরা দেখতে পাইনে—সেখানে শক্তির রথ গোরুর গাড়ীর মত তার সামর্থ্য অল্প, সে চলে কম, সে শব্দ করে বেশী—তার বাহন বেচারা অবিশ্রাম ল্যাজ মলা খায় এবং তার চালকেরও মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম নেই।

আমাদের আশ্রম বিদ্যালয়ের ললাট থেকে এই কষ্টের কুঞ্চন রেখা এখনো ঘোচেনি—আমাদের ত্যাগের মধ্যে চেষ্টার মধ্যে ক্লেশ রয়েছে যতদিন আমাদের মধ্যে দীনতা থাকবে ততদিন এই ক্লেশের ভার আমাদের বহন করে চলতে হবে—ততদিন এর চাকার ভিতর থেকে আর্ত্তস্বর শুনতে পাব। কিন্তু তবু এ ক্লেশ স্বীকার করতে হবে এর—থেকে পালিয়ে গিয়ে নিষ্কৃতির চেষ্টা করলে চলবে না। কেননা চলতে চলতেই তবে চলবার বাধা ক্ষয় হয়। আমাদের আত্মার দীনতা ধনের দীনতার মত নয়—দান করতে করতেই তার দৈন্য হ্রাস হতে থাকে, তার ভার বহন করবার দুঃখটা বহন করার দ্বারাই দিনে দিনে লঘু হয়ে আসে—বস্তুতঃ শ্রমের দ্বারাই তার শ্রান্তি দূর হয়ে আসে—এইটেই কি আমরা আমাদের আশ্রমের সধনার ভিতর থেকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাইনি? কিন্তু অধীর হলে চলবে না—জীবনের কার্য্য ইমারৎ গেঁথে তোলার মত নয়—কতখানি অগ্রসর হল কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না—এমন কি, অনেক সময় বিরুদ্ধ আকারে সে আপনাকে প্রকাশ করে। সেই জন্যে আমি বাইরের দিক থেকে সফলতার বিচার করতে চাইনে—আমি কেবল এই টুকুই দেখতে চাই আমি যেন সত্য হতে পারি। আমি এই জানি আমার উপর যে দাবি আছে সে আমাকে যেমন করে হোক পূরণ করতেই হবে—এ দাবি অন্যে স্বীকার করছে কিনা সে কথা বিচার করতে গেলেই নিজের দায় অন্যের স্কন্ধে চাপাবার দুর্ব্বলতা মনকে পেয়ে বসে। আমার অন্তর্যামীর সঙ্গে আমার যা বোঝাপড়া আছে তাই আমি জানি—আমি আর কিছু জানিনে জানবার চেষ্টা করতে গেলে পদে পদে ভুল বিচার করি, তাতে কেবল অপরাধ বাড়তে থাকে। আমাদের দাবি হচ্চে কেবল দেবার দাবি—অন্যের কাছ থেকে পাবার দাবি কিছু নয়—এই কথাটি যেন প্রসন্ন মনে অন্তরের মধ্যে জাগরূক রাখতে পারি॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গভীরে গম্ভীরে

গভীর এক জিনিষ গম্ভীর আর এক জিনিষ, গভীর জিনিষে মন তলিয়ে যায় গম্ভীর জিনিষে মন ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। মুখোসটা গম্ভীর, আসল মুখ কিন্তু ভাল মন্দ যাই হোক গভীর। বাড়ির মধ্যে বৈঠকখানা বাড়ি আদালত, লাট ভবন, বেলাতি দোকানঘর, আফিস বাড়ি সেনেট হাউস সবই গম্ভীর, কিন্তু চিনের পাঁচীল বর্ম্মার প্যোগোডা সাঁচীর স্তুপ সেণ্টপল গির্জ্জে ভিকটোরিয়া হল-টাউন হল নয়, ন্যেসেনাল লিগ্ হলও নয় গাঁয়ের খড়ো ঘর খানি থেকে রথ তলার আটচালা খানা পর্য্যন্ত গভীর জিনিষ, জাহাজ ঘাটের পণ্টুন গম্ভীর, গাঁয়ের ধারের ভাঙ্গাঘাট গভীর। জাহাজের অত বড় খোলটার চেয়ে খেয়া নৌকোর মধ্যেটা গভীর, গড়ের মাঠের বড় বড় লাট বেলাটের এবং এখানে ওখানে ছড়ানো বড় লোকের মস্ত মস্ত মর্ম্মর মূর্ত্তি ধাতুমূর্ত্তি অয়েল পেণ্টিংগুলো অতি ভয়ঙ্কর গম্ভীর কিন্তু কালিঘাটের পট থেকে আরম্ভ করে কুমরটুলির আহ্লাদী পুতুল সত্যপীরের ঘোড়া মাটীর রথের জগন্নাথ সুভদ্রাবলরাম সবাই গভীর। স্মৃতি সভার বক্তৃতা, সঙ্গীত সভার গান ড্রিল নাচের মতো ভারি গম্ভীর-স্মৃতীর পণ্ডিতের মতো, সঙ্গীতের মাষ্টারের মতো কামান বন্দুকের চেহারাটার মতো যেমন গোমসা তেমনি গম্ভীর, কিন্তু তালপাতার সেপাই, পুঁথির পাড়, ভালুকনাচ মুস্কিল আসানের আজান বাউলের গান গম্ভীর একবারেই নয়।

বিয়ের রাতে বরটা মহাপায়া বাদ্য বাজনা আলো আর আতস বাজি ইত্যাদির মধ্যে ভাড়া করা সাজ পোরে বিশ্রী রকম গম্ভীর হয়ে দেখা দেয়, আর কনে শাঁখা সাড়ি সিঁদুর শুধু এই টুকু সাজেই গভীর হয়ে দেখা দেয় সাহানার সুরের সঙ্গে এক হয়ে। গভীরের টান হ'ল আপনার টান, গম্ভীরের টান হল দপ্তরীর বাঁধা খাতার রুলের টান, গভীরের সাজ হল অলকা তিলকার সাজ, গম্ভীরের সাজ হল তিলক ত্রিপুণ্ড্রু ক-টিকি অথবা চোগা চাপকান মোড়াসা, কিম্বা হেট্ কোট্ টাই!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান

গান আমাদের কেন ভাল লাগে। আমাদের প্রাণের মধ্যে যে সুপ্ত সুর আছে, গান শুনলেই সেই গুলি জেগে ওঠে। সন্ধ্যা বেলা যখন সমস্ত দিনের কলরব থেমে আসে, পশ্চিম দিকে লাল রঙ্ ছড়িয়ে দিয়ে সূর্য্য অস্ত যায়, লোকেরা সমস্ত দিনের পর শ্রান্ত চরণে ক্লান্ত মনে যে যার গৃহে ফেরে, রাখালেরা গোরু নিয়ে ঘরে ফিরে যায়, পাখীরা যে যার কুলায়ে যায়, তখন দূরে কোথাও পূরবী রাগিণী শুনলে মনে উড়ে যায়, আনন্দ মিশ্রিত অবসাদ এনে দেয়।

আবার রাত্রি বেলা যখন চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে যায়, আর পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে তারা-খচিত আঁধার-যবনিকা একটি দিনের লীলার অবসান সূচিত করে তখন আমাদের অন্তরের চিরবিরহিনী বেহাগ রাগিণীতে আপন মর্ম্ম বেদনা জানায়।

আবার প্রভাতে যখন পূর্ব্বদিগাঞ্চলে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আলোকের ঝরণা ধারায় আমাদের মনের সমস্ত মলিনতা ধৌত হয়ে আমরা নবীন জীবন লাভ করি সেই সময় ভৈরবী রাগিণীর আলাপে শান্তির ও তৃপ্তির [illegible]

জাগ্রত হয়। মনে হয় এ জীবন ব্যর্থ নয়, প্রতিদিনের তুচ্ছ দুঃখ সুখকে ছাপিয়ে উঠে আত্ম ত্যাগ করতে হবে, পৃথিবীর ঋণ শোধ করতে হবে। গানের ভিতর দিয়ে আমরা আপনাকেই উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের ব্যথা, আনন্দ বিরহ, মিলন, এই সকলের সঙ্গেই গানের সুরের অনির্ব্বচনীয়তা মিশ্রিত হয়ে তাদের অসীম সৌন্দর্য্য দান করে। অন্তরের বাহিরের, এই সুরের দেওয়া নেওয়ার ভিতর দিয়েই আমরা বিরোধের মধ্যে ঐক্যকে আর বিচ্ছেদের মধ্যে মিলনকে লাভ করি।

শ্রীকমলা দেবী।

শিশুশিক্ষা।

মাদাম মন্তেসরী শিশুদিগের শিক্ষা জগতে নূতন যুগ আনিয়াছেন।—এই মনস্বিনী মহিলা তাঁহার গ্রন্থে শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহারই একটী অধ্যায়ের সারাংশ এখানে বলিতে চেষ্টা করিব।—

শিশুদিগের শিক্ষার কথা উঠিলে প্রথমেই তাহাদের নিয়মের (discipline) মধ্যে রাখা উচিত কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠে।—নিয়ম চাই এবিষয়ে মত ভেদ নাই, কিন্তু কি উপায়ে শিশুদিগের মধ্যে নিয়মনিষ্ঠা জাগান যায় এসম্বন্ধে মন্তেসরীর কি মত তাহা আমরা দেখি।

তাঁহার মতে শিশু শিক্ষার মুল কথা স্বাধীনতা; এবং স্বাধীনতা বলিতে গেলে গতিশীলতা (activity) বুঝায়; সুতরাং শিশুদিগকে নিয়ম শিখাইতে গিয়া আমরা যদি তাহাদের সচলতা, সজীবতা নষ্ট করি তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে আমরা শিশুপ্রাণগুলিরই মুলে কুঠারাঘাত করি।

উৎসুকচিত্তে শিশুদিগের গতি বিধি লক্ষ্য করিলে মন বিস্ময়ে ভরিয়া উঠে। কেমন্ করিয়া তাহারা পৃথিবীর সহিত পরিচয় স্থাপন করিতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধাগুলি আপনা আপনিই অতিক্রম করিতে শিখিতেছে, নিজেদের প্রয়োজন মত ভাঙাগড়া করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে, নীরবে দেখিয়া যাওয়া; মধ্যে মধ্যে কেবল তাহাদিগকে সাহায্য করা ইহাই আমাদের কায। শিক্ষাদান বলিলে মনে হয় শিশুদিগকে নিস্তব্ধ, নিশ্চল রাখিয়া আমরা তাহাদিগকে সকল জিনিষ পাখী পড়াইবার মত পড়াইয়া দিব; কষ্ট করিয়া কোন জিনিস তাহাদিগের শিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা দ্বারা আমরা তাহাদিগকে সংসারে চলিবার উপযুক্ত করা দূরে থাক্, তাহাদিগকে খর্ব্ব, পঙ্গু করিয়া ফেলি। স্বাধীনতার একটী মন্ত্র আত্মনির্ভর। পৃথিবীতে কোনরূপেই সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন বা আত্মনির্ভরশালী হওয়া সম্ভব নয়। নানা দিক দিয়া প্রকৃতির নিকট, সমাজের নিকট আমরা ঋণী। তথাপি এই ঋণ ভার যত লাঘব করা যায় ততই মঙ্গল। নিজের প্রয়োজন নিজেই সিদ্ধ করার মধ্যে একটী অপূর্ব্ব আনন্দ আছে। আপনার ভিতরের ক্ষমতা উপলব্ধি করিতে

পারিলে ক্রোধ মিশ্রিত দম্ভও চলিয়া যায়। বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া নিজে একটী কাজ করিলে বুঝা যায় তাহার মূল্য কত; কিন্তু আমাদেরই জন্য আমাদের অধীন ব্যক্তিরা শত পরিশ্রমে কাজ করিয়া আনিলেও আমরা অনেক সময় তৃপ্ত হই না। দেখা যায় যে যে ব্যক্তি অন্যের উপর যত নির্ভর করে ততই সে দাম্ভিক ও অত্যাচারী হয়। অপরদিকে কার্য্যে দক্ষতা ও ক্ষমতা লাভ করিতে পারিলে প্রসন্নতা ও সদা প্রফুল্লভাব বাক্যে কার্য্যে ফুটিয়া উঠে। আপনার অসুবিধার জন্য অন্যের উপর ক্রুদ্ধ না হইয়া নিজেই সেই অসুবিধা দূর করিতে পারা যায়; সুতরাং অসন্তোষ ভোগ করিতে হয় না।—অতএব দেখিতেছি যে শিশুদিগের মধ্যে আত্মনির্ভর না জাগাইলে কেবল তাহাদিগকে খর্ব্ব ও পঙ্গু করা হয় না; তাহাদিগের স্বভাবের মধ্যে অসন্তোষ, ক্রোধ প্রভৃতি নানান্ দোষ আসিবার সুযোগ দেওয়া হয়। এখন স্বাধীনতা বলিলে যেন স্বেচ্ছাচারিতা মনে করা হয় না। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করা অনেক সময় কঠিন হইয়া উঠে। শিশুরা হয়ত এমন কায করিতেছে যাহাতে আমাদের কাযের বা আরামের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইতেছে, সেখানে বিশেষ ক্ষতি-কর অসুবিধা যদি না হয় তাহা হইলে বাধা দেওয়া অন্যায়। মাদাম মন্তেসরী লিখিতেছেন যে তাঁহার বিদ্যালয়ের একটী বালক একটু নিশ্চেষ্ট স্বভাবের ছিল। উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে হয়ত এলোমেলো খেলা করিত—কিন্তু মন দিয়া কিছু করিতে পারিত না। একদিন দেখা গেল সে মন দিয়া একটী টেবিল নাড়িয়া সমান ভাবে সুন্দর করিয়া রাখিতেছে; শব্দ হওয়াতে একজন শিক্ষয়িত্রী আসিয়া তাহাকে থামাইলেন; কিন্তু এস্থলে তাহার উদ্দেশ্য দেখিলে শিক্ষয়িত্রী ওরূপ করিতে পারিতেন না। আর একবার কয়েকজন বালক একটী জলপাত্রে খেলনা ভাসাইয়া খেলা করিতেছিল; একটী ছোট বালক সেইখেলা একটী চেয়ারের উপর উঠিয়া দেখিবার জন্য বহুকষ্টে চেয়ারটী সরাইয়া আনিতেছিল। তাহার কষ্ট দেখিয়া একজন শিক্ষয়িত্রী তাহাকে কোলে উঠাইয়া খেলা দেখাইলেন, কিন্তু মনে হইল শিশুটীর অর্দ্ধেক আনন্দ চলিয়া গিয়াছে। নিজে কষ্ট করিয়া চেয়ার টানিয়া আনিলে তাহার আনন্দ দ্বিগুণ হইত

কিন্তু যে সকল কাযে অন্যের প্রকৃত পক্ষে ক্ষতি হয় সঙ্গীদিগের অসুবিধা হয় বা যে কায প্রকৃতই অন্যায় তাহা হইতে তাহাদিগকে বুঝাইয়া বিরত করিতে হইবে। জোর করিয়া তাহাদিগকে দিয়া করানর চেয়ে বুঝাইয়া তাহাদিগের সহিত তর্ক করিয়া কোন্‌টী ভাল কোনটী মন্দ বলিয়া দিলে অধিক ফল হয়। মন্তেসরী বলিতেছেন ইহাতে তিনি আশ্চর্য্য রকম ফল পাইয়াছেন। পুরস্কারের লোভ বা শাস্তির ভয় দেখাইবার একেবারেই প্রয়োজন হয় না। তাঁহার মতে পুরস্কার বা শাস্তি দুই-ই থাকা উচিত নয়। ভাল মন্দের পার্থক্য জ্ঞান যদি শিশুদিগের মধ্যে জাগান যায় ত আপনা হইতেই তাহাদের ব্যবহার সংযত ও নিয়মিত হয়।

মন্তেসরী তাঁহার বিদ্যালয়ে যখন পুরস্কার দেওয়া তুলিয়া দিলেন তাহার পরও শিক্ষয়িত্রীদের মনে পুরস্কারের অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ধারণা করাইতে কিছু দেরী হইয়াছিল। তিনি লিখিতেছেন একবার তিনি কিছু দিনের জন্য উপস্থিত ছিলেন না তাহার পর একদিন বিদ্যালয়ে আসিয়া দেখিলেন একটী বালিকার গলায় একটী স্বর্ণপদক ঝুলিতেছে, বালিকাটী তন্ময় হইয়া কার্য্য করিয়া বেড়াইতেছে, পদকের দিকে একেবারেই দৃষ্টি নাই; আর একটী বালক নিশ্চেষ্ট ভাবে মাঝখানে বসিয়া আছে; বালিকাটী সেখান দিয়া যাইতে যাইতে পদকটী হঠাৎ পড়িয়া গেল। বালকটী বলিল "তোমার পদক পড়িয়া গেল দেখিলে না? আমার যদি ওটা হ'ত ত বেশ হ'ত।" বালিকাটী তৎক্ষণাৎ বলিল। 'আমি চাই না, তুমি নিতে পার'। মন্তেসরী বলিতেছেন, তাহাদের শিক্ষয়িত্রী পুরস্কার দিয়া ভাল মন্দের পার্থক্য শিখাইতে গিয়াছিলেন। কিন্তু স্পষ্ট দেখা গেল কাযের আনন্দ যে পাইয়াছে তাহার পুরস্কারের দরকার হয় না।

শাস্তি সম্বন্ধেও তিনি বলিতেছেন যে যে সব ছেলে মেয়েকে সহজে নিয়মের মধ্যে কায করান যায় না তাহাদের পৃথক করিয়া অসুস্থের মত নানারূপ যত্ন আদর দেখান হয়। অন্য সকলে কাযে ব্যস্ত, আর নিজেকে নিশ্চেষ্ট

দেখিয়া তাহার লজ্জা হয়; তাহার উপর আবার অযথা শুশ্রূষার চাপে সে অস্থির হইয়া উঠে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে অতিশয় দুর্দ্দান্ত শিশুও ক্রমশ এইরূপে সংযত হইয়া যায়।

একটী কথা বলিয়া শেষ করিব। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক-দিগের মতে মানবশিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তাহার সঙ্গে বিশেষ সম্পত্তিরূপে তাহার পিতামাতার স্বভাব কিছু পরিমাণে লাভ করে এবং তাহার ব্যক্তিত্বটি নিগূঢ় ভাবে তাহার মধ্যে নিহিত থাকে। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষাদ্বারা যাহাতে সেই ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইয়া উঠে সেইদিকে প্রধানত লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রত্যেক শিশু অন্য হইতে বিভিন্ন; সুতরাং সকলকে একরকমে শিক্ষা দিলে চলিবে না।

শিক্ষার দায়িত্ব এইখানে। শিক্ষাক্ষেত্রে নামিবার পূর্ব্বে শিশুদিগের প্রত্যেকের বিশেষত্ব ভাল রূপে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। আপাত দৃষ্টিতে যাহাকে অতিশয় দুর্দ্দান্ত মনে হইতেছে, হয়ত বা শিক্ষাদানের ফলে তাহার ভিতর যাহা তাহার নিজস্বগুণ তাহা বিকশিত হইতে পারে। এক উপায়ে একজনের শিক্ষা ফলপ্রদ হইতে পারে কিন্তু অপর আর একজনের তাহা উপযুক্ত হইবে ইহা বলা যায় না।

অনুকূল হউক বা প্রতিকূল হউক সকল অবস্থার ভিতর দিয়া ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিবেই; কিন্তু তাহার গতি সহজ করিয়া দেওয়া যায় শিক্ষার দ্বারা। শিক্ষা দিতে গিয়া নিজের ব্যক্তিত্বটী প্রধান করিয়া সম্মুখে না ধরিয়া শিশুরা যাহাতে যথোচিত উপায়ে স্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া উঠে তাহাই লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য।

শিক্ষয়িত্রীর কর্ত্তব্য শিশুকে দিয়া কাজ করাইয়া লওয়া, তাহাকে কর্ম্মশীল রাখা, নিজে পশ্চাতে থাকিয়া শিশুর ব্যক্তিত্ব স্ফুরণে সহায়তা করা।

শ্রীসুধা দেবী।

গান

প্রখর তপন তাপে
আকাশ তৃষায় কাঁপে
বায়ু করে হাহাকার।
দীর্ঘ পথের শেষে
ডাকি মন্দিরে এসে,
খোলো, খোলো, খোলো দ্বার।
বাহির হয়েছি কবে
কার আহ্বান রবে,
এখনি মলিন হবে
প্রভাতের ফুল-হার।
খোলো, খোলো, খোলো দ্বার।

বুকে বাজে আশাহীনা
ক্ষীণ-মর্ম্মর বীণা,
জানিনা কে আছে কিনা,
সাড়া ত না পাই তার।
আজি সারাদিন ধরে'
প্রাণে সুর ওঠে ভরে',
একেলা কেমন করে',
বহিব গানের ভার?
খোলো খোলো খোলো দ্বার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভিনিগারের আমের চাট্‌নি

উপকরণ—১ সের চিনি। আধ পোয়া আদা। ১ ছটাক রসুণ। ১ ছটাক শুকনো লঙ্কা, ১ পোয়া ভিনিগার। জল—আধ সের। নুন আন্দাজ মাফিক। আম—২৫টা। প্রণালী—আম ফালি ফালি করে চিরে নিয়ে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য একত্র করে আমগুলির সঙ্গে অল্প আঁচে চড়াও তারপর জল মরে গিয়ে যখন ত্বচারটে ফুটে জেলির মত ঘন হয়ে আসবে তখন নামিয়ে নাও, ঠাণ্ডা হলে শিশিতে পুরে রাখ।

শ্রীবিনয়িনী দেবী

ষোলো কৈ

এক গ্রামে এক তাঁতি ছিল। একদিন তাঁতির মাছ খেতে বড় সাধ গেল। এক জেলের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে জাল নিয়ে মাছ ধরতে চল্‌ল। সেদিন তাঁতির অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল, বড় বড় ষোলটি কৈ জালে ধরা পড়্‌ল। তাঁতিনীকে মাছ ক'টা ভাল করে রাঁধতে বলে সে কাপড় বেচতে হাটে গেল।

তাঁতির হাট থেকে ফিরতে বেলাও হ'ল ঢের, ক্ষিদেও পেয়েছে তেমনি। বেচারী তাঁতি পথে আস্‌ছে আর ভাবছে বাড়ী গিয়ে এখনি তাঁতিনীর হাতে রাঁধা ঝোল, ঝাল, টক, কত কি খাবে। সেই ভেবে তার পথের ক্লান্তি অনেকটা দূর হয়ে গেল।

তার পরে তেতে পুড়ে বাড়ী পৌঁছে চট্‌ করে পুকুরে একটা ডুব দিয়ে নিয়ে খেতে ত বস্‌ল। ওমা! পাতে মোটে একটি মাছ। তাঁতিনী পনেরোটি মাছ উদরসাৎ করে বাকি একটি তাঁতির ভাগে রেখেছিল। তাঁতির তখন ভারি রাগ হ'ল। চটে মটে তাঁতিনীকে জিজ্ঞেস করলে, "ষোলোটা মাছের মধ্যে মোটে এই একটি মাছ? আর সব কি হ'ল?"

তাঁতিনী তখন একে একে হিসেব দিতে বসল।

"কৈ ত ষোলো
ত্বটো গেল চাবি আর পোলো।"

'চাবি পোলো' এক রকম জালকে বলে। যার জাল নিয়ে ছিল তাকে ত্বটো মাছ দিয়েছে।

"বাকি থাকে চোদ্দ
ত্বটো গেল বামুন আর বৈদ্য।"

তাঁতিনীর কোনো দিকেই বাদ যায় না, ধর্ম্মবুদ্ধিটুকুও ছিল।

"বাকি রইল বারো,
ত্বটোয় কিনলাম সারো!
(রাঢ় দেশে কচুকে সারো বলে।)
"বাকি রইল দশ
ত্বটোয় কিনলাম ঝাল ঝস্‌"।

'ঝাল ঝস্‌' অর্থে ঝাল মশলা। তাঁতিনীর উপস্থিত বুদ্ধিকে বাহবা! ঝালের সঙ্গে একটা অকারণ 'ঝস্‌' জুড়ে দিয়ে বেশ কাজ চালিয়ে দিয়েছে।

"বাকি রইল আট
ত্বটোয় কিনলাম কাট।

তবে থাকে ছয়

পড়শীকে দুটো দিতে হয়।"

এই ছত্রটি পড়িলে মনে হয় ছয়ে আসিয়া তাঁতিগিন্নীকে কথা খুঁজিতে একটু ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল।

"তবে রইল চার

ধোপা নাপিত কি ভার?"

আর আর তাঁতিনীর দান করিয়া কিছুতে আশ মিটিতেছে না। ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও পাড়া পড়শীকে বিলাইয়া সে ক্ষান্ত দিল না, ধোপা নাপিত ও বাদ পড়িল না। এত লোককেই যদি দিল তবে ধোপা নাপিতকে দিতেই কি যত ভার বোধ হইবে—তাঁতিনীর তেমন ছোট নজর নয়!

"তবে থাকে দুই

একটা বেড়ালে করলে ভুঁই।"

বেচারা তাঁতির সহিত কি অবশেষে বেড়ালটাও বাদ সাধিল!

"বাকি থাকে এক

পাত পানে চেয়ে দেখ।

যদি হোস্ ভাল মানুষের পো

তবে মুড়োর দিকটা খেয়ে ল্যাজার দিকটা থো"।

পনোরোটা মাছ খাইয়াও শেষছত্রে কৈ মাছের ল্যাজার প্রতি তাঁতিনীর লোলুপতায় না হাসিয়া থাকা যায় না।

এই গল্পটির জন্মস্থান কোথায় সে বিষয় সন্দেহ করিবার প্রয়োজন হইবে না। এই একটি লাইনে মৎস্য-প্রিয় বাঙ্গালীর বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার অনুরূপ একটি হিন্দী গল্প বেহারে প্রচলিত আছে। দেশভেদে ও রুচিভেদে গল্পের বিষয়ের পরিবর্ত্তন্ হইয়াছে মাত্র, কাঠামোটা কিন্তু একই। সুজলা সুফলা মৎস্য বহুলা বঙ্গদেশের "ষোলো কই"ই মহিষ প্রধান বেহারে আসিয়া "ষোলো ভঁয়স" এ পরিণত হইয়াছে অথবা বাংলার আব্‌হাওয়ার গুণে বেচারী মহিষের শিং ও চতুষ্পদ খসিয়া গিয়া মীন শ্রেষ্ঠ 'কৈ' এ রূপান্তর লাভ করিয়াছে কিনা তাহা তত্ত্বানুসন্ধী সুধীগণের আলোচ্য। আপনারা যদি অনুমতি দেন্ তবে এই অকিঞ্চনের ঝুলি হইতে সেটিকেও সাহস করিয়া সুধীবর্গ সমীপে আনয়ন করি।

ষোলেকা লেখা

তেওয়ারিসিং বিদেশ যাবে। তার এখন ষোলটি মোষ ছিল সেই হোল তার এক মহা ভাবনা কার কাছে সেগুলো রেখে যায়। অনেক ভেবে চিন্তে তেওয়ারি শেষে তার বহুকেলে বন্ধু রামলালের কাছে সেগুলো রেখে যাওয়া সব চেয়ে নিরাপদ বলে স্থির করলে। যাত্রার সব আয়োজন করে তেওয়ারি রামলালের হাতে তার 'ভঁয়স্' ক'টি সমর্পন করে নিশ্চিন্ত মনে বিদেশ গেল।

ছ'মাস বাদে ফিরে এসে তেওয়ারি 'দোস্তের' কাছে মোষ চাইতে গেল। দোস্তকে সেলাম করে সে বল্লে; "আব্ ত দেখা ষোলেকা লেখা"। অর্থাৎ "এইবার ষোলটার হিসাব দাও ত!"

রামলাল। ষোলেকা হিসাবমে লিখা চারঠো আঁখ্‌মে নাহি দেখা। (ষোলটার হিসাবে লেখা যে চারটে ত আমি চোখে দেখিনি।)

তেওয়ারি—অহ্—

রামলাল। চার ঠো ত দহ্‌মে গিয়া বহ্। (চারটে ত দ'য়ে ভেসে গেছে।)

তেওয়ারি। এয় সা?

রামলাল। চারঠো ত মার্ দিয়া সরকারী ভঁয়সা। (চারটে ত জমিদারের মোষ মেরে দিয়েছে।)

তেওয়ারি। এঁও?

রামলাল। আউর চারঠো ত চরায়েকো লেও। (আর চারটে ত আমার চরানোর পারিশ্রমিক।)

হতবুদ্ধি তেওয়ারি বন্ধুর এই বিচিত্র "ষোলেকা লেখা" শুনে মাথায় হাত দিয়ে সেখানে বসে পড়ল।

(অকিঞ্চনের ঝুলি।)

নেপালী রাজ অন্তঃপুর

প্রিয়বরাষু—

আমি যেখানে আছি এ যেন সেই সাত সমুদ্দুর তেরনদী পারের রূপ কথার দেশ! রাজার সাতমহলাবাড়ী, সাতশো রাণী। পাট রাণী দুজন। তাদের দুধে আলতা গোলা কোমল গায়ে হাওয়ার মত হালকা, আকাশের মত নীল ওড়না। নিটোল হাতে হীরের কাঁকন, গলায় মুক্তোর মালা, আর মেঘের মত কাল চুলে সাদা লাল, নীল ফুলের গুচ্ছ! টোপ খাওয়া গোলাপী গালের পাশে, কালচুলের নীচে চুনির দুল উঁকি মারতে থাকে। রাণী বাগানে হাওয়া খেতে যান—সঙ্গে যায় সাতশো দাসী। অমনি চারিদিকে মধুর বাঁশী বেজে ওঠে, হাজার সেপাই নত হয়ে সেলাম করে, রাণী মৃদু হেসে নমস্কার করেন। রাণী মাটিতে পা ফেলতে পাছে কোমল পায়ে ব্যথা বাজে তাই সাতশো দাসী পথে তাদের আঁচল বিছিয়ে দেয় রাণী স্থলপদ্মের মত পায়ে আগুণ বরণ নিরেট সোনার মল পরে ধীরে চলে যান পথে যেন ফুল ফুটে ওঠে! রাণী চলে যান দাসীরা ধুলো-মাখা আঁচল তুলে গায়ে দিয়ে নিজেকে সার্থক মনে করে। রাণীর গোলাপ ফুলের মত মুখে ভ্রমরের মত কাল অলক-গুচ্ছ বাতাসের সঙ্গে দুলে দুলে খেলা করতে আসে অমনি সাতশো দাসী ছুটে আসে তাদের তুলে দিতে।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসে রাণীরা ফিরে যান, রাজার দুপাশে দুজন বসে গল্প করেন, হাসেন রাজা খেতে যান দুপাশে দুই রাণী মাঝখানে রাজা—সারি সারি রূপার বাটী গেলাস মাঝখানে প্রকাণ্ড সোনার থালা তাতে বেলফুলের মত সাদা পাঁচ সের চালের ভাত। রাজা একটু খানি খেয়ে দুপাশের দুই রাণীকে পাতের প্রসাদ ভাগ করে দেন। বাকি দাস দাসীরা সবাই ভাগ করে খায়।

রাজা রাণী গোলাপজল মিশান জলে আঁচান, সোনার থড়কে খান। রাজা চলেন আগে আগে রাণীরা পিছনে—দাসীরা পথে আতর ছিটতে ছিটাতে যায়। দুই রাণীর হাত ধরে রাজা শোবার ঘরে যান, প্রকাণ্ড রূপার খাটে—দুইরাণীকে দুপাশে নিয়ে রাজা ঘুমান। দাসীরা কেউ সোনার বাঁট দেওয়া চামর দুলাতে থাকে কেউ বা মধুর বাঁশী বাজাতে থাকে কেউবা বীণা বাজাতে থাকে—যাতে রাজা রাণীর তাড়া তাড়ি ঘুম আসে। রাজা, কখনো দয়া করে একবার অন্য রাণীদের ঘরে যান, হেসে দুটি মিষ্টি কথা বলেন, তাতেই তারা মহাখুসী। এই তো হ'ল এদেশের ব্যাপার। এর একটি কথাও বানানো নয়।

শ্রীপারুল দেবী।

টোটকা টুটকি

(সংগ্রহ)

সাধারণ আমাশয়—

প্রথম অবস্থায় শুঁঠের গুঁড়া ও আখের গুড় মিশাইয়া এক তোলা ওজন করিয়া যথাক্রমে বড়দের একতোলা, মাঝারিদের আধতোলা ও শিশুদের সিকি তোলা খাওয়ান যাইতে পারে। দিনে নিয়মিত চারবার খাওয়াইতে হয়।

যদি কিছু দিনের পুরান আমাশয় হয়তাহা হইলে কয়েকটি কচি কুল পাতা, একটু লবণ ও কয়েকটি গোলমরিচ একসঙ্গে বাটিয়া দিনে তিন বার খাওয়াইলে উপকার হয়।

রক্ত আমাশয়—

কিছু ডালিমের খোসা, দুটি বড় "কুকুরশোঁকা" (সাধারণ ভাষায় কুক্‌শিমে বলিয়া থাকে) গাছের শিকড়, কিছু মৌরী ও অল্প ইসবগুল একসঙ্গে একসের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে। একসের জল যখন এক পোয়ায় দাঁড়া-ইবে তখন নামাইয়া তাহার সহিত পরিমাণ মত কাশীর চিনি অথবা মিছরি মিশাইয়া একটু গরম থাকিতে থাকিতে দিনে চারবার খাওয়াইতে হয়। এই ঔষধে শীঘ্রই খুব উপকার পাওয়া যায়।

একটা 'ক্ষিরুই' এর গাছ কিছু মৌরী ও একটু চিনি একসঙ্গে বাটিয়া খাওয়াইলেও উপকার হয়।

সাধারণ হজমী ওষুধ।

হজম্ না হইলে বা পেট কামড়াইলে বিট নুন ও পিঁপুল এক সঙ্গে গুঁড়াইয়া খাইলে উপকার হয়।

শ্রীবাসন্তী দেবী।

Printed & Published by Jagadananda Roy, at the Santiniketan Press, Santiniketan.

শ্রেয়সী পত্রিকার নিয়মাবলী

১। শ্রেয়সীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ২ দুই টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা।

বৈশাখ মাস হইতে পর বৎসরের চৈত্র পর্য্যন্ত শ্রেয়সীর বৎসর গণনা করা হয়। যিনি যে বৎসরের গ্রাহক হইবেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে পত্রিকা দেওয়া হইবে।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে শ্রেয়সী প্রকাশিত হয়। কোন গ্রাহক সময় মত না পাইলে ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৩। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পত্রিকা প্রকাশের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমাদিগকে জানাইবেন নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী থাকিব না।

৪। শান্তিনিকেতনবাসীদের জন্য শ্রেয়সীর বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

৫। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থাদি ও চিঠি পত্র পাঠাইবেন।

৬। ডাকমাশুল সমেত চিঠি না দিলে কাহারও চিঠির জবাব দেওয়া হয় না।

বীরভূম
শান্তিনিকেতন পোঃ

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীপ্রতিমা দেবী
শ্রীরমা দেবী।

১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা আষাঢ়, ১৩২৯ সাল

শ্রেয়সী

মাসিক পত্র

সম্পাদিকা—শ্রীকিরণবালা সেন

মূল্য, বার্ষিক সডাক ২৲ টাকা।

শ্রেয়সী

মাসিক পত্র

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্য মেত
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীনাঃ
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুর্ভবতি।
হীয়তেঽর্থাৎ য উ শ্রেয়োবৃণীতে ॥"

"শ্রেয়ঃ প্রেয় সবাইকে পায়।
দেখে' বেছে' ন্যায়্ যে যেটা চায় ॥
যে ন্যায়্ শ্রেয়—সে পায় কূল।
যে ন্যায়্ প্রেয়—খোয়ায় মূল ॥"

কঠোপনিষদ্।
১ম অধ্যায়, ২য় বল্লী, ২য় শ্লোক।

১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

আষাঢ়, ১৩২৯ সাল

গান

আজ আকাশের মনের কথা
ঝরঝর বাজে
সারাপ্রহর আমার বুকের মাঝে ॥
দিঘির কালো জলের পরে
মেঘের ছায়া ঘনিয়ে ধরে।
বাতাস বহে বিশ্বের কোন্
প্রাচীন বেদনা যে
সারাপ্রহর আমার বুকের মাঝে ॥

আঁধার বাতায়নে
একলা আমার কানাকানি
ঐ আকাশের সনে।
ম্লান স্মৃতির বাণী যত
পল্লব মর্ম্মরের মত
সজল সুরে ওঠে জেগে
ঝিল্লিমুখর সাঁঝে
সারাপ্রহর আমার বুকের মাঝে ॥

১৪ই আষাঢ় ১৩২৯।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আষাঢ় আবার আসে

আষাঢ় আবার আসে কালো তার
বড় ডানা মেলে,
আকাশ মেদিনী তল ছায়ায় ছাইয়া ফেলে,
জঠরে বিপুল ক্ষুধা, জলধির সব সুধা
আনিয়াছে লুটে,
নবজাত বৈনতেয় তবু ঊর্দ্ধে চলিয়াছে ছুটে,
দেবতার সুধাভাণ্ড নামিবে সে নিয়ে চঞ্চু পুটে !

সে সুধা বর্ষণ হবে ধরণীর ভরণের তরে,
তড়াগ সরসী যত কাঁপিয়ে সলিল-লীলা ভরে,
কলতানে নদনদী চলে যাবে নিরবধি
বহিয়া পরাণে
ভূধরের মর্ম্মকথা বসুধার উচ্ছ্বসিত গানে,
গোপন রহস্য কত ঢেলে দিতে জলধির কানে !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

২০৷৩৷২২

মণ্ডলীর মূল্য

আজকাল অনেক সময়ই মনে হয়, আমাদের কিসের যেন একটা অভাব হ'য়েছে, কি যেন একটা আমাদের করতে হবে অথচ আমরা করছি না ; অবহেলা করে সেটাকে ঠেলে ফেলে রেখেছি। সেই ঠেলে ফেলা জিনিসটা আমাদের ক্রমাগতই খোঁচা দিচ্ছে, আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে তাকে একেবারে ভুলে থাকতে পারছি না। অথচ এ অভাব বোধটা যে আমাদের খুব স্পষ্ট হয়েছে তা নয়। প্রাণহীন শরীরে যেমন হাত, পা, চোখ, মুখ সবই থেকেও একটা কিসের অভাব পরিস্কার বুঝিয়ে দেয় যে সে ঘুমন্ত নয় মৃত, তার এ সুপ্তি মহা সুষুপ্তি, তেমনি পরিস্কার করে আমরা আমাদের অভাবটাকে বুঝিনি বটে ; তবু মনে হয় আমাদের খাওয়া দাওয়া কথাবার্ত্তা, হাসিগল্প, দু'টো চারটে সভা সমিতি, ইস্কুল পাঠশালা সবই আছে, কিন্তু সবের মূলে যেটা থাকা চাই সেইটাই যেন নেই, তাই আমরা আর একটা কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছি। একদিন ছিল যখন আমাদের অবস্থাটা ঠিক এই রকমই ছিল, কিন্তু সেটাই আমাদের পরিতৃপ্ত করে রেখেছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত সময়টা কেবল নিছক কুড়েমি করে না কাটিয়ে কোন না কোন একটা কাজে কাটাতে পারলেই আমরা মনে করতাম সময়টা আমাদের ফাঁকি দিয়ে উড়ে পালাতে পারেনি, তার ঘাড় ধরে কিছু আদায় করে তবে ছেড়েছি। তাহলে আর কি ? কাজ এইখানেই শেষ। এই সব নানা কাজের মেলার মধ্যে একটা বিশেষ ধারা আছে কি নেই, কাজগুলির মধ্যে কোন মিল কি যোগ আছে কি না, তারা একটী কোন দৃঢ় সূত্রে একে একে গ্রথিত হয়ে উঠেছে কি না এবং হলেই বা সে সূত্র সম্বন্ধে আমরা সচেতন কি অচেতন এসব খেয়াল আমাদের ছিল না।

আজ কিন্তু ঐ খেয়ালটুকু এসেছে। শুধু সময়টাকে কাজের বোঝায় ভারী করে আমাদের মন উঠছে না। সে আরও কিছু চায়। আমাদের নিজেদের কাজ কর্ম্ম গতি-বিধি আর জগৎব্যাপার সম্বন্ধে কত হাজার চিন্তা কল্পনা, আমাদের মনের দরজায় উঁকি দিয়ে মনটাকে অস্থির করে তুলেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তাদের কোনটারই আমরা ভাল করে নাগাল পাই না। তারা কেবল আভাস দিয়ে যায়, অনেক সময় ছোটো একটা কথায় রূপ ধরে, অনেক সময় হয়ত কথা তাকে ভাল করে বাঁধতেই পারে না। স্রোতের মত পরিস্কার একটি চিন্তার ধারা আমাদের মনের ভিতর দিয়ে বয়ে যায় না। আমাদের যত রকমের অভাব

অভিযোগ আছে, যত ছোট বড় ভাববার কথা আছে, সবগুলো যেন হুড়হুড়ি করে এ ওর ঘাড়ে এসে পড়ে। তাতে সব কটাই একে একে চাপা পড়ে যেতে থাকে, কারুরই কোন মীমাংসা হয় না। কোন বিষয়টাকেই চেপে ধরে তলিয়ে দেখা আমাদের হয় না। কূল কিনারা না পেয়ে আমরা সব কটার আশাই একসঙ্গে ছেড়ে দিই। তারা তখন আবার ঘুমিয়ে পড়ে; আমাদের মনে হয় এ অরণ্যের মাঝখানে কিছুর সন্ধান করা বৃথা। এরকম জায়গায় কি করা দরকার? জটপাকানো এই চিন্তাগুলো ছুড়ে ফেলে না দিয়ে একে একে ছাড়িয়ে রাখাই দরকার। এ কাজটা কিন্তু একলা হয় না। দুজন জুটলেই অনেক সময় একটা গ্রন্থি খুলে যায়। কাজেই পাঁচজন জুটলে সেটা আরও সহজ হয়ে উঠে। যে চিন্তাটাকে আমি হয়তো রূপ দিতে পারছি না সেটাকে আরেকজন আপনা থেকেই বিশেষ মূর্ত্তি দিয়ে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। তাতে আমাদের সেই সুপ্ত চিন্তাগুলি সোনার কাঠির পরশে জেগে উঠে।

এই যে অনেকগুলি মানুষের মিলনে গঠিত একটি প্রাণময় সমষ্টি, সেটা হচ্ছে তারি অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষের জীবনের সোনার কাঠি। একজনের চেতনার স্পর্শে আর একজনের অচেতন প্রাণ জেগে উঠে। এখানে আমরা প্রত্যেকেই কিছু কিছু দিয়ে অনেকখানি পাই। মাত্র দু'টী লোকের মধ্যে কথা হলে দু'জনেই কেবল একজন মাত্র লোকের কাছে কিছু পায়। কিন্তু একটা সুগঠিত মণ্ডলীর মধ্যে যখন বহু এক হয়ে যায়, তখন শুধু সেই আগের দেওয়াটুকু দিলে পায় অনেকখানি। এই রকম করে এক একজনের কণা কণা দানে সেই এক একজনই প্রতিদান পায় পর্ব্বত প্রমাণ।

আর একটা কথাও বলা যায়—যখন কোন মানুষ এই রকম একটা প্রাণের স্রোতের মধ্যে এসে পড়ে, তখন সে আর এক নিমিষের জন্যেও ভুলে যেতে পারে না যে সে মানুষ। প্রাণের আনন্দে জেগে থাকতে যদি কেউ চায়, তবে তাকে প্রাণের সঙ্গে যোগ রাখতে হ'বে। তা হলে তার খোরাক আর ফুরিয়ে যাবে না। নিজের জীবনের গণ্ডীটানা এতটুকু নিয়ে দিন কাটিয়ে সেইটুকু ফুরিয়ে গেলে মরে পড়ে যেতে হবে না। আর সকল প্রাণের ধারা তার প্রাণে প্রবাহিত হয়ে এসে তার জীবনের স্রোতটীর প্রবাহ চিরকাল বজায় রেখে দেবে।

সেইজন্য যেমন অনেক মানুষের মিলনের দরকার তেমনি অনেক রকমের মানুষের মিলনও চাই। কোন একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের বাইরে তার প্রসার আর হতে পাবে না, তা নয়; এমনকি কতকগুলো নির্দ্দিষ্ট বিষয় ছাড়া আর কোন বিষয় সেখানে উঠবে না, তাও নয়। মানুষের মনের যত প্রশ্ন যত চিন্তা মীমাংসালাভের জন্য অন্যের সাহায্য চাইতে পারে সব কথাই এ ক্ষেত্রে উঠতে দেওয়া উচিত।

এই রকম করে নানা দিক থেকে সাড়া পেতে পেতে এবং ক্রমাগত ঘা খেতে খেতে মানুষের মনের কোণে কোণে যত রুদ্ধ দরজা আছে সব কটিই খুলে যাবে। অন্ধের মতন চোখ বুজে সে আর কোন কাজ করবে না। তার মধ্যে যা কিছু অচেতন ও অর্দ্ধচেতন ভাবে আছে সবেরই বিকাশ হবে, এবং যা নেই তাও সে নেই বলেই পরিষ্কার বুঝবে। এই যে একটা স্বপ্নের মতন আধঘুম আধজাগরণের ভাব সে ঘোর কেটে গিয়ে উজ্জ্বল আলোতে সমস্ত জিনিস তার নিজ মূর্ত্তিতে দেখা দেবে।

বাইরের জগতের সঙ্গে একরকম পরিচয় নেই বলেই সকল বিষয়ে সেই আবছায়া ঝাপসা ভাবটা আমাদের মেয়েদের মধ্যে এখনো খুব বেশী করে আছে। কোন বিষয় ভাবতে হলে এত বেশী জিনিষ আমাদের কল্পনা করে নিতে হয়, যে সেটা একটা প্রায় আজগুবি ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আগাগোড়া আনুমানিক ঠাট তৈরি করে কোন জিনিসের মীমাংসা করাও বিশেষ সোজা নয়। কাজেই আমাদের বাধ্য হয়ে সে সব ভাবনা ছেড়ে দিতে হয়।

আমরা মানুষ অথচ মানুষ বল্লে যে কতখানি বোঝায় তা জানবার আমাদের সুযোগ প্রায় কিছুই নেই। মানুষের জীবন, মানুষের প্রাণ যে কি বিরাট

রূপ, তাতে যে অহরহ কত ঘাত প্রতিঘাত চলেছে, তা আমরা একেবারেই জানিনা।

মানুষের মধ্যে অর্দ্ধেক পুরুষ জাতিকে তো আমরা নিজে-দের পরিবারের পাঁচটী সাতটীতেই শেষ করে ফেলেছি। মেয়েদেরও যে বড় বিশেষ জানিশুনি তা বলা যায় না। আমরা যাদের চিনি, তাদের চেহারা আর গলার স্বরটুকু বাস্তবিক চিনি, তাকে প্রায় চিনিই না।

কিন্তু এই ভিতরের মানুষগুলিকে চেনাই আমাদের আসল চেনা। তা না হলে হাজার রকমের মানুষের হাজার রকমের বিশেষত্ব আর আমরা জানলাম কি? জগৎ জুড়ে এই যে সব মানুষের সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ, মিলন সংগ্রাম কত কিছু চলেছে তার তো আমরা কিছুই প্রায় জানি না। আবার যদি বা কিছু জানি, পা নেই, মুখ নেই বলে আমরা সেটুকুও আর কাউকে জানতে দিতে পারি না। তাই আজ আমাদেরই বিশেষ করে জগতের সঙ্গে পরিচয় হওয়া দরকার আমাদেরই চোখবাঁধা জাল ছিঁড়ে ফেলা দরকার।

মেয়েদের মধ্যে যাঁদের আদর্শটা হয়ে গেছে খানিকটা উঁচু, অথচ চলতে হয় প্রায় সেই সাবেকি চালে তাঁদেরই আরও বেশী সঙ্গীন অবস্থা।

যারা সেই অন্ধের চালটাকে উচিত বলে জেনেছে, তাদের পক্ষে তেমন ভাবে চলাটা কিছু বেশী কষ্টকরও নয়, অসুবিধা-জনকও নয়, এবং তাদের এ কাজে দোষ দেওয়াও চলে না। কিন্তু যে হাঁটতে চলতে শিখেছে, তাকে যদি ঘাড়ে করে সারাক্ষণ বেড়ানো যায় তাহলে তো তার অঙ্গ অবশ হ'য়ে যাবে, আর চলার আনন্দে বঞ্চিত হয়ে প্রাণটাও হাঁপিয়ে উঠবে। তা ছাড়া চোখ থাকতে চোখ বুজে চলার মত সে কাজটাও একটা মস্ত ভুল। আমাদের অবস্থা কিন্তু অনেকটা তাই; আমরা জেনে শুনেই মুখ চোখ বুজে গতানুগতিকের মত চলেছি।

এতে যে আমাদের মনে বেশ একটা তৃপ্তির ভাব আছে তা নেই। অসন্তোষ জেগেছে, আমরা একটু একটু বুঝি যে আমাদের আর ভেসে চলবার দিন নেই, তবু কিন্তু আমরা নিজেদের গতিকে আপনার অনুগত করবার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারছি না। আমাদের সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক সব রকম দিকেই অনেক বড় বড় অভাব অভিযোগ আছে, আমরা নিজ নিজ জীবনের দিকে তাকালেই বলতে পারি যে আমরা সে গুলো বুঝতে শিখেছি, সেই জন্য বেশ স্বচ্ছন্দ চিত্তে আর সেগুলো করে যেতে পারি না, মনে একটু খটকা লাগে; কিন্তু ঝাপসা ভাবে সব বুঝি বলে বেশী কিছু আমরা কাজের মত কাজ করি না। যাঁরা বাইরের সঙ্গে খানিকটা যুক্ত আছেন, যাঁরা শুধু নিজেদের নিয়ে আর নেই তেমন যে দু'চার জন মানুষ আছেন, সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে তাঁদের সকলের সঙ্গে যোগেই আমাদেরও ঝাপসা ভাবটা কেটে যেতে পারে।

পূর্ণ মানুষ হবার জন্যে স্ত্রী পুরুষের পরস্পরকে না চিনলেও যে চলবে না সে তো বলাই বাহুল্য। একজন মনস্বী ব্যক্তি-একবার বলেছিলেন—মেয়েরা আছেন ব্যক্তিকে নিয়ে আর পুরুষরা আছেন তাঁর আইডিয়া নিয়ে। এই যে দুটি, এর একটা সামঞ্জস্য কোন খানে না করলে চলবে না। আমরা আমাদের পরিবারের কটি লোক আর দুএকজন আত্মীয় বন্ধু নিয়েই যদি থাকি, যদি সব জায়গাতেই মানুষকে ব্যক্তি বিশেষ রূপে কেবল দেখি তবে হয়ত আমরা ক্রমে ছোটর দিকে নামতে নামতে অতি তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে পড়ে থাক্‌বো। চোখের সামনে জগতের যে ক্ষুদ্র কোণটুকু ভাসছে, তাতে যে লোকটিকে চোখে দেখছি তার সুখ দুঃখের বেশী উপরে আর উঠতে পারব না। চোখের আড়ালে যে এত বড় বিশ্বজোড়া ব্যাপার চলেছে, তার আমরা ধার দিয়েও যাবনা, এবং সাম-নের ছোটটুকুর জন্যে আড়ালের বড়টাকে একেবারে বিস-র্জ্জন দেব। মনটাও ক্রমে সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠবে।

আর পুরুষ যদি তাঁর আইডিয়া নিয়েই থাকেন, তবে হয়ত ক্রমে কল্পনার জগৎ নিয়েই এমন মেতে উঠবেন যে আর চাক্ষুষ জগৎটা দেখতেই পাবেন না। হয়ত মনে করবেন জগতে দুঃখ দারিদ্র্য তো আছেই, একজনব্যক্তি বিশেষের দুঃখ মোচনে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করি কেন? তার চেয়ে

জগতের দুঃখের মূল কারণটা আগে খুঁজে বার করলেই ত হয়। বিশেষের দিকে ঝোঁক দিলেই যেমন বড়টাকে আর দেখবার সময় থাকে না, সমস্ত জগৎজুড়ে দেখতে গেলে তেমনি ঘরের কোণটা বাইরে থেকে যায়। বড়কে যদি একেবারে পাওয়া যেত, তাহলে ত কথাই ছিল না, কিন্তু ব্যক্তি সমষ্টি নিয়েই তো তার উৎপত্তি, ব্যক্তিকে একেবারে উপেক্ষা করলে তাকে কখনই পাওয়া যাবে না।

কাজেই আমাদের মুক্তি পেতে হলে বা নেই তারি ভিতর দিয়ে সে মুক্তি লাভ করতে হবে। জগৎকে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, তার সামঞ্জস্য করে আমাদের প্রকৃত দৃষ্টি লাভ করতে হবে।

তাই আজ আমাদের বেরিয়ে পড়তেই হবে; যদি পথ এখানে তৈরি নাও হয়ে থাকে, যদি লক্ষ্য চোখে এখনও পরিষ্কার নাও দেখে থাকি, তবু তার সন্ধানে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের পায়ে পায়েই পথ গড়ে উঠবে। সেই পথই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। দুঃখকে যদি স্বাগত বলে বরণ করতে হয়, ক্ষতি যদি অঙ্গের অলঙ্কার হয়, তবু যাত্রার পথ ছেড়ে ঘরের অন্ধকারে শঙ্কায় আর মুখ লুকোলে চলবে না।

শ্রীশান্তা দেবী।

গ্রন্থ সাহেব

প্রায় দশ বৎসরের কথা। সেবার আমরা অমৃতসর গিয়াছিলাম। সেবার সে দেশে ভয়ানক মহামারী। তখন কি ভীষণ দৃশ্য সে দেশের! লোকশূন্য গৃহ, জনশূন্য পল্লী! পথেও পথিক নাই। কেবল দেখা যায় কম্বল মুড়ি দিয়া পীড়িতেরা সারি সারি খাটিয়ায় পড়িয়া আছে। সমস্ত দেশ ভরিয়া এমন একটা শূন্য শ্মশানের ভাব যে তাহা প্রকাশ করিতে পারি না।

অমৃতসর কেবল যে তীর্থস্থান মাত্র তাহা নহে, এটা একটা খুব বড় বাণিজ্যের স্থান। কিন্তু তখন তাহার কোন বিশেষ লক্ষণ আমরা দেখিতে পাইলাম না। হাট বাজার দোকান সব বন্ধ, কাজেই আমরা আর কি বুঝিব? দেশটা ভরিয়া কেবল শ্মশানের মত একটা উদাস নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল।

আমরা একটি আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। গুরু মন্দির ছাড়া আর কোন আনন্দকর জিনিষই সেখানে দেখিলাম না। সন্ধ্যায় আমরা গুরু-মন্দির দেখিতে বাহির হইলাম। পথে দেখিবার কিছুই নাই, কোথাও কোনই উৎসাহ নাই। এইরূপ অবস্থাতেও দেখিলাম গুরু দরবারে আরতি গান চলিয়াছে। চারিদিকের আর সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভজন সেবা আরতি বন্ধ হয় নাই। ইহাতেই বুঝিলাম যে এখনও এখানে সেবার নিষ্ঠা আছে।

প্রকাণ্ড সরোবরের মধ্যে মন্দির। কি যে সুন্দর তাহা বলিতে পারি না। দিনে তাহার শোভা দেখি নাই। আমরা যখন দেখি তখন শুক্লা একাদশীর সন্ধ্যাকাল।

মন্দিরের উপরে উঠিলাম। সরোবরের জলে জ্যোৎস্না পড়িয়া তরল রূপার মত চিক্‌চিক্ করিতেছে। তাহার উপরে শ্বেত পাথরের মন্দিরটী ভাসিতেছে এবং তাহার উপরে স্বর্ণ চূড়া। মন্দিরটী মুসলমান কারুকার্য্যের কি হিন্দু কারুকার্য্যের তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, আমার সে শক্তিও নাই। তাহাতে বোধ হয় দুইয়েরই মিশ্রণ ছিল, কারণ দুই দলের ভক্তি লইয়াই এই মন্দির গঠিত।

তখন আরতি হইতেছিল। একদল সুকণ্ঠ বালক, বৃদ্ধ ও যুবা, দীপ, অর্ঘ্য, ফুল ও মালা লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আরতি গান করিতেছিলেন। এই পবিত্র দৃশ্যের মধ্যে "এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর" গানটি চিত্তে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল।

আমরা নীচে নামিয়া মন্দিরের বারান্দায় গেলাম। দেখিলাম কয়েকজন সাধু গ্রন্থ সাহেবের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গান গাহিয়া আরতি করিতেছেন। মহামারীতে মন্দিরের নিত্য সেবক কেহ কেহ মারা গিয়াছেন, কেহ কেহ শয্যাগত তবু দেবমন্দির সিংহাসনের নীচের ভজন সহজে বন্ধ হইবার নহে, তাই মন্দিরের আসন্ন দুর্গতির খবর পাইয়া বাহির হইতে কয়েকটী নানক-পন্থী সাধু আসিয়া এই সব কাজে লাগিয়া গিয়াছেন।

একটি বৃদ্ধ সাধু বীণা বাজাইয়া "বাদৈ বাদৈ রম্যবীণ বাদৈ" গাহিতেছিলেন। এখানে গ্রন্থ পূজা হয়। গুরু নানকের যে সব অমর বাণী গুরু অর্জ্জুন সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, সেই বাণী গ্রন্থের নাম "আদি গ্রন্থ" বা "গ্রন্থসাহেব।" সিংহাসনে স্থাপিত এই গ্রন্থসাহেবের সম্মুখে আরতি ও পূজা হয়।

কোথায় অনাদি অনন্ত ব্রহ্মের পূজা, আর কোথায় এক খানা গ্রন্থের পূজা! অনন্তের পূজার একি বিড়ম্বনা! যুক্তি যাহাই বলুক, কিন্তু ইহাদের নিষ্ঠা দেখিলে মনের গোপন কোণে একটু শ্রদ্ধা না হইয়া যেন যায় না। নিরঞ্জন অনাদি, অনন্ত পুরুষের পূজা হইবেই বা কিরূপে "কৈসী আরতি হোবে ভব খণ্ডন তেরী আরতি?"—হে ভবখণ্ডন তোমার আরতি ত অনন্ত বিশ্ব অনাহত শব্দ ভেরীতে নৃত্য করিতেছে। মানব তোমার আরতি করিবে কোথায়? কোথায় মানবের শির ভক্তিতে নত হইবে?

সেই অরূপ নিরঞ্জনের আনন্দই প্রকাশে। সেই প্রকাশই বাণী। এই যে "বাদৈ বাদৈ রম্যবীণ বাদৈ" এই সুরেই তাঁহার আনন্দ বিশ্বরূপে প্রকাশ। সমস্ত বিশ্ব চরাচরই সেই অরূপ নিরঞ্জনের বাণী। এই বাণীর সুরেই ভকত-চিত্ত নাচে, গায়, প্রণত হয়। এই বাণীর কাছে বিশ্ব চরাচর অবনত মস্তকে পূজারত; এই বাণীতেই অনুভবের অতীত পরব্রহ্ম আপনাকে প্রণত করিয়াছেন।

এই বাণীও ত বিনা সাধনায় অনুভব করা যায় না। আমরা এই সব কথা লিখিতেও পারি, বলিতেও পারি; কিন্তু অনুভব কি করি? এই বাণীর প্রকাশের সঙ্গে আমাদের চেতনার ও সাধনার ত যোগ নাই।

মানুষ যখন তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় পূজার বস্তু খুঁজিয়া বেড়ায় তখন তাহাকে নাস্তিক বলিলেও চলে। সে যন্ত্রের মত উঠে বসে, পূজার খেলা করে, কিন্তু পূজনীয়কে জানে না। এমনি সময় এক একজন সাধু মহাপুরুষ আসিয়া উদিত হন। তাঁহারা বিশ্বনাথের যে বাণী আপনি প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই সাধনায় নিজস্ব করিয়া লইয়া মানব-ভাষায় প্রকাশ করেন। সেই মানব ভাষার বাণীও অগ্নিময়ী। তাহাতে গৃহীর গৃহ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, ভোগীর ভোগ উড়িয়া যায়, মায়াহতের মায়া খসিয়া পড়ে। জীবন, মৃত্যু, লাভ, ক্ষতি, সুখ, দুঃখ, নামকীর্ত্তনের সুখে সব লুটের মত উড়াইয়া দিয়া মহাপুরুষের চরণধূলায় দেহ লুটাইয়া সকলে ঘরের বাহির হইয়া পড়ে। মহেশের অনুচর প্রমথগণের ন্যায় সেই সব মানুষের আর তখন ভূত ভবিষ্যত থাকে না। মহাপুরুষের যে বাণী, প্রলয় ডমরুর মত বাজিতে থাকে, তাহার নাদে তাহাদের সব বন্ধন কোথায় খসিয়া ভাসিয়া উড়িয়া যায়।

গুরু নানকের এমনি প্রভাব যে বিষয়ী লোক বিষয় ছাড়িয়া সাধনায় ডুবিয়া গিয়াছেন, তপস্বী হইয়া তপস্যার অচল আসনে বসিয়াছেন। গুরু নানকের তিরোধানের বহুকাল পরে আবার যখন ভারত অন্ধকার হইয়া আসিল, আবার যখন গুরু গোবিন্দ এই বাণীরই দোহাই দিয়া ডাক দিলেন তখন জীবন আহুতি দিতেও লোকে দ্বিধা করিল না। সুখভোগ বিলাস স্নেহবন্ধন সব বলি দিয়া, প্রাণ উৎসর্গ করিয়া সবাই ইহার আহ্বানে সাড়া দিল।

লক্ষ লক্ষ মানবের আত্মবলি চলিল; হৃদয়ের দীপ, ভক্তির অর্ঘ্য, প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি লইয়া সেই মহাপুরুষ নানকের মন্দিরের বেদীতলে পূজার উৎসব চলিতে লাগিল।

ক্রমে সে দিনও গেল, দিন আরও অন্ধকার হইয়া আসিল। মানুষের দৃষ্টি আরও মলিন, কর্ণ আরও জড় ও স্তব্ধ হইয়া গেল।

আজ তাই সেই সব বাণীর মৃত অবশেষ পুস্তকের পাতায় লিখিয়া গ্রন্থ করিয়া, সেই প্রাণহীন গ্রন্থের উপর বহু মূল্য আস্তরণ দিয়া, ফুল পাতা ধূপ দীপ গন্ধ দিয়া, নৃত্য গীত বাদ্যে মানুষ পূজারতি চালাইতেছে।

শুক্লা একাদশীর জ্যোৎস্না-ধৌত শুভ্র ও স্বর্ণময় মন্দিরটী যেন মানস সরোবরের স্বর্ণ কমল। সেই পবিত্র চন্দ্রালোকে সরোবরের মধ্যে মন্দিরের প্রাঙ্গণে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম —সত্যই কি আজ পূজা এমনই প্রাণহীন?

না, আজও যেন অনেক স্তাবক মূল্যবান আচ্ছাদনে মণ্ডিত এই কাগজের পুঁথির সীমা ছাড়াইয়া আপন আপন চিত্তকে সেই সব মহাপুরুষের জীবন্ত বাণীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সেই অমৃতরসে হৃদয় ভরিয়া তুলিতেছেন। তাঁহাদের পূজা, সাধনা, ত্যাগ, বৈরাগ্য তাই অত্যন্ত সহজ ও জীবন্ত; দুই চারিজন সাধু নিশ্চয়ই তাঁহাদের চিত্তকে সেই মন্দিরের সীমাও ছাড়াইয়া সেই অরূপ অসীম নিরঞ্জনের বিশ্ববাণীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের 'প্রণত চিত্ত সাজে বিশ্ব-শোভায় লুটায়ে' তাঁহাদেরই 'ভকত চিত্ত সাজে বিশ্ব-ছন্দে মাতিয়ে।'

প্রসাদ লইয়া আমরা সে দিন মন্দির হইতে অপসৃত হইলাম। সামান্য একটু মিষ্ট প্রসাদ। আজ বহু স্থানেই সেই আরতির "বাদে বাদে রম্যবীণ বাদৈ' ও 'এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর' শুনিতে পাই। এখনও শুনিলে হঠাৎ মনের মধ্যে সেই শ্মশানপুরী আর তাহার মধ্যের সেই রম্য সরোবর, সেই শুক্লা একাদশীর সন্ধ্যা, সেই মর্ম্মর-নির্ম্মিত ভিত্তি, সেই স্বর্ণ মণ্ডিত দেবালয়, সেই আরতি সেই গান আর সেই ভক্তির উৎসব, সমস্ত যেন ছবির মতন ভাসিয়া উঠে।

যদি সেই গুরু মন্দির হইতে কোন প্রসাদ সেই দিন আমাদের সঙ্গে আসিয়া থাকে তবে তাহা এই দুই একটী সুর ও ভজন।

শুনিয়াছি যে বৃদ্ধ সাধুটী সে দিন বীণা বাজাইয়া ভজন গাহিতেছিলেন তাঁহাকে ছুটী দিয়া তাঁহার স্থান লইবার জন্য কোন লোক আসিতেছিল না। দিনের পর দিন চলিল: কিন্তু কে আসিবে? সবাই যে শয্যাগত বা একেবারে লোকান্তরিত। খবর পাইয়া দূরের সাধুরা যখন আসিলেন, তখন একজন আসিয়া দেখিলেন সেই ক্লান্ত শক্তিহীন বৃদ্ধ সাধু ক্রমাগত তিন দিন ধরিয়া বীণা লইয়া কোন মতে অখণ্ডিত ভজন চালাইতেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি যখন নাই তখন ভজন বন্ধ করিলে ত আর চলিবে না। দেব-মন্দিরের যে গীত কয় শতাব্দী ধরিয়া সমানে চলিয়াছে তাহা কি আজ তাঁহার অক্ষমতায় বন্ধ হইবে?

দেহে প্রাণ থাকিতে বন্ধ হইবে না। লোক আসিল। বৃদ্ধ ভক্ত বীণা রাখিলেন। অবসন্ন দেহ প্রাণশূন্য হইয়া মন্দিরে লুটাইয়া পড়িল।

এই বৃদ্ধের কণ্ঠ কি শুধু পুঁথির গাথা গাহিয়াছে? ইহার প্রাণ নিশ্চয়ই এই গ্রন্থ, এই মন্দির ছাড়াইয়া জগৎ সিংহাসনের বিশ্বারতি-বেদীতে উপবিষ্ট জগন্নাথের চরণতলে উপস্থিত হইয়াছে। সেই আরতির অনাহত গান যে শুনিয়াছে, প্রাণ তাহার কাছে এতই তুচ্ছ, ত্যাগ তাহার এতই সহজ, মৃত্যু তাহার এমনই শান্তিময়।

শ্রীকিরণবালা সেন।

বেড়াল ঠাকুরঝি

[রূপকথা মেয়েদের মুখে যেমন শোনা যায় ঠিক তেমনি লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। এগুলি পড়িলেই বুঝা যাইবে এ সমস্তই অখ্যাতনাম্নী মেয়েদেরই রচনা, তাহাদেরই প্রতিদিনের ঘরকরনার হাঁড়ি কুঁড়ির অন্তরের কথা। তা ছাড়া ইহার মধ্যে মানব-মনের যে প্রকৃতি পরিচয় পাওয়া যায় তাহারও আধার এই বংলা দেশের গ্রামের অন্তঃপুরে। অবশ্য মানবপ্রকৃতি ভিতরে সকল জায়গাতেই সমান, কিন্তু তাহার বাহিরের চেহারাটা দেশ-ভেদে অবস্থাভেদে ভিন্ন। এই গল্পগুলির ভিতরে যে চেহারা পাওয়া যায় তাহার বিশেষ রস আছে এবং তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য। নিম্নলিখিত গল্পটি বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গুপ্ত তাঁহার বর্ষীয়সী আত্মীয়ার মুখ হইতে লিখিয়া লইয়াছেন। একটা কথা বলা আবশ্যক ভিন্ন ভিন্ন জেলায় এই গল্পটিরই কিছু কিছু রূপান্তর ঘটিয়াছে।]

একটা বেড়াল গেরস্তদের রান্নাঘরে উনুনের পাশে আরামে বসে আছে। বাইরে খুব বিষ্টি পড়ছে, আর একটা কুকুর ছুটি ভাত খাবার আশায় উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌চে।

বেড়াল তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—

ভিজ্‌চিস্ টিজ্‌চিস্ পাচ্চিস্ কি ?

তাই শুনে কুকুরের খুব রাগ হোল, সে বল্‌লে—

মর্‌লো হাঁড়িখাগি তোর তা কি ?

বেড়াল মুখ বেঁকিয়ে জবাব দিলে—

জানিস্‌নে আমি যে রান্নাঘরের ঠাকুরঝি।

এদিকে হয়েচে কি—রাত্তিরে বেড়াল গেরস্তদের হাঁড়ি খেয়েচে। সকালে বাড়ীর ছেলেরা উঠে খড়ের দড়ি গলায় বেঁধে তাকে বিদেয় করতে চলেচে। এখন রাত্তিরের সেই কুকুরটা সেখানে বসে ছিল, সে তাকে দেখে বল্‌লে—

কাল যে বড় শুনেছিলাম চ্যাটাং চ্যাটাং কথা

বলি বিচুলির দড়ি গলায় দিয়ে যাওয়া হচ্চে কোথা ?

বেড়াল দেখলে তার মান আর তো থাকে না, তাই সে হেসে জবাব দিলে—

মৎস্য খাইনি মাংস খাইনি ধর্ম্মে দিয়েচি মন

তাই নাতি পুতিতে নিয়ে যাচ্চে শ্রীবৃন্দাবন ॥

শিশু-শিক্ষা

মার্কিন দেশীয় অনৈক মহিলা—মিসেস্ ষ্টোনার—তাঁহার Natural Education (স্বভাব শিক্ষা) গ্রন্থে আপনার কন্যার শিক্ষা প্রসঙ্গে সাধারণভাবে শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি সারগর্ভ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা সেই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের সারাংশ লিখিতে চেষ্টা করিব।

প্রত্যেক শিশু বিশেষ কোন গুণ বা শক্তি লইয়া জন্মায়। অশেষ প্রতিকূলতা ও নির্ম্মম উদাসীনতার মধ্য দিয়াও কাহারও কাহারও ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইয়া চারিদিকে সৌরভ বিস্তার করে, কিন্তু শিক্ষা ও যত্নের অভাবে কত শিশু-প্রাণের স্ফুরণ হইতে পারে না, বাহিরে তাহাদিগকে জীবন্ত দেখিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাদের শক্তি নির্ব্বাপিত।

অনেক মাতা শিশুদিগের শরীরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ বায়ু শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহারা সন্তানদিগের জন্য তাহা ব্যবস্থা করেন, তাহাদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন—এ সকলের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় না। কিন্তু মানবশিশু ত কেবল শরীর লইয়াই জন্মায় নাই। শরীরের সহিত সমানভাবে তাহার মনকে বিকশিত করিতে চেষ্টা না করিলে আমাদের কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

কেহ কেহ মনে করেন সাত আট বছরের পূর্ব্বে শিশু-দিগকে কিছু শিখাইবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছভাবে খেলিয়া বেড়াইতে দেওয়া উচিত।

তাঁহারা মনে করেন দেরী করিয়া শিক্ষা আরম্ভ হইলে অতি শীঘ্র শিশুরা উন্নতি করে। কোন কোন শিশু হয় ত বিলম্বে শিক্ষা আরম্ভ করিয়া উন্নতি করিয়াছে কিন্তু তাহা-দিগের মধ্যে কেহ আপনাদের বিদ্যা বা কর্ম্মের বলে পৃথিবীতে নাম রাখিয়া গিয়াছেন এমন দেখা যায় না; হয় ত বা আরও শীঘ্র তাঁহাদের শিক্ষা আরম্ভ হইলে তাঁহারা আরও খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন।

প্রতিভা দুই রকমের হইতে পারে। একটী বিশেষ দিকে কাহারও শক্তির বিকাশ হইলে তাহাকে একমুখী প্রতিভা বলা যায়। অনেক সময় একটী দিকে অস্বাভাবিক ভাবে সকলশক্তি ও মনোযোগ নিয়োজিত হওয়ায় মনের সমতা নষ্ট হইয়া যায়; অন্য নানা বিষয় অজ্ঞ ও উদাসীন হওয়ায় মনের প্রসারতা চলিয়া যায়। সেইজন্য অনেক সময় লোকে এই প্রকার প্রতিভাবান্ ব্যক্তিকে উন্মাদ আখ্যা দেয়। প্রতিভাবান্ ব্যক্তিকে উন্মাদ হইতে হইবে এমন নহে; কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে বিশেষ দিকে প্রতিভার বিকাশ হইতে হইতে শেষে সেই শক্তিই সেই ব্যক্তির সুখের কারণ না হইয়া বরং অশান্তির কারণ হয়। অতিরিক্ত সাধনা করিতে করিতে আপনাকে সংযত করিবার মত মনের সমতা ও শক্তি হারাইয়া ফেলিতে হয়। সুতরাং সাধারণভাবে সকল দিকের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আপ-নাকে সংযত করিবার মত মনের বিচারশক্তি ও সমতা থাকা প্রয়োজন।—একমুখী প্রতিভা জগতে থাকিবেই, কিন্তু সর্ব্বতোমুখী প্রতিভারই সাধন করিতে হইবে। গাছের সঙ্গে মানুষের তুলনা করা যাইতে পারে। সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমভাবে বাড়িয়া উঠিলে তাহার বিকাশ সম্পূর্ণ হই-য়াছে বলা যায়, তেমনি সমানভাবে সকলশক্তির উৎকর্ষ সাধনেই মানবের পূর্ণ বিকাশ; শিক্ষা দান করিতে গিয়া ইহা মনে রাখিতে হইবে।

দেখা যায় খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ অতি অল্প বয়সেই তাঁহা-দের শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন ইঁহাদের কথা বিভিন্ন, কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে চেষ্টা করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রত্যেক শিশুকেই তাহার জগতের সঙ্গে নূতন পরিচয় হওয়ার সময়ই যদি তাহার বিশেষত্ব জানিয়া সেইমতে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা হইলে শিক্ষা তাহার নিকট সরস ও সহজ হয়; জগতের সহিত পরিচয় তাহার শীঘ্র ও সুন্দর হয়।

কেহ কেহ বলেন অতিশীঘ্র ও অধিক শিক্ষার ফলে

শিশুদিগের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়; এমন কি মৃত্যুও হইতে পারে। কয়েকটী শিশুর মৃত্যু হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহার কারণ শিক্ষার চাপ নয়। অনেকস্থলেই 'অত্যাশ্চর্য্য জীব' হিসাবে দর্শনীয় বলিয়া তাহাদিগের বিশ্রাম, আহার নিদ্রার প্রতি না তাকাইয়া ক্রমাগত নানাস্থানে তাহাদিগের বিদ্যা অযথা দেখাইয়া বেড়ানর ফলেই তাহাদিগের মৃত্যু ডাকিয়া আনা হইয়াছে। যথাযোগ্য আহার ও বিশ্রাম পাইলে শরীরের ক্ষতি হওয়া দূরের কথা মনের স্ফুরণে স্বাস্থ্য ভাল থাকে—ইহার অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

কোনও বিষয় জানিতে বা করিতে ভাল না লাগিলেও তাহা করিতে হইলে, মনের অবসাদে অথবা অযথা মানসিক উত্তেজনায় শরীরের ক্ষতি করে। ঠিক এইগুলিই শিশুদের ঘটিবার সুযোগ দেওয়া হয় বলিয়াই আমাদের শরীর নষ্ট হইবার দোহাই দিতে হয়। অল্প বয়সের প্রথম শিক্ষার উৎসাহের মুখে আমরা খোরাক দিই না; তাহার পর উৎসাহের অবসানে জোর করিয়া আমরা নানাবিষয় শিখাইতে গিয়া ঐরূপ কুফল প্রাপ্ত হই।

হার্বার্ট স্পেনসার বলেন শরীরকে যেরূপ অনাহার ক্লিষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়, মনকে সেরূপই অভুক্ত রাখিলে চলিবে না। শিশুর প্রথম মনের (জ্ঞানের) উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা আরম্ভ হওয়া দরকার, কিন্তু তাহা চিত্তাকর্ষক-ভাবে হওয়া চাই। শাস্তির ভয় দেখাইয়া যাহার শিক্ষা আরম্ভ হয়, পরেও যে সে শিখিতে ভয় পাইবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যথা সময়ে স্বাভাবিকভাবে যে প্রথমে শিক্ষার আলোক পাইয়াছে, সারাজীবন সে শিক্ষার মর্য্যাদা রক্ষা করিবে ইহা ধ্রুব সত্য।

পিতামাতা উভয়েই শিশুর সহিত তাহার মত করিয়া মিশিবেন ইহা দরকার। শিক্ষাদাতা যে উপর হইতে শিশুকে সকল জিনিস আলগা ভাবে বলিয়া দিবেন এবং শিশু নির্ব্বিচারে তাহা মানিয়া লইবে এ ধারণা চলিয়া যাইতেছে। শিশুর সম্মুখে শিক্ষনীয় বিষয়গুলি এরূপভাবে আনিতে হইবে যে শিশু আপনা হইতে উৎসাহে তাহা জানিতে চায় এবং আপনার বিচারশক্তি দ্বারা তাহা আপনার জ্ঞানের ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে। যে বিষয় জানিতে শিশু যত বেশী উৎসুক হয় সে বিষয়ে তত শীঘ্র শিখে।

মিসেস্ ষ্টোনার বলেন তাঁহার কন্যা অতি অল্প বয়সে কবিতা রচনা করিতে শিখে। ইহার কারণ তিনি প্রথম হইতে বিখ্যাত কবিদের কবিতা তাহার নিকট আবৃত্তি করিতেন। কবিতাগুলির ছন্দ ও সৌন্দর্য্য এইরূপে অজ্ঞাত-ভাবে তাহার মনে ছাপ দিয়াছে—এবং তাহার মনের গতি এইদিকে লইয়া গিয়াছে।

শ্রীসুধাময়ী দেবী

লঙ্কার আচার

উপকরণ:—কাঁচা লঙ্কা ৵১ সের, চিনি ৵।॰ পোয়া, সরিষার তেল, হিং, পাঁচ ফোড়ন, হলুদ ধনে, তেঁতুল, নুন আন্দাজ মত।

প্রণালী:—প্রথমে কাঁচা লঙ্কাগুলিকে কুচি কুচি করিয়া কাটিতে হইবে, পরে কড়ায় আন্দাজ মত সরিষার তেল দিয়া তাহাতে পাঁচ ফোড়ন, হিং ফোড়ন দিয়া ফোড়ন হইলে লঙ্কাগুলি ফেলিতে হইবে। লঙ্কাগুলি বেশ ভাজা-ভাজা হইলে তাহাতে তেঁতুল গুলিয়া জল আধ পোয়া, ধনে ও হলুদ-বাটা আন্দাজ মত দিতে হইবে। পরে জল মরিয়া মাখা মাখা হইলে নুন ও চিনি দিয়া নামাইতে হইবে। এই আচার ৬ মাসের বেশী থাকে না।

রামশিলা

প্রায় আঠার বৎসর আগে আমরা যখন গয়ায় যাই, তখন আমাদের বাসা ছিল রামশিলা পাহাড়ের পার্শ্ববর্ত্তী গণ্ডশৈলের উপর। বাড়ীটি কোনও নবাবের তৈয়ারী, এখন কালের অত্যাচারে তাহার নানাস্থান ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে—কিন্তু তবু তাহার বিশাল পার্ব্বত্য প্রস্তরময় প্রাচীর অতীত গৌরব ও মুসলমানী আবরুর সাক্ষ্য স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। দুই মহলা বাড়ী, বাহির বাড়ী এখনকার বাংলা ফ্যাসানে প্রস্তুত বড় বড় দরজা জানলায় শোভিত—কিন্তু অন্দরে সেই সাবেকীকালের ঘর, কোনও খান দিয়া আলো ও বাতাস আসিয়া পাছে বেগম মহলের পর্দ্দা ঘুচাইয়া দেয় সেই ভয়ে তাহার কোথাও জানালা কি গবাক্ষ কিছুই নাই, সামনের বারান্দা বেশ চওড়া তাহাও বড় বড় মোটা থাম দিয়া ঘেরা। সেই খানে চিক টাঙ্গাইয়া বেগম সাহেবা হাওয়া খাইতেন। তার পরেই চাতাল ও উঠান, সম্মুখস্থ অঙ্গন ও প্রাচীর ইটের পরিবর্ত্তে পাথর দিয়া গাঁথা। মাটির নীচে তয়খানা; গয়ার প্রচণ্ড গরমের জন্য ও দেশের সকল ধনীরাই মাটির নীচে ঘর রাখিতেন। গ্রীষ্মের দিনে দ্বিপ্রহরে ভূমধ্যস্থ ঘরগুলি সত্যই উপভোগ্য। বাড়ীর সীমানার বাহিরে কতকটা জায়গা তাহাকে উপত্যকাও বলা চলে, সেইখানে নবাবদের পারিবারিক গোরস্থান ও কারবালা। নিকটে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী, সেটি পার্ব্বত্য ঝরনার জলে সবসময় পরিপূর্ণ। একটি কূপও আছে কিন্তু সেটি মহরমের সময়কার "তাজিয়া" প্রভৃতি বিসর্জ্জনের ফলে অব্যবহার্য্য। ইহার পরেই খ্রীষ্টানদের গোরস্থান নানাবিধ সুন্দর সুন্দর ফল ও ফুলের গাছে সুন্দর সুসজ্জিত হইয়া মৃত্যুকেও লোভনীয় করিয়া রাখিয়াছে। পার্শ্বদেশে রামশিলা পাহাড় তাহার বিরাট কায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় পাহাড়েশ্বরের মন্দির; এই মন্দিরের দেবতাকে সকলে স্পর্শ করিতে পায়। দেবতার মাথায় হাত দিলে শীতল বায়ুর প্রবাহ অনুভূত হয়। ঐ হাওয়া যে কোথা হইতে আসে তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

পর্ব্বতের পদতলে অন্তঃসলিলা ফল্গু তার বালুকাময় বক্ষ বিস্তীর্ণ করিয়া পড়িয়া আছে। নদীর মধ্যভাগে একটি আমের বাগান, কখনও কখনও সেখানে সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয় ও তাঁহাদের সম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতি শোনা যায়। অত বড় নদী কিন্তু তাহাতে একান্ত জলাভাব। নদীর জল দরকার হইলে রাত্রে কোদাল দিয়া মাটি কাটিয়া রাখে, সমস্ত রাত অল্প অল্প জল সঞ্চিত হয়। পাহাড়ের উপরে উঠিবার জন্য একশত পঁচাত্তরটি সিঁড়ি আছে। এই সিঁড়ি টিকারীর রাজার প্রস্তুত। নীচেকার মন্দির ও অতিথিশালাও ইঁহাদের কীর্ত্তি। অনেক আতুর প্রত্যহ এখানে আহার পায়; মন্দিরগুলিতে দর্শনীয় অনেক আছে।

পাহাড়ের উপর হইতে চারি পাশের দৃশ্য বড়ই চমৎকার। তিন দিকে ধান্য ক্ষেত্র ও সবজির বাগান ও বাড়ীগুলি ঠিক যেন খেলাঘরের মত দেখায়। সম্মুখে ফল্গু ও সমান ভূমি। আমরা অনেক দেশ দেখিয়াছি কিন্তু এখানকার যে গম্ভীর দৃশ্য তাহা আর কোথাও দেখিব বলিয়া মনে হয় না। এখানে আসিলে যেন শোক দুঃখ তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। কত দিন আগে দেখিয়াছি তার স্মৃতি এখনও মনের মধ্যে অম্লানভাবে জাগিয়া আছে ও চির দিন থাকিবে।

শ্রীমাধুরী দেবী।

টোটকা টুটকি

গরমের ফোড়া—ছোট ছোট গরমের ফোড়ার প্রথম ঔষধ সাদা চন্দন ঘষিয়া তাহার উপর লাগান। এই সকল ফোড়ার, চন্দনে কোনও উপকার না হইয়া যদি ক্রমে বড় হইতে থাকে, তাহা হইলে রাঁধুনী বাটিয়া গরম করিয়া ঘি দিয়া তিন চারিবার লাগাইলে উপকার হয়।

বড় ফোড়া—ধুতুরা পাতায় একটু ঘি মাখাইয়া অল্প একটু সেঁকিয়া দুই ঘণ্টা অন্তর ফোড়ার উপর লাগাইতে হয়। এই পাতা লাগাইলে ফোড়া পাকিয়া যায়, ফাটিয়া যায় এবং ফাটিয়া যাওয়ার পর যে ঘা থাকে তাহাও সারিয়া যায়।

সিজুপাতা বাটিয়া গরম করিয়া ঘি দিয়া ফোড়ার উপর লাগাইলে ফোড়া ফাটিয়া যায়।

আপাং বলিয়া এক রকম গাছ আছে তাহার শিকড় বাটিয়া বড় ফোড়ার উপর প্রলেপ দিলে ফোড়া আপনি ফাটিয়া যায়।

সাবানের ফেনার সঙ্গে চিনি মিশাইয়া ফোড়ার উপর লাগাইলে উপকার হয়।

কদম পাতার যে দিকটা মসৃণ সেই দিকটা দিয়া ফোড়া বাঁধিয়া রাখিলে ফোড়া ফাটিয়া যায় এবং কদম পাতার উল্টা পিঠ, যেটা খস্‌খসে, সেই দিকটা দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে ফোড়া বসিয়া যায়। গন্ধ বিরজা কাগজে লাগাইয়া ফোড়ার উপরে দিলে, ফোড়া বসিয়া যায়। ভাল তামাকের সঙ্গে চুন মিশাইলে জিনিষটা গরম হইয়া উঠে। সেই গরম জিনিষটা ফোড়ায় লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিলে ফোড়া বসিয়া যায়।

শ্রীবাসন্তী দেবী।
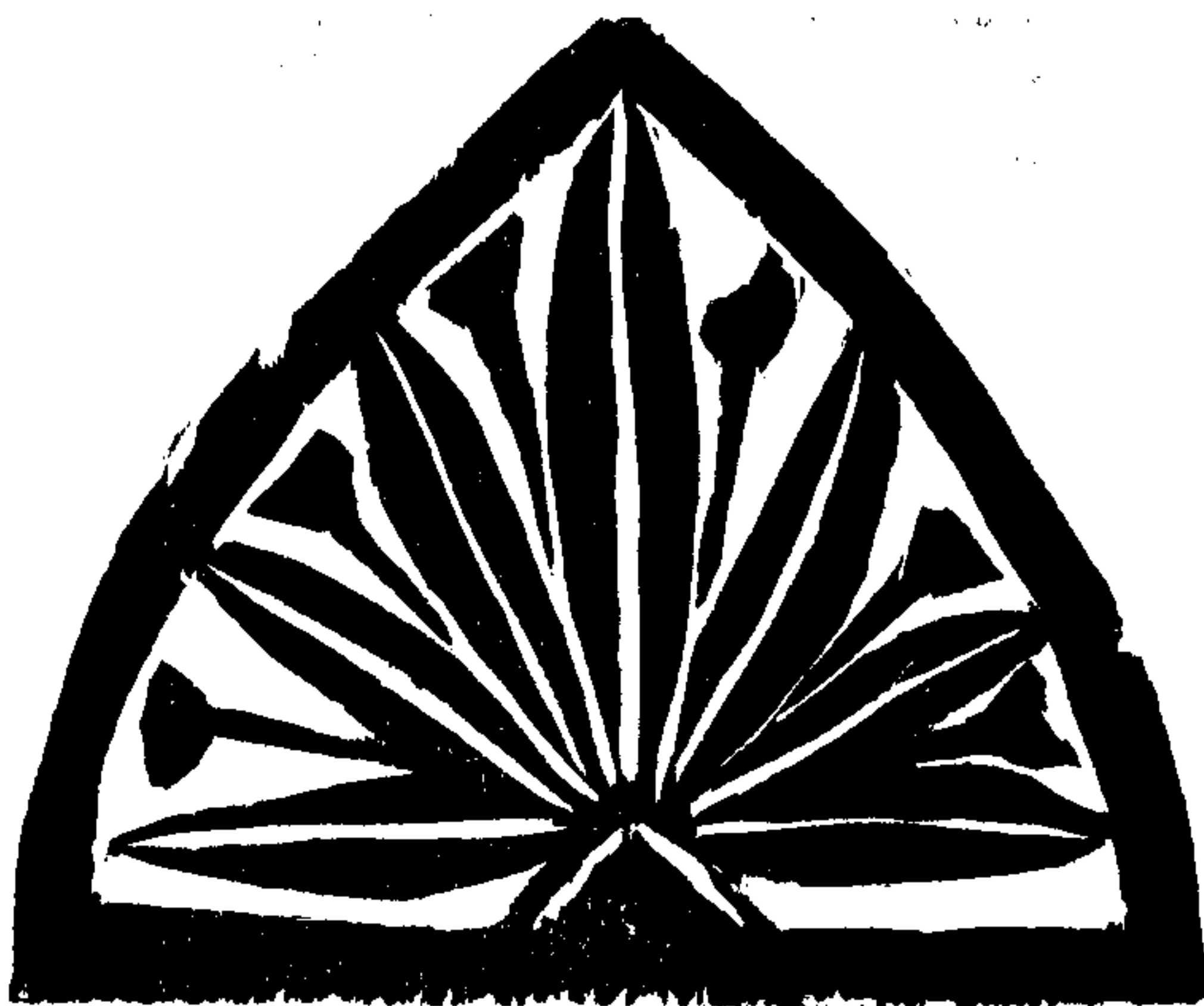
এই সংখ্যার সমুদায় চিত্রের পরিকল্পনা শ্রীমতী সবিতা দেবীর।

Printed & Published by Jagadananda Roy, at the Santiniketan Press, Santiniketan.

শ্রেয়সী পত্রিকার নিয়মাবলী

১। শ্রেয়সীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা।

বৈশাখ মাস হইতে পর বৎসরের চৈত্র পর্য্যন্ত শ্রেয়সীর বৎসর গণনা করা হয়। যিনি যে বৎসরের গ্রাহক হইবেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে পত্রিকা দেওয়া হইবে।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে শ্রেয়সী প্রকাশিত হয়। কোন গ্রাহক সময় মত না পাইলে ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৩। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পত্রিকা প্রকাশের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমাদিগকে জানাইবেন নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী থাকিব না।

৪। শান্তিনিকেতনবাসীদের জন্য শ্রেয়সীর বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

৫। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থাদি ও চিঠি পত্র পাঠাইবেন।

৬। ডাকমাশুল সমেত চিঠি না দিলে কাহারও চিঠির জবাব দেওয়া হয় না।

বীরভূম
শান্তিনিকেতন পোঃ

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীপ্রতিমাদেবী,
শ্রীরমাদেবী।

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩২৯ সাল

মাসিক পত্র

সম্পাদিকা—শ্রীকিরণবালা সেন

শ্রেয়সী

মাসিক পত্র

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্য মেত
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুর্ভবতি।
হীয়তেঽর্থাৎ য উ প্রেয়োবৃণীতে॥"

"শ্রেয়ঃ প্রেয় সবাইকে পায়।
দেখে' বেছে' ল্যায়্ যে যেটা চায়॥
যে ল্যায়্ শ্রেয়—সে পায় কূল।
যে ল্যায়্ প্রেয়—খোয়ায় মূল॥"

কঠোপনিষদ্।
১ম অধ্যায়, ২য় বল্লী।

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩২৯ সাল

সংশয়ী

কোথায় যেতে ইচ্ছে করে
শুধাস্ কি, মা, তাই?
যেখান থেকে এসেছিলেম
সেথায় যেতে চাই।
কিন্তু সে যে কোন্ জায়গা
ভাবি অনেক বা'র।
মনে আমার পড়ে না ত
একটুখানি তার।

ভাবনা আমার দেখে' বাবা
বল্লে সেদিন হেসে'
"সে জায়গাটি মেঘের পারে
সন্ধ্যা তারার দেশে"
তুমি বল, "সে দেশখানি
মাটির নীচে আছে,
যেখান থেকে ছাড়া পেয়ে
ফুল ফোটে সব গাছে।

মাসী বলে "সে দেশ আমার
আছে সাগর তলে,
সেখানেতে আঁধার ঘরে
লুকিয়ে মানিক জ্বলে।"
দাদা আমার চুল টেনে দেয়,
বলে, "বোকা ওরে,
হাওয়ায় সে দেশ মিলিয়ে আছে
দেখ্‌বি কেমন করে?"
আমি শুনে ভাবি, আছে
সকল জায়গাতেই।
শিধু মাষ্টার বলে শুধু
কোনো খানেই নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
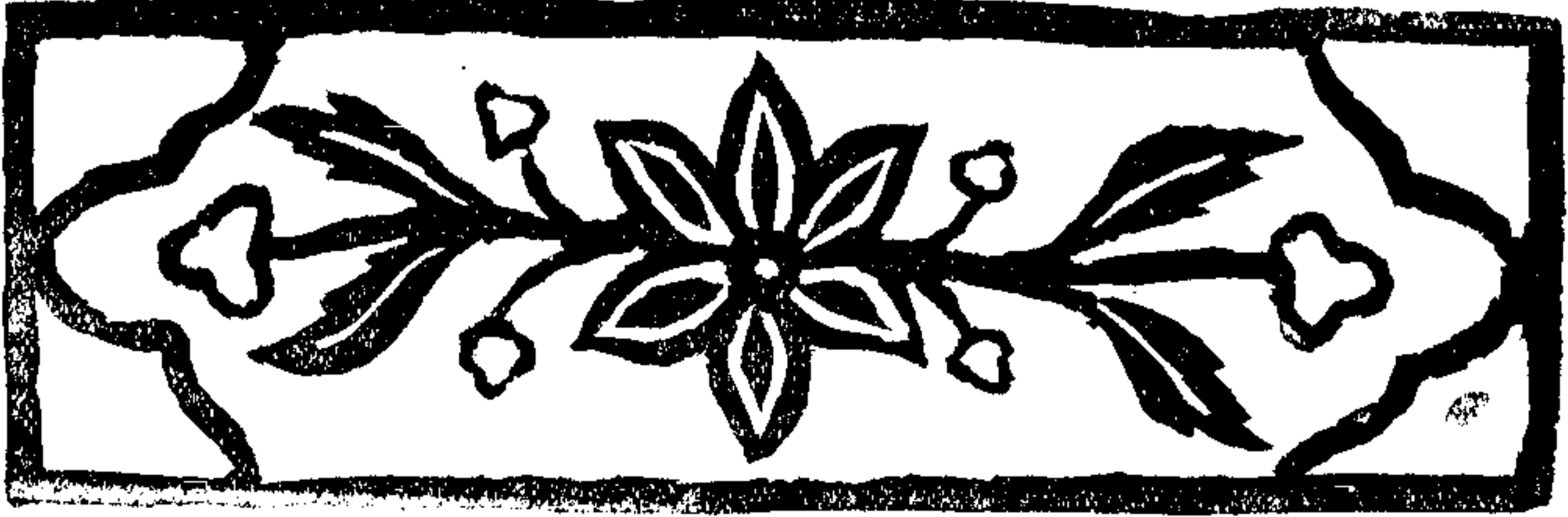
নারীর মন

পিতামহ ব্রহ্মা নাকি সৃষ্টিকার্য্যে এতই নিপুণ যে তাঁর সৃষ্টিতে কোথাও কিছুই অনাবশ্যক নাই। এমন কি আমেরিকার কোন অন্ধকার গুহায় দেখ্‌বার দরকার হয় না বলে নাকি সেখানকার সকল জীবই অন্ধ। কেবল তাঁর এই নিখুঁত নিপুণ সৃষ্টির একটি বড় অনাবশ্যক বাজে খরচ রয়ে গেছে, সেটী হল নারীর মন।

মানুষকে সৃষ্টির প্রভু করে' তার হাতে সকল সংসার সমর্পণ করে' অবশেষে সৃষ্টিকর্ত্তাদের মনে চিন্তা হল। কারণ মানুষের যে মন আছে। মন জিনিষটা এমনি দুরন্ত যে সে কেবল মানুষকে ঘর থেকে দূরে নিয়ে যায়, হাতের কাজ ছেড়ে বনের মোষ তাড়াতে পাঠায়, কিন্তু এককোণে একমনে না বস্‌লেত সৃষ্টির কাজ চলে না, তাই অনেক চিন্তার পর অবশেষে ব্রহ্মা নারীর সৃষ্টি করলেন।

তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে পুরুষ হবে গতি, নারী হবে স্থিতি, পুরুষ হবে সমুদ্রগামী নদীর ধারা আর নারী হবে' তার কূল। কিন্তু নারীর মন দিবার বেলায় ব্রহ্মা হাতের মাপ ঠিক রাখ্‌তে পারেন নি। বোধ হয় সৃষ্টি-কার্য্যের শেষে বৃদ্ধ পিতামহের ঢুল এসেছিল, কতটুকু মন রক্ষা কার্য্যের পক্ষে যথেষ্ট আর কতটুকু বেশী হলেই বা সে কার্য্যের গুরুতর ব্যাঘাত ঘটে এসব সূক্ষ্ম বিচার করবার শক্তি তখন তাঁর ছিল না। মনের ভুলে তিনি নারীকে আবশ্যকের বেশী—এমন কি বোধ হয় পুরুষের মনের চেয়ে

এক মাত্রা বেশী—মন দিয়ে ফেল্‌লেন, তাই কোথায় কথা ছিল যে আদম্ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে নন্দনবন ছেড়ে উধাও হয়ে যাবে আর ঈভ তার হাত ধরে নিবারণ করবার চেষ্টা করবে, তা নয় ঈভই প্রথম জ্ঞান লাভ করে আদমের শিক্ষা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হল।

তখন ব্রহ্মার মাথায় টনক্ নড়্‌ল। দেবতারা বল্‌লেন, সর্ব্বনাশ, এ কি বিষম ভুল ঘটেছে। পক্ষীরাজকে মৃণাল দিয়ে না বেঁধে শেষে তার সঙ্গে চাতক পাখী জুড়ে দেওয়া হ'ল। কিন্তু ব্রহ্মার বর ত আর ফের্‌বার্ নয়, নারীর মন ত আর কেড়ে নেওয়া যায় না। এর একমাত্র উপায় আছে,—পাখীর পাখা ছেঁটে ফেলা যায় না বটে তাকে খাঁচায় পুরে তার ওড়া বন্ধ করা যায়। নারীর দুরন্ত মন-পাখার সম্বন্ধেও সেইরকম আদেশ হ'ল।

তখন মেয়েদের চা'রিদিকে প্রাচীর উঠ্‌তে আরম্ভ হ'ল। দেশের প্রাচীর, ভাষার প্রাচীর, ধর্ম্মের প্রাচীর, সমাজের প্রাচীর, অবগুণ্ঠনের প্রাচীর, প্রাচীরের উপর প্রাচীর; শেষে এমন হয়ে উঠ্‌ল যে তাদে'র বামে দক্ষিণে উপরে নীচে কোথাও এক পা ফেলবার স্থান রইলনা। দেওয়াল চারিদিক থেকে এসে তাদের নিশ্বাস রোধ করে দাঁড়াল। ক্রমে তারা ভুলে গেল যে তাদের পায়ের তলায় অনন্ত পৃথিবী আর মাথার উপর অনন্ত আকাশ বিস্তৃত। তারা ভুলে গেল যে তাদের চতুর্দ্দিকে এই সংসারে অনন্তকোটী মানব নিত্য জীবনের রহস্য সমাধান করবার চেষ্টা করছে। তারা শুধু জান্‌ল তাদের চারদিকে চারটী দেওয়াল আর মাথার উপর ছোট ছাদ।

শুধু কি তাই? নানাযুগের কবিরা নানারঙের তুলিতে সেই প্রাচীর রঙিয়ে দিয়ে গেল—নানাযুগের পু'রোহিতেরা ঘণ্টা বাজিয়ে ধূপধুনা জ্বালিয়ে সেই প্রাচীরের উপর মন্ত্র পড়ে দিয়ে গেল—ক্রমশঃ সেই প্রাচীরই মেয়েদের গর্ব্বের সাধের আদরের জিনিষ হয়ে উঠল। শেষে এমন হয়ে দাঁড়াল যে সাত প্রাচীরের বন্দিনীরা গর্ব্বে পাঁচ প্রাচীরের বন্দিনীদের সঙ্গে কথা কন্ না, আবার তিন প্রাচীরের বন্দিনীরা ঈর্ষাভরে পাঁচ প্রচীরের কারাগারের দিকে তাকায়। দেবতাদের মনে আশ্বাস হ'ল যে নারীদের সুখসুপ্ত মন বোধ হয় আর জাগ্‌বেনা।

কিন্তু হলে' কি হবে? যতই প্রাচীর গাঁথ চতুর্দ্দিকে যে বিপুল মেলা বসেছে ত'র খবর কেমন করে লুকাবে? সেখানে কোলাহলের আর ঠেলাঠেলির অন্ত নেই—সেখানে লোকে বেচ্‌ছে কিন্‌ছে, খেলা কর্‌ছে ঝগড়া কর্‌ছে, কারা বা লাল নিশান উড়িয়ে যুদ্ধের বাজনা বাজিয়ে সারে সারে রণক্ষেত্রে চলেছে। আবার এই হট্টগোলের মাঝে কোথাও বৈরাগীরা একতারা বাজিয়ে গান্ কর্‌ছে, রাখালের ছেলে আপন মনে বাঁশী বাজাচ্ছে, আর তার ছোট বোনটী তারই তালে তালে নাচ্‌ছে।

এরই ঠিক মধ্যিখানে নিভৃত প্রাচীরবেষ্টিত অন্তঃপুর-খানি। বাইরের এই বিপুল কল্লোলের ক্ষীণতম প্রতিধ্বনি-টুকুও কি সেখানে পৌঁছে' সেখানকার গভীর শান্তি বিচলিত করে' তোলেনা? বাইরের এই বিশাল বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্র হ'তে থেকে থেকে এক প্রবল তরঙ্গ এসে আঘাত করে, সকল প্রাচীর থর থর করে কেঁপে ওঠে, ভিতরের বন্দিনীরা চম্‌কে উঠে বলে "এ কি হল।" কখনো বা অল্প একটু বাঁশীর সুর বা অদৃশ্য নাচের নূপুর ধ্বনি শোনা যায়—খাঁচার পাখী পাখা ঝটপট করে, জিজ্ঞাসা করে "কোথায় গেল।" তখন বন্দিনীরা ছুটে আসে প্রাচীরের ফাঁক দিয়ে গবাক্ষের জালি দিয়ে আকুল হয়ে দেখ্‌বার চেষ্টা করে, প্রাচীরের ওপারে কি আছে? যদি ডাক তেমন প্রবল হয়ে আসে তখন সকল প্রাচীরই মুহূর্ত্তের মধ্যে ধূলায় মিশিয়ে যায়, অন্তঃপুরের অন্তর থেকে নারী একেবারে গিয়ে মেলার মধ্যিখানে দাঁড়ায়। জোয়ান্ অফ্ আর্ক (Joan of Arc) ত গ্রামের কুটীর ছেড়ে পথে পথে যুদ্ধ করে ঘুরেছিলেন, মীরাবাইত রাজার অন্তঃপুর থেকে বাহির হ'য়ে মন্দির প্রাঙ্গণে বসে গান্ করেছিলেন।

এমনি করে থেকে থেকে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, ব্রহ্মার নিপুণ সংসার যন্ত্রটী ঠিক্ মত চলেনা। দেবতাদের সকল

চেষ্টাই ব্যর্থ হল, এই যে অবাধ্য অসঙ্গত অনাবশ্যক নারীর মনটী—এ'কে পাপ খাইয়ে আর কোন মতেই সহজ ভাবে সংসার চালান গেলনা। সৃষ্টিকর্ত্তাদের ললাট আর প্রসন্ন হলনা, তাঁদের ভ্রূ কুঞ্চিতই রইল। তাঁদের আক্ষেপ এই যে অনেক চিন্তা ও পরিশ্রমের পর এই বৃহৎ অথচ সুনিপুণ সংসারযন্ত্রটীর সৃষ্টি হয়েছিল, অনবধানতার দোষে তাতে যে একটু সামান্য ত্রুটি রয়ে গেল, তাতে সে যন্ত্রটী আর ঠিক্‌ মত চল্‌ল না। নারীর মনটীকে যে কি উপায়ে সৃষ্টি থেকে নির্ব্বাসিত করা যায়, এ সমস্যার আজ অবধি সমাধান হ'ল না।

আশা দেবী।
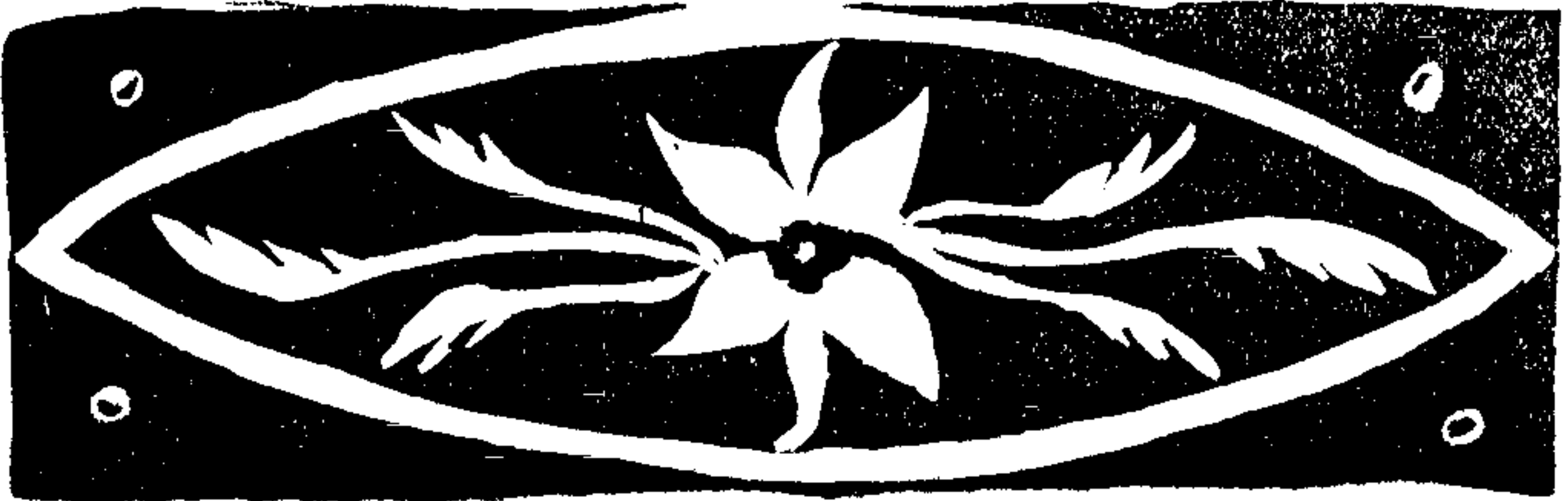
মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা

আগেকার মেয়েরা গৃহ-কাজকর্ম্মে বেশ দক্ষ ছিলেন, তৎসঙ্গ ব্রতানুষ্ঠান বেশ শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠার সহিত বিনা আয়াসে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহাদের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে একাজ করিলে তাঁহাদের কল্যাণ হইবে, না করিলে তাঁহাদের অমঙ্গল হইবে, তাই তাঁহারা একান্ত উৎসাহে সে কাজ করিয়া গিয়াছেন। এখনও মেয়েদের মধ্যে প্রাচীন যাঁহারা আছেন তাঁহারা এসব কাজ করিতে কোন প্রকার বিরক্তি বোধ করেন না। এখনকার মেয়েদের এ বিশ্বাস আদৌ নাই, তাহারা বরং একাজ হইতে প্রাচীনাদিগকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করে। যাক্‌ ব্রতটীর নাম "মঙ্গলচণ্ডী"। এই ব্রত অন্যান্য অনেক ব্রতের ন্যায় রাত্রে হয় না, দিনের বেলা হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবার এই ব্রত করিতে হয়। ব্রতাচারে মা-চণ্ডী দেবীকে ডাকাই ব্রতের উদ্দেশ্য। মঙ্গলবার ব্রত হয় বলেই বোধ হয় নাম হয়ে থাকবে মঙ্গলচণ্ডী। প্রথমে পুরোহিত ঠাকুর পা ধুইয়া আসনে বসেন। তাহার সম্মুখে মাঝখানে জলঘট বসান হয়, তার মধ্যে ৫টী পত্র সহ একটি আম্রপল্লব সিঁদুর মাখিয়া দেওয়া হয়। ধূপ, দীপ জ্বালান হয়। আতপ চাউলের ভোগ বা নৈবেদ্য দিতে হয়। তার মধ্যে কলা, কাঁঠাল, আম, শশা এবং পান যে যাহা পারে এবং যাহার যাহা অভিরুচি সে তাহা দ্বারাই নৈবেদ্য তৈয়ার করিয়া দিয়া থাকে। তৎপর ব্রত সমাপ্ত হইলে পুরোহিত ঠাকুর ব্রতের আশীর্ব্বাদীয় ফুল দ্বারা যাঁহারা যাঁহারা ব্রত করেন, তাঁহাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করেন। তারপর ব্রতের কথা হয়, তাহা মেয়েরাই বলিয়া থাকেন। যাঁহারা যাঁহারা ব্রত করেন তাঁহারা সকলেই সে সময় উপস্থিত থাকেন। ব্রতের কথা এই। এক গৃহস্থের দুই মেয়ে, প্রথমটীর নাম দুয়াই এবং ছোটটীর নাম সুয়াই। ইহারা দুই বোনই খুব সুশ্রী। শিশুকালেই এদের মাতৃবিয়োগ হয়, সেই অবধি তাহারা

একটু কষ্টে পড়িয়াছিল। তাহাদের মা মারা যাওয়ার সময়, ইহা বলিয়া গিয়াছিলেন যে, সাংসারিক কাজকর্ম্ম না করিলে যেমন সংসার থাকে না, সেইরূপ ব্রতাদি অনুষ্ঠান না করিলেও সংসারে কখনও সুখ হয় না। অতএব আমার ন্যায় তোমরাও মা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিও সুখী হইবে। তারপর মেয়েদুটী ক্রমে ক্রমে বড় হইতে লাগিল, আর মেয়ের পিতা মেয়েদের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিলেন। শিশুকালেই মাতৃহীন, মেয়েরা কোন ঘরে পড়িবে, সুখে থাকিবে কিনা এই চিন্তা পিতার মনে সর্ব্বদা তোলপাড় করিতেছে। তাহাতে নিজের সেরূপ অর্থবলও ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় কোন এক দেশের রাজা এই দেশে মৃগয়া করিতে আসিয়া কোন এক সরোবর তীরে তাম্বু ফেলিয়াছিলেন। মেয়ে দুটী ঘাটে স্নান করিতে গেলে পর রাজা তাহাদের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনিও অবিবাহিত ছিলেন। তৎপর রাজার অনুচরেরা অনুসন্ধানে মেয়েদের বাড়ী ঘর জানিয়া মেয়ের পিতার নি ট তাহার বড় মেয়েটীর রাজার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিল। মেয়ের পিতা এ সংবাদ শুনিয়া আনন্দে ভরিয়া গেলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, আমার কি এমন ভাগ্য হইবে যে আমি আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ করিব! তখনই রাজার সঙ্গে বড় মেয়ে দুয়াইর বিবাহ হইল, এবং সে স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর বাড়ী চলিল। তখন ছোট বোন সুয়াই পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিল "দেখ দিদি, সুখে থাকিয়া সব ভুলিয়া যাইও না।" কিন্তু সে রাজরাণী হইয়া সবই ভুলিয়া গেল। তখন আর তাহার পিতা বা ছোট বোনের কথা কিছুই মনে রহিল না। সে মনের সুখে দিন কাটাইতে লাগিল, কিন্তু এ সুখ তাহার চিরস্থায়ী হইল না। তারপর সুয়াইর মধ্যবিত্ত লোকের সঙ্গে বিবাহ হইল। সুয়াইর স্বামীর বাড়ীর অবস্থা খুব ভাল না হইলেও পিতার চেয়ে ভাল ছিল। সুয়াইর পূর্ব্বের কথা সর্ব্বদা মনে আছে, সে এখনও পূর্ব্বের ন্যায় সাংসারিক কাজ এবং ব্রত নিয়ম যখন যাহা করার দরকার তাহা করিতেছে। সে ঐ সংসারে গিয়াছে পর সংসারে যেন লক্ষ্মী প্রবেশ করিয়াছে এ কথা অনেকে বলিত। সে সকলকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকিত। তাহার সংসারে দিন দিনই উন্নতি হইতে লাগিল। আর ওদিকে দুয়াই রাজার নিকট পড়িয়া অতি সুখে সব ভুলিয়া গেল, এখন আর সে সংসারের কোন কাজই দেখে না। এ দিকে তাহার রাজত্বের অবস্থা ক্রমে ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল। আজ অশ্বচালক বলিল, অশ্বশালায় অশ্ব নাই, কাল গো-শালায় গরু মরিতেছে, প্রজারা অনাবৃষ্টির দরুণ হাহাকার করিতেছে, কিন্তু রাজার ভয়ে কেহই কিছু স্পষ্ট বলেনা, সকলেই কানাকানি করিয়া বলিতে লাগিল, "রাজা কোথা থেকে এই মেয়েটাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে, সেই অবধি আমরা নানা প্রকার অমঙ্গল দেখিতেছি।"

ক্রমে ক্রমে রাজার অবস্থা নিতান্তই খারাপ হইয়া পড়িল। তথাপি দুয়াইর কোন কথাই মনে পড়ে না। তখন মনের কষ্টে ছোট বোন সুয়াইরও কোন খবর বার্ত্তা নেন না। দুয়াইর দুই ছেলে ও সুয়াইর এক ছেলে হইয়াছে। সুয়াই একদিন তার ছেলেকে বলিল "দেখ বাপু! অমুক দেশের এক রাজার সহিত তোমার এক মাসীর বিবাহ হইয়াছে। আজ অনেক-দিন তাহার কোনও সংবাদ জানি না, অতএব তুমি আমার চিঠি নিয়া একবার তাহার খবর জানিয়া আইস।" ছেলে মায়ের কথামত মাসীর বাড়ী গেল, মাসী ত বোনপোকে পাইয়া খুব খুসী হইলেন। তখন একে একে ছোট বোনের অবস্থা সব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সুয়াই পরিজন প্রতিপালন, অতিথিসেবা, ব্রতনিয়ম এবং সংসারের প্রতিদিনকার কাজ প্রতিদিনই সুচারুভাবে নির্ব্বাহ করিতেছে, এবং সংসারের অনেক উন্নতি করিয়াছে, এসব শুনিয়া দুয়াই খুব সুখী হইল। কিন্তু তবুও তাহার নিজের কথা স্মরণ হইল না। শেষে বোনপোর সঙ্গে তাহাদের বাড়ী চলিল। রাস্তায় বাহির হইয়াই দেখে এক শস্যপূর্ণ ধান ক্ষেতে ধান পাকিয়া কি শোভা দেখা যাইতেছে। কুমারেরা মাটির হাঁড়ি, পাতিল কড়া, সাজ ইত্যাদি নানাপ্রকার জিনিষ তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে। একটা বাগানে নানাপ্রকার গাছে নানাবিধ ফল ধরিয়া ঝুলিয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছে। অদূরে একটা

সরোবরে কতকগুলি পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, এবং তাহাতে হাঁসের দল মনের আনন্দে খেলা করিতেছে। এই সব দেখিতে দেখিতে তাহারা চলিল। কিছুদুর যাইয়া পিছনদিকে চাহিয়া দেখে সেই যে শস্যভরা ধানক্ষেতটা একেবারে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। কুমারের ঐ মাটির জিনিষগুলি সব ফাটিয়া চুরমার হইয়াছে, তখন কুমারেরা স্ত্রীপুরুষে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, কে আমাদের এই সর্ব্বনাশ করিল, আমরা নিতান্ত গরীব লোক ইত্যাদি। বাগানে যে নানাবিধ ফল ঝুলিতেছিল, এখন সেই গাছগুলি লণ্ড ভণ্ড হইয়া গিয়াছে, কাঁচ পাকা সব ফল ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে, আর সেই শোভা নাই। আর সেই সরোবরে জল নাই, জল অভাবে পদ্মগুলা চড়ায় পড়িয়া রহিয়াছে, জল হঠাৎ শুকাইয়া যাওয়ায় খেলা ছাড়িয়া মনের দুঃখে হাঁসগুলি চলিয়া যাইতেছে। তখন সুয়াই মনে মনে ভাবিতে লাগিল এ কেমন আশ্চর্য্য ঘটনা। এই দেখিলাম শস্যভরা ক্ষেত, এই দেখি ছাই। এই দেখি সুন্দর সুন্দর হাঁড়ি পাতিল, এই দেখি সব ভাঙ্গা। আমার চাহনিতেই কি গাছের ফলগুলি ঝরিয়া গাছের এই অবস্থা হইল, সরোবরের জল সব শুকাইয়া গেল! এই সব ভাবিতে ভাবিতে বোনের বাড়ী পৌছিল। তখনই ছোট বোন সুয়াইকে একথা সব বলিল। সুয়াই বড় বোনের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে সে আর বিবাহের পর হইতে তাঁহার জামাতার কথামত কোন কাজই করিতেছে না। তাই মা চণ্ডী তাহার উপর বিরূপ হইয়া তাহার এই অবস্থা করিয়াছেন। সুয়াই মনে করিল দুয়াইকে কতকদিন নিজের নিকট রাখিয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় ব্রত নিয়ম সব করাইবে। বৈশাখ মাসও আসিল, মঙ্গলবারে সুয়াই বলিল (দুয়াইকে) দিদি আজ বৈশাখ মাসের প্রথম মঙ্গলবার, তুমি ভোরে কিছু খাইওনা, আজ তোমাকে মা চণ্ডী দেবীর ব্রত করিতে হইবে, কিন্তু দুয়াই বলিল "না বোন আমিত ভোরে খোকাদের সঙ্গে খেয়েছি।" তৎপর মঙ্গলবার খুব ভোরে সুয়াই আবার বলিল, আজও মঙ্গলবার, ব্রত করিবে কিছু খেয়োনা। কিন্তু দুয়াই ঠাকুর চাকরকে জল খাবার দিতে যাইয়াই কিছু খাইয়া বসিল। সুয়াই ব্রত করিবার সব তৈয়ার করিয়া দুয়াইকে ডাকিল, কিন্তু দুয়াই বলিল আমি ভুলে খেয়েছি। তখন সুয়াই দেখে ভারি বিপদ। তারপর মঙ্গলবার ভোর হইতেই সুয়াই দুয়াইকে নিজের আঁচল কোণে বান্ধিয়া চলিতে লাগিল, এবং সেদিন তাহা দ্বারা ব্রত করাইল। ব্রত শেষে দুই বোনে একত্রে খই চিড়া খাইলেন। মাসেক দুয়াইকে এখানে রাখিল এবং পরে সুয়াই দুয়াইর সঙ্গে একত্রে রাজার বাড়ী গেল। সেখানে সুয়াই ৩।৪ মাস থাকিয়া নিত্য নিয়মিতরূপে দুয়াইর দ্বারা সকল কাজ করাইত। শেষে ক্রমে ক্রমে আবার রাজার অবস্থা ভাল হইতে লাগিল। সেই অবধি দুয়াই একান্ত উৎসাহের সহিত ব্রত নিয়ম এবং সংসারের কাজ করিত। আর তাহার কোন দুঃখ রহিল না। তখন সে সংসারে প্রচার করিয়া দিল যে—বৈশাখ মাসে প্রতি মঙ্গলবারে চণ্ডীর ব্রত যেন সকলেই করেন, তাহা হইলে কাহারও কোন দুঃখ থাকিবেনা।

কুমুদকামিনী দেবী।

বিদায় নিয়েছে মধুমাস

বিদায় নিয়েছে মধুমাস,
তার শেষ সুদীর্ঘ নিশ্বাস,
ঝরাইল রসালের পাতা,
ফুল দিয়ে গাঁথা।
কামিনীর পল্লব মঞ্জরী,
পড়িয়াছে ঝরি,
বলরামচূড়া, তরুতলে অবীরের
যেন ছড়াছড়ি !

বিদায় নিয়েছে মধুমাস,
স্বচ্ছ নাই সুনীল আকাশ !
তন্দ্রাতুর আতপ আবেশে,
আলো চলে ভেসে
ছায়া লাগি, ক্ষীণ খিন্ন কায়
কিরণ ছটায়,
চম্পার কঞ্চুক আঁটা সুরভি নিটোল
শিথিল লুটায় !

বিদায় নিয়েছে মধুমাস,
পথে পড়ে মিলন আভাস,
ঝরাফুল, ছিন্নপত্রাবলি,
কোকিল কেবলি
কোন দূর দিগন্তরে প্রতিধ্বনি করে,
নিঝুম পল্লব, শ্রান্ত বনের অন্তর
কাঁদিছে মর্ম্মরে !

২৪। ৪। ২২

প্রিয়ম্বদা দেবী

একটী প্রস্তাব পত্র

মাননীয়া দিদিঠাকুরাণী

উপস্থিত মত একটা নূতন সম্বোধন গ'ড়ে নিলুম। তুমিও প্রতিশোধ স্বরূপ পত্রোত্তরে আমাকে যা খুসি তাই বল্‌তে পার—ইচ্ছামত "কলম-নামকরণ" ত সাহিত্য-জগতে প্রচলিত। কিন্তু আর যা-ই বল না কেন "প্রিয় ভগিনী" বলে' আমাকে লিখ না যেন, দোহাই তোমারে !

তুমি হয়ত মনে করছ, এত নূতন নামকরণই বা কেন, আর সাহিত্য জগতের সঙ্গেই বা আমাদের সম্পর্ক কি ?—কিছুই না, সেই ত দুঃখ ! পাঠ্য পাঠক সম্বন্ধ যেটুকু আছে, সেও খুব ঘনিষ্ঠ নয়। কিন্তু ভুলে যাচ্ছি, তুমি যে একজন লেখিকা—একজন নাম লেখানো, নাম ছাপানো সুলেখিকা। পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা শুনেছি আঁচলে আঁচলে বেঁধে ঠাকুর দর্শন করতে আসে। দেখি আমিও তোমার অঞ্চলের আশ্রয় গ্রহণ করে বাণীদেবীর দর্শনলাভে কৃতার্থ হতে পারি কিনা ?

চিঠি লিখতে চির কালই ভালবাসি। কথা কওয়া ও প্রবন্ধ লেখার মধ্যে চিঠি সেতুস্বরূপ। কথা যতটা বিশৃঙ্খল ও বাধাপূর্ণ, প্রবন্ধ যতটা বিধিবদ্ধ এবং সম্পূর্ণ,—চিঠি তার মাঝামাঝি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে অবাধে বিচরণ করে ব'লেই এত ভাল লাগে। স্বাধীনতাই চিঠির প্রাণ। যেমন ভাবে তেমনি ভাষায় সে অল্প পরিসরের মধ্যে সংস্কৃতবহুল থেকে নিতান্ত ঘরাও বাঙ্গলা এবং গভীরতম মনস্তত্ত্ব থেকে তুচ্ছতম ঘরের কথা পর্য্যন্ত বল্‌তে পারে এবং পাখীর মত চঞ্চলপক্ষে উড়ে বেড়াতে পারে, এই তার প্রধান গুণ। কথার চেয়ে চিঠি আপনা হতেই গোছালো হয়, কারণ

তাকে পদে পদে পরমুখাপেক্ষী ও বিক্ষিপ্ত হতে হয়না। অর্দ্ধঘণ্টা ও অর্দ্ধতোলার মধ্যে মনোভাবকে সীমাবদ্ধ করতে হলে স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। চিঠি অনেকটা ছাঁকনির কাজ করে; অবান্তর কথা বাদ দিতে হয়, প্রাসঙ্গিক কথাও সংক্ষেপে সারতে হয়। তারই মধ্যে যে যেটুকু লজ্জৎ দিতে পারা। বড় লেখক মাত্রই বোধ হয় সুন্দর পত্রলেখক। আর খারাপ চিঠিতে বেশি উপদ্রব করতে পারে না,—সেই এক মস্ত সুবিধে।

তাহলে তোমাতে আমাতে চিঠি লেখালিখিই করা যাক্—কি বল? বিষয়টাও আমি নির্ব্বাচন করেছি। মেয়েদের পক্ষে রমনীজাতির ন্যায় মনোরম বিষয় আর কি হ'তে পারে?—বল্‌তে পার পুরুষ জাতি! কিন্তু সে কথা তাঁরাই বল্‌তে পারেন আমরা নয়। আমরা নিজের জাত সম্বন্ধে যত কৌতূহলপরায়ণ, যত ঈর্ষ্যাপরবশ, যত সদসদ্ভাবপটু, যত মনোযোগী এবং সচেতন,—এতটা বোধ করি পুরুষজাতি সম্বন্ধে নই। এস তবে মেয়েদের বিষয় চিঠিতে গল্প করি। তুমি বল সেকালের মেয়েদের কথা, আমি বলি একালের মেয়েদের কথা। আমরা দুজনেই সেকাল ও একাল থেকে এতটুকু তফাতে সরে এসেছি যে ঠিকভাবে তাদের দেখতে পারব আশা করি। একেবারে নিজের দলের সমসাময়িক লোককে যথাযথভাবে দেখা ও চেনা শক্ত। কিন্তু তুমিও পুরোপুরি সেকালের লোক নও,—একটু পরের; আমিও পুরোপুরি একালের লোক নই,—একটু আগের। তুমি তোমার মায়েদের কালের বর্ণনা ও সমালোচনা কর, আমি করি আমাদের মেয়েদের। দেখি উভয়দলের দোষগুণ বিচারে ক্রমশ একটা তৃতীয় আদর্শ নব্য দলের রেখাপাত করতে পারি কি না, যারা গতকালেরও নয়, আজকেরও নয়, কিন্তু আগামী কালের। এক কথায় বাঙ্গালী মেয়ে "কি ছিল কি হল কি হতে চলিল" তারই পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্ এই আমার প্রস্তাব।

এ কাজে রাজী আছ ত? তাহলে উত্তরে তুমি সে-কালের আদর্শ বঙ্গনারীর একটি ছবি এঁকে পাঠিও। কথায় ছবি আঁকতে তুমি একজন ওস্তাদ, তার পরিচয় পাঠক-সমাজ আগেই পেয়েছে, সুতরাং আমি নির্ভয়ে তোমাকে ফরমাস করতে পারি। কেবল এইটুকু মনে রেখো যে আমরা শাস্ত্র কথা শুনতে চাইনে, কিম্বা সীতা সাবিত্রীর ব্যাখ্যা জানতে চাইনে। তাঁদের কাল সেকাল নয়,—একেবারে চিরকাল; তারসঙ্গে সম্প্রতি আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের সম্পর্ক অতি অল্প, এবং ভবিষ্যতে আরও কম হবার সম্ভাবনা।—তোমার মায়ের আমলের মেয়েরা কি রকম ছিলেন,—কি মানতেন, কি করতেন, কি ভাবতেন, কি চাইতেন, কি জানতেন, কি বুঝতেন, কি ভালবাসতেন মন্দ বাসতেন,—এক কথায় কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতেন, তাই আমরা তোমার চিত্রাঙ্কনে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করতে চাই,—বিশেষত এখনকার মেয়েদের সঙ্গে তুলনায়। বুঝেছ ত? আখিলিকে ইসারা ব্যস্ হয়!—ইতি

তোমারই স্নেহপাত্রী।

মেয়েদের কর্ম্ম-ক্ষেত্র।

শাস্ত্রে আছে মেয়েরা প্রথমে পিতার, তাহার পরে স্বামীর এবং শেষ জীবনে পুত্রের উপর নির্ভর করিবে। স্বাবলম্বনের অধিকার তাঁহাদের কোন কালেই নাই। লোকের যখন অবস্থার স্বচ্ছলতা ছিল তখন এইরূপ ব্যবস্থা সম্ভব ছিল কিন্তু আজ কাল অভাবের দিনে ইহা সবার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

এখন প্রথামত পুরুষদের উপর চিরকাল নির্ভর করিতে হইলে পুরুষের সংখ্যা অন্ততঃ বেশী না হইলেও সমান হওয়া

নিতান্ত দরকার। তার পর পূর্ব্বের মত বহু বিবাহের প্রচলন হইবার সম্ভব নাই। অধিকন্তু অনেক পুরুষ এখন কৌমার ব্রত অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক।

পূর্ব্বকালে পতিহীনা বিধবা ও কুলীন ব্রাহ্মণসমাজের অবিবাহিত কুমারীরা স্বামীর আশ্রয় না পাইলেও একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার জোরে আশ্রয় পাইত। এখন চাকুরীর খাতিরে ভাই হইতে ভাই দূরে থাকে। গ্রামের সরল জীবন-যাত্রা চলিয়া গিয়াছে। কাজেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা কারণে একান্নবর্ত্তী প্রথা আর টিকিতেছে না। এখন আশ্রয়হীনা মেয়েরা দাঁড়ায় কোথায়? অবলম্বনশূন্য মেয়ের সংখ্যা তো কম নয়। আমাদের দেশে ইংলণ্ডের মত বিধবা কি অনাথাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থানও নাই। থাকিলে মেয়েরা নিজেদের একটা উপায় সেখানে করিয়া লইতে পারিত। আজকালকার দিনে এই অবলম্বন শূন্য মেয়েদের উপায় কি হইতে পারে এই বিষয়ে গত গ্রীষ্মের ছুটির পূর্ব্বে পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একদিন সান্ধ্য সম্মিলনে আলোচনা করিয়াছিলেন।

কৃষিজীবি বা শ্রমজীবি শ্রেণীর লোকদের এই সমস্যা এত কঠিন নয়। তাহাদের ভিতর পুরুষ ও মেয়ে দুইই উপার্জ্জন করে। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ই এক সঙ্গে ক্ষেত করে মজুর খাটে। ইহাদের সম্বন্ধে এখনও তেমন দুশ্চিন্তার কারণ নাই। অন্ততঃ অন্ন বস্ত্রের সমস্যা ইহাদের কঠিন হইয়া উঠে নাই। ইহাদের মধ্যে প্রথমতঃ মেয়েরা ভার স্বরূপ নয় তার উপর অর্থনৈতিক কারণে এই শ্রেণীর গৃহস্থদের মধ্যে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা থাকাই দরকার। তাই এই প্রথা ইহাদের মধ্যে আজও আছে এবং দীর্ঘকাল থাকিবে। মেয়েদের সহায়তা না পাইলে ইহাদের কাজের ক্ষতি হয়। একটি কাজের মত মেয়ে পাইলে এই সব শ্রমজীবি গৃহস্থরা সাদরে তাকে আশ্রয় দেয়। কারণ মেয়েরা অর্থোপার্জ্জনে ইহাদের সহায়তাই করে।

যত সমস্যা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের লইয়া। এক একটি উপার্জ্জনশীল লোকের উপর গড়পড়তা ১০।১২ জন কি তাহারও বেশী লোক নির্ভর করে। অথচ এত অল্প আয় লইয়া এত জনকে ভরণপোষণ করা এখানকার মত অতি দুর্মূল্যের দিনে একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতেই মেয়েদের সমস্যা বড় কঠিন হইয়া উঠিতেছে। কাজে কাজেই সংসারে উপায়হীনা মেয়েদের সম্মান চলিয়া যাইতেছে। তাহারা সব তাচ্ছিল্য অপমান অভাব একেবারে নিরুপায় ভাবে সহ্য করিতেছে। অথবা সমস্ত সংসার দুঃখে দুর্গতিতে বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে। ফলে সংসারে শান্তির বদলে অনেক স্থানে অশান্তিই বাড়িয়া চলিয়াছে।

এখন পর্য্যন্ত স্বামীই মেয়েদের একমাত্র অবলম্বন। তাই মেয়ে একটু বড় হইলেই তাহার বিবাহের চেষ্টায় অভিভাবকদের বিলক্ষণ বেগ পাইতে হয়। অথচ বিবাহ দিতেই হয়। কাজেই যে কোন রকমে, যে কোন পাত্রে বিনা বিচারেই মেয়েকে পার করিয়া দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই। ইহাও মেয়েদের পক্ষে কম দুর্ভাগ্যের কথা নয়। এখনকার দিনের বাপের ঘরে মেয়েদের আর অধিকার সেকালের মত নাই বা থাকা সম্ভব নয়। অথচ বিশেষ সৌভাগ্য ও স্বচ্ছলতা না থাকিলে স্বামীর ঘরেও লাঞ্ছনার আর সীমা থাকে না। অথচ এই সমস্ত দুর্দ্দশা এখন এড়াইবার যো নাই। কারণ পুরুষদের প্রতিপালনের ক্ষমতা পরিসর ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। কারণটি এড়াইবার উপায় থাকুক বা না থাকুক এই বিপদের প্রতিকার করাই চাই। এখন প্রতিকার কি হইতে পারে ইহাই আলোচ্য বিষয়। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন ইহার একমাত্র উপায় মেয়েদেরও অন্ন-বস্ত্র সংগ্রহের শক্তি লাভ করা। উপার্জ্জন শক্তি লাভ করা মেয়েদের নিতান্ত দরকার হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য মেয়েদের উপার্জ্জন-ক্ষেত্রে নামিবার অনেক অন্তরায় ও স্বাভাবিক বাধা আছে ইহা খুবই সত্য। তবুও মেয়েদের করিবার মত কার্য্যও তো আছে। এবং সম্প্রতি না থাকিলেও করিয়া লইতে হইবে। এমন করিয়া মেয়েরা সংসারের কিছু সাহায্য করিতে পারেন। প্রয়োজন থাক্ আর না থাক্ মেয়েদের কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া সংসারের সহায়তা করাই উচিত।

ইহা হইলেই মেয়েদের হীনতা কমিবে তাহারা ভার স্বরূপ না হইয়া সংসার ক্ষেত্রে সহায় স্বরূপই হইবে।

অর্থকর কার্য্যে নামিতে হইলে অন্তঃপুরের সীমা ছাড়াইয়া মেয়েদের বাহিরেও আসতে হইবে। কিন্তু আমাদের পর্দ্দানশীন দেশে তাহা কি সহজ? যাঁহারা আজকাল পর্দ্দানশীন নন, তাঁহাদের চলাফেরাও খুব সহজ ও সুলভ নয়। গাড়ী পাল্কী ছাড়া প্রায়ই কাহারও চলে না। হয়তো প্রাচীনারা গাড়ীর জানালা বন্ধ করিয়া যাইতেন, নবীনারা জানালা খুলিয়া যান, প্রভেদ এইটুকু মাত্র। কাজেই তাহাদের চলাফেরাও এত ব্যয়সাধ্য যে বাহিরের কাজ করা তাহাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। ইহাও কম সমস্যা নয়। তাঁহাদের যাহা উপার্জ্জন, তাহা যদি যান বাহনেই খরচ হইয়া যায় তবে উপকার হইল কি? আর যাঁর কাছে কাজ করিতে হইবে, যান বাহন যদি তাঁকেই যোগাইতে হয় তবে ব্যয় বাহুল্য ও অসুবিধা বলিয়া হয়তো তিনি মেয়ে অপেক্ষা পুরুষকেই কাজে লাগাইতে চাহিবেন। বাহিরে চলাফেরা সহজ করিতেই হইবে। এই জন্য এখনই কাজে নামিতে হইবে। যাঁহারা ধনী, বাহিরে যাইবার যাঁদের প্রয়োজন নাই বা গাড়ী ঘোড়ার মত সঙ্গতি যাঁদের ভালই আছে, তাঁহাদেরও বাহিরে হাঁটিয়া চলফেরা করা দরকার, কারণ তাহা না হইলে তাঁহাদের অল্পবিত্ত ভগিনীদের সমস্যা সমাধান হইবার নয়। এই হেতুতেই ধনী মেয়েদেরও নানাবিধ উপার্জ্জন-কার্য্যে হাত দিতে হইবে। অবশ্য তাঁদের নিজের প্রয়োজন না থাকিতেও পারে, কিন্তু সকলের হিতার্থে এই সব কাজ ব্রতের মত তাঁদের করিতে হইবে।

আমাদের দেশে অনেক মেয়ে আছেন যাঁদের ঘরে মোটেই দিন চলে না অথচ, কোন কাজ করা, নিতান্ত অপমান মনে করেন। এবং কাজ করিলে বাহিরেও ভয়ানক নিন্দা হয়। কাজেই এখন দরকারে বা বিনা দরকারে সকলেই যদি কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করেন তো অনেক মেয়েই বাঁচিয়া যায়। মেয়েদের বিবাহসমস্যাও এত কঠিন হয় না।

এখন কিরূপ কাজ আরম্ভ করা যায়? মেয়েদের কাজ ঠিক পুরুষদের মত হইতে পারে না। সমাজের এমনি বিচার যে মেয়েরা ঘরে হয়তো বিনা কাজে, অলসভাবে বসিয়া অন্যের কাছে হাত পাতিয়া, অন্যের বোঝা হইয়া, অতি হীন ভাবে জীবন যাপন করেন তবু স্বাধীন কোনো ভাল জীবিকায় হাত দিতে পারেন না। হয়তো অন্যের সংসারে থাকিয়া নানাবিধ লাঞ্ছনা সহিতেছেন অথবা হয়তো সেখানকার নৈতিক বায়ু দূষিত করিয়া তুলিতে বাধ্য হইতেছেন তবুও স্বাবলম্বনের জন্য কোন সাধু কাজে হাত দিবার উপায় নাই। অন্য সব জেলার কথা বলিতে পারি না পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থানে এইরূপ বিধবা ও অনাথার সংখ্যা এত বেশী যে দেখিয়া বড়ই দুঃখ পাইয়াছি। ঘরে ঘরে কত দৈন্য, উপবাস, চক্ষুর জল, গোপনে কত দুঃখ রহিয়াছে তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। পূর্ব্বকার মত আশ্রয় দিবার যোগ্য উদারতা, পৌরুষ সামর্থ্য ও বৈভব সকলের নাই। অথচ সমাজভয়, তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা আছে। এমন অবস্থায় ঘরে ঘরে নীরবে উপবাস, নারীদের এই মৃত্যু বা মৃত্যুর অধিক নানাবিধ দুর্গতি যে বাহিরের লোকের অগোচরে চলিয়াছে তাহার প্রতিকার কি? যাঁহারা তীব্র সমালোচনা ও বিরুদ্ধতার দ্বারা এই দুর্গতি প্রতিকার করিতে দিবেন না তাঁরা জানেন না যে কত স্ত্রী হত্যা ও নারীর দুর্গতিজনিত পাপের জন্য তাঁরাই দায়ী। আমরা তাঁদের দোষ দিতে চাইনা। কেবল নারীদের দুঃখ মোচন হয় তাহাই চাই। যাঁহারা নারীদের এই সব সাধু জীবিকার কার্য্যে বাধা দিতেছেন তাঁরা নারীদের সকল দুর্গতির অনাহারের ও অপমৃত্যুর পাপ অজ্ঞাতসারে স্কন্ধে সঞ্চিত করিতেছেন। তাঁহাদের এই অজ্ঞানকৃত পাপ কিসে দূর হইয়া সকল সমাজ পবিত্র হয় তাহাই চাই। বিচার বা বিতর্ক ও যুক্তির পটুতা আমাদের লক্ষ্য নয়, এই দুর্গতির অচির অবসানই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য; কি ভাবে অগ্রসর হইলে এই উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে তাহাই জানা দরকার। কি কাজ করিলে কেমন ভাবে চলিলে ইহার প্রতীকার সম্ভব, সব দিক হইতে তাহা জানিতে চাই।

কিরণবালা সেন

শেয়াল বর

এক শেয়াল নদী থেকে বড় বড় তিনটে ইলিশ মাছ ধরে' শ্বশুর বাড়ী চলেছে। ভাল করে' নদীতে নেয়ে গায়ের কাদা ধুয়ে বেশ করে' গোঁপ পাকিয়েচে—পাকিয়ে কিছু দূর গিয়ে এক গাছের তলায় বসে ভাবচে না জানি আমাকে আজ কেমন দেখতে হয়েচে! এখন সেইখান দিয়ে এক বক উড়ে যাচ্চে। শেয়াল তাকে দেখে বললে—বক ভাই, বক ভাই আমাকে কেমন দেখতে হয়েচে?

বক বল্লে—কেন?

শেয়াল বল্লে—

গা ধুয়েচি নদীর জলে গোঁফে দিয়েচি চাড়া
শ্বশুর বাড়ী যাচ্চি আমি তাই তো এত তাড়া।

তাই শুনে বক বল্লে—বাঃ, তোমাকে তো বেশ দেখ্তে হয়েচে ভাই, ঠিক যেন—

হীরের আঁচিল হীরের পাঁচিল হীরের তিন পা দেয়াল
আর হীরে কানে দিয়ে বসে রয়েচেন জয়জগন্নাথ শেয়াল।

বল্তেই শেয়াল খুশী হয়ে তিনটে মাছ থেকে একটা তাকে দিয়ে দিলে।

আবার কিছু দূর গিয়ে শেয়াল এক গাছতলায় এসে বসেছে—দেখে এক মাছরাঙা উড়ে যাচ্চে। শেয়াল তাকে ডেকে বল্লে, ও ভাই মাছরাঙা আমাকে কেমন দেখ্তে হয়েচে ভাই?

মাছরাঙা বল্লে কেন?

শেয়াল বল্লে—

গা ধুয়েচি নদীর জলে গোঁফে দিয়েচি চাড়া,
শ্বশুর বাড়ী যাচ্চি আমি তাই তো এত তাড়া।

তাই শুনে মাছরাঙা বল্লে—বাঃ, তোমাকে তো বেশ দেখ্তে হয়েচে ভাই, ঠিক যেন—

সোনার আঁচিল সোনার পাঁচিল সোনার তিন পা দেয়াল

আর সোনা কানে দিয়ে বসে রয়েচেন রাজা মহাশয় শেয়াল।

বলতেই শেয়াল খুসী হয়ে দুটো মাছ থেকে একটা তাকে দিয়ে দিলে।

আবার কিছু দূর যায়; এমন সময় একটা কাকের সঙ্গে তার দেখা হ'ল। শেয়াল তাকে ডেকে বল্‌লে—ও ভাই কাক, আমাকে কেমন দেখতে হয়েচে ভাই?

কাক বললে কেন?

শেয়াল বল্‌লে—

গা ধুয়েচি নদীর জলে গোঁফে দিয়েচি চাড়া
শ্বশুর বাড়ী যাচ্চি আমি তাই তো এত তাড়া।

কাক মাছটার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে আমাকে মাছটা দিবি বল্?

শেয়াল বল্‌লে—না ভাই, এই সবে একটি মাছে এসে ঠেকেচে, এটা আমি কাউকে দিতে পারবোনা। শ্বশুর বাড়ী কি খালি হাতে যাব?

তাই শুনে কাক বল্‌লে—বাঃ, তোমাকে ত বেশ দেখ্‌তে হয়েচে, ঠিক যেন—

ছাইয়ের আঁচিল ছাইয়ের পাঁচিল ছাইয়ের তিন পা দেয়াল
আর ছাতাপড়া দাঁতে বসে রয়েচেন মড়াখেগো বেটা শেয়াল।

এই শুনেই শেয়াল লাফিয়ে উঠে কাককে ধরতে তার পিছুপিছু ছুটলো। আর কোথা থেকে হতভাগা একটা চিল এসে শেয়ালের শেষ মাছটিও ছোঁ মেরে নিয়ে উড়ে পালাল।

এই সংখ্যার সমুদায় চিত্রের পরিকল্পনা বিশ্বভারতীর ছাত্রী শ্রীমতী হাতি সিং কর্ত্তৃক।

Printed & Published by Jagadananda Roy, at the Santiniketan Press, Santiniketan.

শ্রেয়সী পত্রিকার নিয়ম।

১। শ্রেয়সীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা।

বৈশাখ মাস হইতে পর বৎসরের চৈত্র পর্য্যন্ত শ্রেয়সীর বৎসর গণনা করা হয়। যিনি যে বৎসরের গ্রাহক হইবেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে পত্রিকা দেওয়া হইবে।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই-তারিখে শ্রেয়সী প্রকাশিত হয়। কোন গ্রাহক সময় মত না পাইলে ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া আমা-দিগকে জানাইবেন নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৩। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পত্রিকা প্রকাশের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমাদিগকে জানাইবেন নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী থাকিব না।

৪। শান্তিনিকেতনবাসীদের জন্য শ্রেয়সীর বার্ষিক মূল্য ১৷০ টাকা।

৫। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থাদি ও চিঠি পত্র পাঠাইবেন।

৬। ডাকমাশুল সমেত চিঠি না দিলে কাহারও চিঠির জবাব দেওয়া হয় না।

বীরভূম
শান্তিনিকেতন পোঃ

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীপ্রতিমাদেবী,
শ্রীরমাদেবী।

১ম বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩২৯।

শ্রেয়সী

মাসিক পত্র

সম্পাদিকা—শ্রীকিরণবালা সেন

মূল্য, বার্ষিক সডাক ২\ টাকা।

শ্রেয়সী

মাসিক পত্র

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুর্ভবতি।
হীয়তেঽর্থাৎ য উ প্রেয়োবৃণীতে॥"

"শ্রেয়ঃ প্রেয় সবাইকে পায়।
দেখে' বেছে' ল্যায়, যে যেটা চায়॥
যে ল্যায়, শ্রেয়—সে পায় কূল।
যে ল্যায়, প্রেয়—খোয়ায় মূল॥"

কঠোপনিষদ্।
১ম অধ্যায়, ২য় বল্লী।

১ম বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা   ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩২৯ সাল

পত্র

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন—

স্ত্রী শিক্ষার কোন্ প্রণালী আমাদের দেশে অনুসরণ করিতে হইবে অল্প কথায় তাহার আলোচনা সন্তোষজনক হইতে পারে না। অধিক কথা লিখিবার মত অবকাশ আমার একেবারেই নাই। আমার মনে হয় যথার্থ শিক্ষার প্রাচ্য পাশ্চাত্য ভেদ নাই—পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এ সত্য আমরা যেখান হইতেই পাই, ইহা সর্ব্বজাতির সম্পদ। সমাজবিধি, ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রভেদ আছে, সাহিত্য সঙ্গীত কলাবিদ্যা প্রভৃতির রীতি প্রকৃতি লইয়া আমাদের পার্থক্য আছে, সে পার্থক্য বলপূর্ব্বক ঘুচাইতে হইবে একথা বলি না, কিন্তু বলপূর্ব্বক রক্ষা করিতে হইবে একথাও অসঙ্গত। অজ্ঞতার বেড়া দিয়া কোনো সত্যকে বাঁচাইতে হইবে এ কথা যদি স্বীকার করি তবে বলিতেই হইবে পাশ্চাত্য যে সকল পণ্ডিত বেদ বেদান্ত বৌদ্ধশাস্ত্র গভীরভাবে আলোচনা করিতেছেন তাঁহারা অন্যায় করিতেছেন;—উড্রফ্ সাহেব তন্ত্রশাস্ত্র শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার পাশ্চাত্য প্রকৃতিকে বিকৃত করিতেছেন অতএব তাহা অনুচিত, ভগিনী নিবেদিতা বিবেকানন্দের শিষ্যা হইয়া কুশিক্ষাগ্রস্ত হইয়াছেন। সকল জাতির ধর্ম্মদর্শন সাহিত্য কলাবিদ্যা প্রভৃতির আলোচনা করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা কেবল য়ুরোপীয়দেরই থাকিবে, আর আমাদের দেশের স্ত্রী পুরুষেরই থাকিবেনা এত বড় অগৌরবের কথা আমি গ্রহণ

করিতে পারি না। বস্তুত আমাদের আধুনিক শিক্ষার ত্রুটি এই যে আমরা নিজের দেশের বিদ্যা শিখিইনা অন্য দেশের বিদ্যা শিখি। অন্য দেশের বিদ্যা না শিখিয়া তাহার প্রতিকার হয় না। শিক্ষার একটা মহৎ উদ্দেশ্য এই যে, তাহার দ্বারা পৃথিবীর সকল মহাজাতির চিরসঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডারে আমাদের সকলেরই অধিকার ঘটিবে। যে কোনো জাতিই যে কোনো সত্যকে প্রকাশ করিয়াছে তাহা সর্ব্বমানবেরই সম্পদ—এই জন্যই যেমন আমি ইচ্ছা করি যে, আমাদের ভারতীয় বিদ্যাসকল দেশের লোকেই লাভ করুক তেমনিই আমি ইচ্ছা করি অন্য দেশের বিদ্যা ভারতের লোক গ্রহণ করুক। সকল বিদ্যার ক্ষেত্রে যাহার প্রবেশলাভ ঘটিয়াছে সেই ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় নিজের মত গঠন করিবে, জীবন নিয়মিত করিবে ইহাই সঙ্গত। উড্রফ্ সাহেবের যদি সেই স্বাধীনতা থাকে, ভগিনী নিবেদিতার যদি সেই স্বাধীনতা থাকে, এবং তাহাতে যদি আমাদের মনে ক্ষোভ না জন্মিয়া আনন্দই জন্মিয়া থাকে তবে নিজেদের বেলাতেই সত্য-গ্রহণের স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করার অপমান আমাদের দেশের কি স্ত্রী কি পুরুষ কেহ যেন স্বীকার না করে। স্ত্রীধর্ম্মপালনের জন্য স্ত্রীলোকের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন আছে কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোনো সুশিক্ষা তাহার পক্ষে পরিত্যাজ্য নহে। কুশিক্ষা প্রাচ্য হইলেও কু পাশ্চাত্য হইলেও কু—এবং যাহা পশ্চিমের পক্ষে সু তাহা আমাদের পক্ষেও সু। ইতি ৮ অগ্রহায়ণ ১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার দিনের ইতিহাস

আমার দিনের ইতিহাস,
ছায়াবীথি ছেড়ে, দূরে, আলোর আভাষ,
লিখে যাব কোন্ ভাষা দিয়ে ?
কুড়ান ফুলের মত বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে
মালা গেঁথে দেব কি আকারে ?
সকল ছড়ান কথা জড় করে এনে বারে বারে
ভরে দেব কতগুলি পাতা ?
কত ভুলে যাব কত মনে রবে গাঁথা !

আমার দিনের ইতিহাস,
কিরণ কিনারা ছাড়া অশ্রুর উচ্ছ্বাস
কোথা তার আঁকিব সীমানা ?
বেদন বাঁধনহারা মানিবে কি মানা,
ফিরে আর যাবে কি উজানে ?
কত যে ভাসিয়া গেছে,কিবা পড়ে আছে কেবা জানে
নিঃশেষ নিমেষ আজ সবি,
তার আমি কি রাখিব, কি আঁকিব ছবি ?

আমার দিনের ইতিহাস,
আজিকে পরশহারা সুদূর আকাশ !
কত ছবি আসে ভেসে যায়,
কার তুলি রঙ দিয়ে ফুটায় মিলায়—
কত জানা অজানার মেলা,
কত ছায়া, আবছায়া, স্মরণের স্বপণের খেলা,
অবাক দেখিয়া অভিনয়
আমার জীবন যেন সে আমার নয় !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

৪।৫।২২

নারীর মুক্তি

সত্যই কি এদেশে মেয়েদের উদ্ধারের কোন উপায়ই হইতে পারে না? চিরদিনই মনভুলান ফাঁকা ফাঁকা বড় বড় কথা বলিয়া তাহাদের মনুষ্যজীবনের সকল অধিকার, আনন্দ ও গৌরব হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইবে? ভাবিলে দুঃখের অবধি থাকে না যে তাহাদের জন্য প্রাণের মর্ম্মপ্রদেশ পর্য্যন্ত পুড়িয়া উঠিলেও একবার বাহির হইয়া সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়া বলিবার উপায় নাই,যে "ভগিনীগণ, এস, একবার এতদিনের খেলাঘরের অভিনয় ছাড়িয়া উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে বাহির হইয়া পড়ি। তোমাদের বিশুদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য তোমাদের ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ করা হইয়াছে কিন্তু সেই রুদ্ধ কক্ষের মধ্যে বাতাস যে অতি অস্বাভাবিক রকম অশুদ্ধ ও দূষিত হইয়া পড়িল। একবার বাহিরে আসিয়া চারিদিকের দরজা জানালা খুলিয়া সব শোধন করিয়া না লইলে তোমাদের ঘরও যে তোমরা পরিষ্কার রাখিতে পারিবেনা। বিরাট বিশ্বজগতের মুক্ত দর্পণে একবার আপনাদের দেখিয়া লও, বুঝিয়া লও। তোমরা যে প্রকৃতিরই সৃষ্টি মানুষ, মানুষের হাতে গড়া পুতুল নও, তাহা একবার প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি কর। তাহা হইলে তোমাদের ঘরও সার্থক হইবে, পরও সার্থক হইবে, আপনি সার্থক হইতে পারিবে। জানি তোমাদের মনের মধ্যে অনেক সময়েই সন্দেহের আভাস জাগে, বুঝি গলার লোহার শিকলটা নিতান্তই পুষ্পমালা নহে—বুঝিবা এই দুয়ারের চৌকাটের পারেও বিশ্বপ্রকৃতি তোমাদেরই জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। উঠিতে বসিতে এই সকল আচার, নিয়ম, শাসনের বিধি ঠিক্ বিশ্ববিধাতার বিধিটি নহে, বুঝিবা তাহাতে মানুষের হাতের ছাপ উঁকি মারিতেছে,—আর মনের মধ্যে যে অস্ফুট আকাঙ্খার কুঁড়িগুলি—দেখা দিতেই যাহাদের চাপিয়া মারিবার পথ পাইতেছ না।—সেগুলিও সব সয়তানের কারসাজি নহে,—দেবতার পূজার ফুলও অনেকই তাহার সহিত শুকাইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তবু পর্ব্বতপ্রমাণ শাসন ও সংস্কারের তলায় চাপা পড়িয়া তোমাদের আপনাকে আপনি ভাল করিয়া জানিবার সাহস ও নাই, শক্তিও নাই। গতানুগতিকভাবে গড়াইয়া পুতুলখেলাই করিয়া যাইতেছ। কিন্তু এখন যে মানুষের বয়স হইয়াছে, চারিদিকের পৃথিবীতে যৌবনের লীলা চলিতেছে ; খেলনা, খেলাঘর ও তাহার সংস্কার ও মায়া কাটাইয়া মানুষ ক্রমে সত্য পদার্থের সন্ধানে অগ্রসর হইতেছে। মোহ লইয়া আর তাহার মন ভরিতেছে না। তোমরাই কি কেবল এই পৃথিবীর এক কোণায় জানালা কপাট বন্ধ করিয়া, এই সূর্য্যালোকিত জগৎকে রোধ করিয়া একটি বেড়াদেওয়া সঙ্কীর্ণ স্থানে অর্থহীন ক্রীড়ায় জীবনকে শেষ হইয়া যাইতে দিবে? সকলেই পরিণতি লাভ করিল। তোমরাই কি কেবল চিরদিন নাবালিকা থাকিয়া যাইবে?"

কিন্তু একথা তাহাদের কেমন করিয়া বলাই বা যাইবে? যে বলিবে তাহারও ঘরের দরজার চাবি—বাহিরে যাইবার উপায় নাই। যাহাদের বলিব তাঁহাদেরও ঘর তালা বন্ধ—প্রবেশের পথ নাই– হয়ত দ্বারদেশ হইতেই ধাক্কা খাইয়া ফিরিতে হইবে—কোনো বাণী তাঁহাদের কাণেও পৌঁছিবে না। সুতরাং বলা যে হয়—"না জাগিলে সব ভারতললনা এ ভারত আর জাগেনা, জাগেনা"—তাহার কোনো মূল্য নাই, তাহা কেবল সাজানো কথামাত্র। ভারতললনার মৃতপ্রায়শরীরের নিঃশ্বাস বায়ুটুকুও যে তাঁহাদের কর্ত্তাদের করায়ত্ত airtight শিশির মধ্যে রক্ষিত, তাহার উপরে যে আবার "হিন্দুয়ানী" ছাপ দেওয়া। এই কর্ত্তৃপক্ষের খেয়াল ও মর্জ্জি না হইলে তাঁহাদের বাঁচিবার পথও বন্ধ।

কিন্তু গভীর নৈরাশ্যের মর্ম্মভেদী যাতনা হইতে উদ্ভূত হইলেও ইহাও গাত্রদাহের কথা।

পৃথিবীর চারিদিকের অবস্থা দেখিয়াও কি পুরুষদিগের

চোখ ফুটিবে না, ভিতরের নারায়ণ জাগ্রত হইবেন না? পাশ্চাত্যদেশের মত এখানেও কি তাঁহারা বিদ্রোহী নারীর (suffragette) রণরঙ্গ দেখিতে চান? মনে থাকে যেন চণ্ডীমূর্ত্তি আমাদেরই দেশের। এখন যতই সুপ্ত লুপ্ত মৃত বলিয়া মনে করি না কেন, ভৈরব যখন জাগেন তখন সমাজের যুগযুগ সঞ্চিত মিথ্যা, সমস্ত উপরের চাকচিক্য প্রবঞ্চনা নিঃশেষে লয় পাইবে। সেই সঙ্গে তাঁহাদের ঐ সাধের শিশিটুকুও ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যাইবে।

তাই বলি গরজ আমাদেরই জানি, কিন্তু তাঁহাদের সহিত আমাদের যে শ্রদ্ধার, প্রীতির ও স্নেহের সম্বন্ধ, তাহাতে আমাদের দুঃখবেদনা কি তাঁহাদের মনে কোনই সাড়া জাগাইতে পারিবে না? আপনাদের হীন প্রভুত্বগর্ব্ব, ও ঈর্ষাই (তাহাকে যতই বড় নামে অভিহিত করা হউক না কেন) কি প্রবল হইবে? তাঁহাদের দুঃখ যন্ত্রণায় এতটা ঔদাসীন্য ত কই আমরা সহস্রলাভের বিনিময়েও করিতে পারি না। আমাদের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি, স্নেহ প্রেম কি তবে মৌখিক শিষ্টতা মাত্র? অনাত্মীয়, বিদেশীয় নিগ্রো দাসজাতির উদ্ধারের জন্য আমেরিকা এত ধন, রক্ত ক্ষয় করিতে পারিয়াছেন, আর তাহারই সমাবস্থ (বাহ্যিক সাজসজ্জা যতই থাকুক) তাঁহাদের আপনাদেরই শরীরের রক্তমাংস-স্বরূপ জননী, ভগিনী, পত্নী, কন্যাগণের উদ্ধার করিতে হইলে আপন মনের সংস্কারমুক্তির জন্য যেটুকু অধ্যাত্ম শক্তির (soul-force) প্রয়োজন তাহাও কি তাঁহারা জুটাইতে পারিবেন না? ঠিক বুঝিতেছি তাঁহারা যে অধ্যাত্ম শক্তির সাহায্যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতেছেন, চরকা চালাইয়া তাহা উদ্বুদ্ধ হইবে না, তাহার একমাত্র ক্ষেত্র এইখানেই।

এইখানে তাঁহারা বলিতে পারেন যে আমাদের মঙ্গলের জন্যই তাঁহারা রাশ টানিয়া আছেন। কিন্তু পুরুষ—মনস্তত্ত্বের (male mentality) এক একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত। তাঁহাদের স্বার্থপরতা এবং আত্মশ্লাঘার প্রবৃত্তি Egoism তাঁহাদের এতই অন্ধ করিয়া রাখে যে তাঁহারা সহস্র অপরাধ করিয়াও নিজেদের মধ্যে কোনো গলদ্ দেখিতে পান না, অত্যাশ্চর্য্য যুক্তি জাল সৃষ্টি করিয়া প্রথমে নিজেকে ভুলাইয়া লইয়া পরে অন্যকেও মুগ্ধ করিতে চেষ্টা পান। কাজেই তাঁহাদের দুর্নীতিকে সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত বলিবারও যো থাকে না। তাই তাঁহারা আপনারা অন্যায় করিয়া আপনারাই যেন কত অত্যাচরিত এইরূপ একটা ভাব অতি সহজেই গ্রহণ করিতে পারেন। বাস্তবিক তাঁহারা যেমন সুবিধামত আপনার দোষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া যাইতে পারেন, মেয়েরা সেরূপ কখনও পারেন না। সেইজন্য সকল বিষয়ের দায়িত্ব তাঁহাদেরই লইতে হয়, (অবশ্য তাহা কখনও স্বীকৃত হয় না) আর পুরুষেরা জানেন কিনা জানিনা, তাঁহারা মেয়েদের যতই অবজ্ঞার চোখে দেখুন না কেন, মেয়েরাও তাঁহাদিগকে নাবালকের সমান মনে করিয়াই মাতৃভাবে ক্ষমার চোখে দেখিয়া থাকেন।

যাহা হউক, তাঁহাদের ঐ কথার উত্তরে বলিতে হয় যে তাঁহারা যদি এতদিন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মত আমাদের মঙ্গলের জন্যই রাশ টানিয়া থাকেন, তবে এখন আমাদের মঙ্গলের জন্যই দয়া করিয়া একটু ঢিল দিতে থাকুন। এই মঙ্গলের বন্ধনটি আমাদের গলায় যে বিশেষ আরাম দিতেছে না তাহা আপনাদের উপর উক্ত গভর্ণমেণ্টের মঙ্গলহস্তের স্পর্শ কেমন সুখকর বোধ হইতেছে তাহা ভাবিলেই বুঝিতে পারিবেন।

বঙ্গনারী

বর্ষাশেষ

গান

বাদল ধারা হল সারা
বাজে বিদায় সুর।
গানের পালা শেষ করে দে
যাবি অনেক দূর।
ছাড়ল খেয়া ওপার হ'তে
ভাদ্রদিনের ভরা স্রোতে,
দুলচে তরী নদীর পথে
তরঙ্গ বন্ধুর।

কদম কেশর ঢেকেছে আজ
বনতলের ধূলি।
মৌমাছিরা কেয়াবনের
পথ গিয়েছে ভুলি।
অরণ্যে আজ স্তব্ধ হাওয়া,
আকাশ আজি শিশির-ছাওয়া,
আলোতে আজ স্মৃতির আভাস
বৃষ্টির বিন্দুর॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমাজ সংস্কার

(মে মাসের Century পত্রিকায় Bertrand Russell এর প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।)

বর্ত্তমান সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক ইহা অনেকেই অনুভব করেন; এবিষয়ে চিন্তা করিতে গেলে প্রথমেই কোন্ কোন্ কারণে সমাজ মন্দ এবং কি কি পরিবর্ত্তন হইলে ইহার অবস্থা ভাল হইত সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠে। সচরাচর প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের নিজের কল্পনা ও খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হন, অবশ্য কেহই চান না এবং কেহই স্পষ্ট বুঝিতে পারেন না যে তাঁহাদের চিন্তা সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই আমাদের মতামত গুলির মূলে অভিজ্ঞতা দূরদর্শিতা ও স্বাধীন চিন্তার পরিবর্ত্তে বিশেষ কোনও একটী ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রতি আসক্তি নিহিত থাকে।

প্রথমে সাধারণভাবে সামাজিক প্রথাগুলির যেভাবে বিচার করা হয় তাহার কতকগুলি ভ্রম দেখাইয়া অবশেষে সমাজ গঠনের একটী আদর্শ দিতে চেষ্টা করিব।

বংশানুক্রমিক মতগুলির উপর সকল সময়ে প্রায় সকল সমাজেই বিশেষ আস্থা দেখান হয়। যে সকল সমাজে বহুদিন বাহির হইতে বিশেষ কোনও সংঘাত আসিয়া পৌঁছান নাই—তাহাদের মধ্যে পারিবারিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও সম্পত্তি বিষয়ক প্রায় সকল রীতিনীতি বংশপরম্পরাগত; ইহাদের প্রভাব এতই অধিক যে ইহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস কাহারও নাই।

বর্ত্তমান যুগে চিরাগত প্রথাগুলির প্রতি আস্থা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে তাহার কারণ কেবল যে বাণিজ্যের বিস্তার ও বিদেশ ভ্রমণের সুবিধা তাহা নয়; স্বাধীন ব্যবসায় আকাঙ্ক্ষা (Industrialisim) যতই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইহার যতই বিস্তার হইতেছে তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যেও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন স্বভাবতই দেখা যাইতেছে। তথাপি ইহাদিগের প্রভাব অল্পদিনে নষ্ট হইবার নয়। সম্পত্তির

অধিকার বিষয়েই দেখা যায়। পূর্ব্বে বংশগত অধিকারে একব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট কোন সম্পত্তি লাভ করিত; বর্ত্তমান ব্যবসায়ের যুগে সম্পত্তির বিভাগ বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত সন্তোষ জনক মীমাংসা হয় নাই।

কি প্রকার মানুষ লইয়া সমাজ গঠিত হওয়া আবশ্যক এবিষয়ে মত লইতে গেলে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতঃই আপনার আদর্শানুযায়ী মানবকে উপযুক্ত মনে করেন। যোদ্ধা চাহিবেন তাঁহার মত সকলে বীর হউন, শিল্পীর মতে শিল্পের আদর করেন এরূপ সমাজই শ্রেষ্ঠ এবং বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি সমাজের মধ্যে বিজ্ঞানের বহুল পরিমাণে চর্চার আবশ্যকতা দেখাইবেন। যাঁহারা আধিপত্য করিতে ভাল-বাসেন তাঁহারা সমাজের মধ্যে সকল ব্যক্তির স্বাধীনতা কোনমতেই স্বীকার করিবেন না। বর্ত্তমান সমাজের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বলিবার উদ্দেশ্য তাঁহাদের ইহা নয় যে আধিপত্যই বিনষ্ট হউক; বস্তুতঃ সমাজ চালাইবার ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত হইলেই তাঁহাদের মনোমত হয়। অপরদিকে সুবিধাবাদী ব্যক্তিগণ সমাজে কোনও প্রকার বাঁধানিয়ম থাকা আবশ্যক মনে করেন না।

সমাজ সংস্কারের ইচ্ছায় মূলে অস্পষ্টভাবে অনেকের মনে কেবলমাত্র একটা ধ্বংসের প্রবৃত্তি থাকে। বিদ্রোহী-দের অনেকেরই সমাজে নিপীড়িতদের প্রতি সহানুভূতি বশতঃ যে আন্দোলন উত্থাপন করেন বা তাহাতে যোগ দেন এমন নয়, সমাজপতিদিগের প্রতি আক্রোশই তাঁহাদিগকে কার্য্যে উৎসাহ দেয়। এইরূপ প্রবৃত্তি যে স্বাস্থ্যকর নয় তাহা বলা বাহুল্য। গোপনে অস্পষ্টভাবে যে সকল প্রবৃত্তি ক্ষতি করে তাহাদিগকে পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বিনষ্ট করা আবশ্যক।

সমাজ সংস্কারকগণ সমাজ গঠনের বিষয় চিন্তা করিতে গিয়া যাহা সবদিকদিয়া নিখুঁত সুন্দর তাহাই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি লইয়াই সমাজ। বাহির হইতে কল্পনায় যাহা সুন্দর, বাস করিবার পক্ষে তাহা উপযোগী না হইতে পারে। সমাজ সংস্কারককে মনে রাখিতে হইবে যে মানুষ যাহাতে বাস করিতে পারে সমাজ এইরূপ হওয়া আবশ্যক। সমাজের ভিতর থাকিয়া বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পর কোথায় সংস্কার প্রয়োজন তাহা বুঝিতে পারা যায়; সাময়িক উচ্ছ্বাসে যথার্থ দেখা যায় না।

এতক্ষণ আমরা সমাজ গঠন সম্বন্ধে ভুলধারণা গুলিই আলোচনা করিয়াছি; এখন কোন্‌গুলি ঠিক মনে হয় তাহাই নির্দ্দেশ করিব।—

আদর্শ সমাজের দুটী দিক থাকা দরকার। প্রথমতঃ জন সাধারণের উপস্থিত কল্যাণ দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যৎ উন্নতির শক্তি ও প্রয়াস।—সমাজের উপস্থিত কল্যাণ সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে সচরাচর দুটী ভ্রমে পড়িতে হয়। (১) বাহিরের দর্শকের ভ্রম সম্বন্ধে আমরা বলিয়াছি, অপরটী (২) সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের ভুল। সমাজের অল্প পরিমাণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের জীবনযাত্রা যেরূপে সুখকর হয় কেবল তাহা দ্বারাই সমগ্র সমাজের কল্যাণ বিচার করিলে তাহা প্রকৃত বিচার বলা যায় না। পুরাতন মিসর ও বাবি-লন সাম্রাজ্যে রাজা, ধর্ম্মযাজক, লক্ষপতি প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিদিগের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। কিন্তু অবশিষ্ট অধিকাংশ মানবকে ইঁহাদের পরিচর্য্যার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। বর্ত্তমান যুগেও ব্যবসায় ক্ষেত্রে অল্প কতিপয় ব্যক্তি মূলধন লইয়া নূতন কার্য্যের, নূতন আবিষ্কারের চেষ্টায় অনেক লাভ করেন, জন সাধারণের প্রশংসালাভ করিয়া কৃতার্থ হন; কিন্তু সেই ব্যবসায়ের কঙ্কাল যন্ত্রে কতশত লোক নিষ্পেষিত হইতেছে তাহা গণনা করা যায় না। এই সকল ব্যক্তির স্বাধীন চেষ্টার সুযোগ নাই; ব্যক্তি বিশেষই হউন বা সমবেত মণ্ডলীই হউন, সেই উপরওয়ালার ক্ষমতাধীনে তাহারা খাটিতে বাধ্য। ধনের অসমবিভাগ যাহা অন্য ক্ষেত্রেও অসমতা (Inequality) রহিয়াছে। ক্ষমতার অসমতা, কার্য্যের বিভাগে অসমতা, কার্য্যের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কার্য্যের অসমতা—এই সকল প্রশ্ন সমাজের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। ধনের অসমতাপ্রশ্ন ব্যবসায় ক্ষেত্রে সমবায় প্রথা

(Coperative syshem) দ্বারা কিছু পরিমাণে মীংমাংসা করিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু আমরা দেখিলাম ইহার সহিত সড়িত অন্য নানা প্রকার অবিচারের প্রতীকার না হইলে:বর্ত্তমান সমাজের সমগ্র কল্যাণ নাই।

কেবলমাত্র এক শ্রেণীর অথবা একপ্রকার চরিত্রের ব্যক্তিদিগের কল্যাণ না দেখিয়া সকল শ্রেণীর সকল প্রকার ব্যক্তির মঙ্গল যদি সমাজে আনিতে হয় তাহা হইলে বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তির প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন স্বাধীন চেষ্টার সুযোগ দিতে হইবে। অবশ্য অপরের অনিষ্টকর কোনও প্রকার প্রয়াসই সমাজে চলিতে দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু অপরদিকে নানা প্রকৃতির বিভিন্ন সৃজনের আবেগকে রুদ্ধ করিবার অধিকার সমাজের নাই।—ব্যবসায় রূপ যন্ত্রই হউক অথবা অন্য যে প্রকার যন্ত্রই হউক, মুষ্টিমেয় লোকের অঙ্গুলী চালনায় অবশিষ্ট শতশত মানবকে সেই যন্ত্রের চাপে আপনার স্বাধীন প্রয়াসকে বিসর্জ্জন দিতে হইলে তাহা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয়।

অন্ততঃ একটী কোনও সামাজিক বিধির প্রতি আন্তরিক আস্থা থাকা বিশেষ দরকার বলিয়া মনে হয়। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সকল প্রকার বিধিব্যবস্থার প্রতি সন্দেহের চোখে দৃষ্টিপাত করিতেছে। সমাজ রক্ষার জন্য যে কোনও ব্যবস্থা করা হইয়াছে ক্রমশঃ সকলগুলিরই প্রতি মানব শ্রদ্ধা হারাইতেছে। যুদ্ধের প্রারম্ভে 'জনসাধারণের কল্যাণ' এই মন্ত্র লইয়া দলে দলে লোকে প্রাণপাত করিয়াছে; যুদ্ধাবসানে দেখি প্রেসিডেন্ট্ উইলসন্ একাকী 'সাধারণ তন্ত্রের' মহিমা শতমুখে ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহার বাণী শুনিবার মত আস্থা ও ধৈর্য্য কাহারও নাই।

মানুষ যদি একটি কোন বিষয়ে আন্তরিক আস্থা না রাখিতে পারে; যাহার জন্য সে জীবন ধারণ করিতেছে এমন একটি কোনও সত্য উদ্দেশ্য সম্মুখে না দেখিতে পায় তাহা হইলে কথনই সে প্রকৃত সুখলাভ করিতে পারে না। উদ্দেশ্যহীন জীবনকে বাহিরের শত বিলাপ দ্বারা পূর্ণ করিতে চাহিলেও তাহা শূন্যই থাকিয়া যায়। বিশেষ কোনও একটি আন্তরিক কর্ত্তব্যের বোধ জীবনে না থাকিলে জীবন অর্থহীন নিরাশাময় হইবেই।

তাহা হইলে আদর্শ সমাজের দ্বিতীয় প্রয়োজনটি এই দেখা যাইতেছে যে, তাহা একটি উদ্দেশ্য সম্মুখে লইয়া উন্নতির পথে চলিবে। বর্ত্তমান বাণিজ্যের যুগে অনেকেই মনে করেন জীবনযাত্রা যাহাতে সহজ ও আরামপ্রদ হয় তাহার জন্য নূতন নূতন বস্তু আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করাই উন্নতির চরম পথ। কিন্তু সে সকলত যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছে। এখন সে গুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করিয়া সময়কে বাঁচাইয়া সেই সময়টুকু জ্ঞানের চর্চ্চায় দিতে পারিলেই লাভ। বিলাসের বস্তু বা সাময়িক নূতন নূতন যন্ত্রসকল প্রস্তুত করিতে যে শান্তিটুকু লাগিত এক্ষণে তাহা জ্ঞানের আলোচনায় ভাবের আদান প্রদানে জীবনকে শান্তিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিবার নিমিত্ত পাওয়া যাইবে আশা করা যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে সমাজে চিন্তার ও কার্য্যের স্বাধীনতা করা আবশ্যক। চিন্তা ও ভাবকে ব্যক্ত করিতে যাইয়া, মহৎ কার্য্য করিতে যাইয়া যদি উপর হইতে ক্রমাগত বাধা পাওয়া যায় তাহা হইলে সৃজনের উৎস রুদ্ধ হইয়া যায়। নূতন যাহা কিছু তাহাই অধিকাংশের নিকট প্রীতিপ্রদ নয়, কিন্তু নূতনকে পথ করিতে না দিলে উন্নতির দ্বার বন্ধ করা হয়। নূতন শিল্পী কবি বা বৈজ্ঞানিককে যে তাঁহাদের সৃষ্টির জন্য পুরস্কৃত করিতেই হইবে এমন নয়; বরং পুরস্কারের প্রতি তাহাদের বিন্দুমাত্র লোভ নাই। কিন্তু তাঁহাদের রচনার প্রকাশে স্বাধীনতা থাকা চাই। মানবের ক্ষতিকর প্রয়াসকে বাধা দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য কিন্তু তাহাই যেন প্রধান উদ্দেশ্য না হয়। আদর্শ সমাজ গঠন করিতে যাইয়া ইহাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, নূতন নূতন সৃষ্টির আবেগকে ব্যক্ত করিতে দেওয়া চাই। নূতনের টানে বর্ত্তমান সংগ্রাম অতিক্রম করিয়া জীবন যাহাতে সম্মুখে চলিতে পারে আদর্শ সমাজ তাহারই পথ পরিস্কার রাখিবেন।

শ্রীসুধাময়ী দেবী

স্পর্শমণি

পূবের দেশে নদীর তীরে
মাঠের সীমানায়
জড়ায়ে গায়ে রঙিন্ ভূষা
জাগিয়া ধীরে নতুন ঊষা
পুলক ভরা নয়ন খুলি
ধরারি পানে চায়।
প্রাণেরি মাঝে চেতনা জাগে
ধ্বনিয়া উঠে গান,
শিশিরে ধোয়া ফুলেরি বুকে
দখিনা হাওয়া গভীর সুখে
মূরছি পড়ে অতীত ব্যথা
করিয়া অবসান।

মুঞ্জরিয়া উঠিল যেন
শ্রান্ত দেহখানি,
সকল হৃদি ভরিয়া আজি
আকুল বাঁশি উঠিবে বাজি
আকাশ ঘিরি জাগিবে ধীরে
সফল করা বাণী।
প্রভাতে আজি পরশ তা'রি
বাঁধন খোলা মনে,—
ব্যর্থতারে ধন্য করি
অর্ঘ্য সে যে নেবেই বরি
শিহরি উঠি আবেশ ঘোরে
কেবলি অকারণে।

শ্রীসোনামাখা দেবী

সুখ

তুমি আছ প্রভু আছ তুমি, এই,
সব চেয়ে বড় সুখ,
তুমি আছ সখা আছ তুমি, তাই
এত আশা ভরা বুক।
তুমি আছ প্রাণে এ বড় বিভব,
বিশ্ব বহিছে এ মহা গৌরব,
তুমি আছ সদা তাই উৎসব
দুঃখও নয় দুখ।
গোপনে যে ফেলি নয়নের জল
তোমার দয়ায় হয় সে সফল,
অন্তর হ'তে অন্তর তল
দেখো যে অনুক্ষণ।

তুমি আছ প্রভু এই সম্বল
হোক না ভীষণ কালের কবল
অসুক্ দৈন্য দুঃখ সকল
চির নির্ভয় মন।
এই তব দয়া তুমি আছ নাথ
সব চরাচরে আছ সাথে সাথ
কি বা জ্যোৎস্নায় কি আঁধার রাত
হেরি হাসি মাখা মুখ।
সব চেয়ে বড় দয়া তব এই,
এই মোর সেরা সুখ!

শ্রীলীলা দেবী

বোলপুরে একমাস

প্রায় পঞ্চাদশ বৎসর পূর্ব্বে আমার দুটি সন্তান জ্যোৎস্না সুকুমারকে বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য লইয়া গিয়াছিলাম। সেই কথা আমার সর্ব্বদা মনে হয়। সন্তানদিগের সহিত সেই যে একমাস আমি বোলপুরে ছিলাম, তাহাতে যে কত আনন্দ অনুভব করিয়াছি, কত শিক্ষালাভ করিয়াছি, তাহারি বিষয় দু-চারিটি কথা আজ বলিবার ইচ্ছা হইয়াছে। এখানকার স্কুলে ভাল পড়ান হয় না, সেজন্য আমার সন্তান দুটিকে শিশু অবস্থায় বোলপুরে দিবার কথা হয়। বোলপুরে আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু শ্রীমতী হেমলতা দেবী থাকেন, তাহার জন্যই আমিও সন্তানদিগের সহিত বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালেয়ের অন্তর্গত হইয়া একমাস ছিলাম। শ্রদ্ধাস্পদ রবিবাবু আমাকেও তাঁর বিদ্যালয়ে স্থান দিয়াছিলেন। সে কথা আমি কখনও ভুলিয়া যাইব না।

আলিপুর হইতে যাত্রা করিয়া আমার বন্ধু শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর অতিথি হইয়া আমরা দুদিন কলিকাতায় থাকিয়া বোলপুর যাত্রা করিলাম। সঙ্গী অনেক। শ্রীমান্ অমরেন্দ্র গুপ্ত আমাদের সারথি বা কর্ণধার হইয়া চলিলেন। ৺কল্যাণীয় মোহিতচন্দ্র সেনের পত্নী তাঁর দুটি কন্যা লইয়া যাইতেছেন। আমি আমার দুই পুত্র ও কন্যাস্থানীয়া শ্রীমতী কৃপাদেবীও সঙ্গে চলিয়াছেন। লুপ মেলে আমরা দুই ঘণ্টায় বোলপুরে পঁহুছিলাম, আমাদের জন্য ষ্টেশনে লোক ও শিকরাম গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল ও সেই সঙ্গে আমার প্রিয়বন্ধু স্নেহলতা সেনের পুত্র সুহৃদকে দেখিয়া যে কি আনন্দ হইল বলা যায় না। সেই ট্রেনে বিদেশ হইতে আরো অনেকগুলি ছাত্র ও অতিথি আসিয়াছিলেন।

গাড়ীতে চড়িয়া কিয়দ্দুর যাইতে না যাইতে বলদ দুটা গাড়ী ফেলিয়া দিবার উপক্রম করায় সোজা পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথ ধরায় আমরা গাড়ী হইতে সকলেই নামিয়া পড়িয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সেই দিনের সেই আনন্দ এখনো যেন মনে হয়। ঘর ছাড়িয়া বিদেশে বিশেষত অন্য স্থানে আমার মত লোকের আসিয়া থাকা বড়ই কঠিন কথা ছিল। কিন্তু সেই মুক্ত বাতাসে মুক্ত আকাশের তলে, সেই সবুজ গাছপালা, বনের দিকে চেয়ে, সেই লাল সুর্‌কির সুন্দর পথ দেখে যেন মনে হল, বাড়ীই চলিয়াছি। তারপর সমরের কথায় না হসিয়া থাকা যায় না, লোককে হাসাইবার ক্ষমতা তার কি রকম আছে, যে তাহাকে জানে সে ইহাও বেশ জানে।

এতগুলি লোক একত্রে চলিয়াছি দেখিতে দেখিতে পথ ফুরাইয়া গেল। আমরা ক্রমে ক্রমে নীচু বাংলার নিকটবর্ত্তী হইলাম। শ্রীমতী হেমলতা দেবীর বাস ভবনের আলো দেখিতে পাইলাম। এখনো যেন চোখের সামনে দেখিতেছি সেই হাসিমুখে হেমলতা আর ও কয়েকটি মেয়ে লইয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য পথে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন। হেমলতাকে দেখিয়া কি আনন্দ হইয়াছিল। ঈশ্বরের দয়ায় আমার বন্ধু ভাল, ভালবাসাও জীবনে যথেষ্ট পাইয়াছি, হেমলতার সঙ্গ আমি এখনো পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠি।

যখন বোলপুরে যাই তখন কত ভয় হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন সেখানে আসা হইবে কিনা, সে বিষয়ে দারুণ সন্দেহ ছিল। নিজের গৃহ ছাড়িয়া আরাম ও কর্তৃত্ব ছাড়িয়া আমার সেই বোর্ডিংএর নিয়মে থাকিতে হইবে মনে করিয়া নিজেও যে ভীত হই নাই তা নয়। শ্রীমতী হেমলতাকে দেখিয়া সে ভয় অনেকটা দূর হইয়াছিল। অবশেষে যখন আমার নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে আসিলাম তখন একেবারে সব ভয় চলিয়া গেল। স্কুলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ কক্ষই আমার বাসস্থানের জন্য স্থির ছিল (এখন সে কক্ষে মিঃ পিয়ার্সন থাকিতেন)। আমার আরামের জন্য আমার বন্ধু সকলি ঠিক্ রাখিয়াছিলেন।

প্রথম হইতে একেবারে ছেলেদের ছাড়িয়া থাকিতে

পারিব না বলিয়া ছেলে দুটিকে উপস্থিত আমার নিকটই থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আহারাদির পর সকলে শুইয়া পড়িলে আমি ও হেমলতা সারারাত গল্প করিয়া কাটাইয়া দিলাম। সে গল্পে আমাদের কি আনন্দই হইয়াছিল। কত আশা কত কল্পনাই না করিয়াছিলাম। তার পরদিন শ্রীমান্ অমরেন্দ্র বলিয়াছিল

"পিসিমা আপনি যেখানে যান বেশ বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারেন।

বোডিংএ আসিয়া ও সারারাত বন্ধুর সহিত গল্প করিয়া কাটাইছিলেন। আশ্চর্য্য হইয়া যাই সকলে আপনার কথা শোনে কি করিয়া?"

এখন ছেলে বা নিজেই যে মায়ায় পড়িয়া দুবার বোলপুর ছুটিয়াছিল, তা হয়ত মনেই ছিল না;

তারপর দিন শ্রদ্ধাস্পদ রবিবাবু আসিয়া আমাদের সব ঠিক হইয়াছে কি না নিজে চোখে দেখিয়া গেলেন। আমাদের প্রতি তিনি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদারতার কথা যত্নের কথা আমার চিরদিন মনে থাকিবে। ঠাকুর বাড়ীর অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, ও বন্ধুত্ব আছে সেখানকার অতিথি হইয়া আমি যা সম্মান পাইয়াছি তাহা চিরদিনই মনে রাখিবার মত।

শিশু দুটি শিশুবিভাগে ভর্ত্তি হইল। আমার ভিন্ন ব্যবস্থা আমি অনায়াসে করিতে পারিতাম, সঙ্গে চাকরও ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া আমি শিশুদের সহিত বোর্ডিংভুক্ত হইলাম। শ্রদ্ধাস্পদ রবিবাবু সমস্ত শিশুবিভাগের ভার আমার হস্তে অর্পণ করিলেন। সেই একটি মাস আমি বোলপুরে ছিলাম, তন্মধ্যে দুই সপ্তাহের কিছু উপর সমস্ত শিশুবিভাগের ভার আমার হাতে ছিল। বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যা-শ্রমের সহিত সেই একমাস কাল আমার জীবনের সমস্তক্ষণ

মিলিত হইয়াছিল। সে বিমল আনন্দের কথা মনে করিয়া এখনও আমি পুলকিত হইয়া উঠি।

এখনো চোখের সম্মুখে বোলপুরের শান্তিনিকেতনের দৃশ্য চিত্রপটের মত জাগিয়া উঠে। আমার গৃহের সম্মুখে প্রশস্ত মাঠ, তাহার তলেই নিচু বাংলা। দুই সখীর চখা চখীর মত মাঠের দুপারে থাকিবার আবশ্যক হইত না সর্ব্বদাই ইচ্ছামত দেখা সাক্ষাৎ হইত। সেই মাঠটি লতায় বেষ্টিত প্রাচীর, কি ফুল ফুটিয়া থাকিত। সেই ফুলভরা বেলফুলের গাছগুলি, সেই বৃহৎ অশ্বথ শ্রেণী, তার মধ্য দিয়া ছেলেরা স্কুল হইতে এ বাড়ীতে আসিত। সেই ক্ষুদ্র শিশুগুলি পিতামাতার কোল ছাড়িয়া যেন নির্ভয়ে সেখানে বেড়াইয়া বেড়াইত।

বোলপুরের সেই স্নিগ্ধ শান্তিপূর্ণ ভাব আমার হৃদয়ে যেন চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

প্রত্যূষ সাড়ে চার ঘটিকার সময় ঘণ্টাধ্বনিতে, সকলে উঠিয়া স্নান করিতে যাইত। যাহাদের শরীর তত সুস্থ নহে তাহারা যাইত না। তারপর সেই ছোট শিশুগুলি সকলে ছোট কম্বলের আসন লইয়া যে যেখানে হয় মাঠে বসিয়া জোড় হাত করিয়া প্রার্থনা করিত। আবার যখন সকলে শিশুকণ্ঠে সমস্বরে 'ওঁ পিতা নোঽসি' শব্দ উচ্চারণ করিত, শুনিয়া হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিত।

শিশুবিভাগে তখন প্রায় ৩০।৩৫টী শিশু ছিল। তাহারপর সেই শিশুবিভাগের শিশুগুলি আমার নিকট জলযোগের জন্য আসিত। আমি যখন তাহাদিগকে খাওয়াইতে বসিতাম আমার হৃদয়ে কি আনন্দই হইত। পরকে আপনার করিয়া কি সুখ, বিশেষতঃ পরের শিশুকে ভালবাসিয়া ও তাহাদের ভালবাসা পাইয়া যে কি আনন্দ আমি সেখানে তাহা পরিপূর্ণভাবে অনুভব করিয়াছিলাম। বোলপুরে আমি কি মহান শিক্ষাই লাভ করিয়াছি। সেই খোলা মাঠে, সেই উন্মুক্ত বাতাসে, সেই নীল আকাশের তলায় সেই গাছের ছায়ায় মনে কি ভাবই জাগিয়াছিল! হৃদয়ের সব সঙ্কীর্ণতা যেন দূর হইয়া গিয়াছিল।

সারা সকাল ছেলেদের খাওয়া দাওয়ার বিষয় ব্যবস্থা করিতাম সেগুলির ভার আমার হাতেই ছিল। সকাল দশ ঘটিকার সময় শিশুবিভাগের বালকেরা আসিয়া আহারে বসিত। তাহারা আমায় কি ভালই বাসিত, নির্ভয়ে কত কথা বলিত। আমার উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করিত, তাহাদের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ অভাব বেদনা আমায় জানাইয়া তাহারা কত আনন্দ পাইত।

সেই সময় শ্রদ্ধাস্পদ রবিবাবু আমার স্বামীকে সম্বল-পুরেও আমার দাদাকে (নগেন গুপ্তকে) লিখিয়াছিলেন "অন্নপূর্ণার মত সমস্ত ভার লইয়া তিনি শিশুবিভাগ দেখিতে-ছেন, বোলপুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে তিনি মিলিয়া মিশিয়াই আছেন।" সে কথায় আমায় আত্মীয়েরা কত আনন্দ পাইয়াছেন। আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণী যে একটিদিনও কিছু কাজে লাগিয়াছে মনে করিয়া এখনও আমার আনন্দ হয়। আর মনে হয় ওখানে এত কাজ করিবার আছে, যার ইচ্ছা আছে উপায় আছে সে জীবন ঢালিয়া কাজ করিতে পারে। কাজের আকাঙ্ক্ষা আমার ঐ থান থেকেই আরম্ভ হইয়াছে।

আহারাদির পর শিশুবিভাগের প্রায় সব শিশুগুলিই আমার ঘরে বসিয়া থাকিত।

সেইসময় চারিদিকে ছোট ছোট জামগাছে কাট্‌জাম হইয়াছে। ছেলেরা প্রায় ছুটিয়া সেই জামের আশায় যাইত সেই খোলাস্থানে বাঁধা নিয়মে তাহারা থাকিত না। ছেলেদের আমায় বড় ভাল লাগিত।

একদিন দুপুর বেলা শ্রদ্ধাস্পদ রবিবাবু দু'চারিটি ছেলেকে নিজে সঙ্গে করিয়া আনিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে আমার পুত্রদুটি ছিল। জামের রসে জামা রঙিন হইয়া গিয়াছে। রবিবাবু ছেলেগুলিকে আমার কাছে দিয়া চলিয়া গেলেন।

দেড় ঘটিকার সময়ে ছেলেরা পুনরায় স্কুলে যাইত। সাড়ে চার ঘটিকার সময় আসিয়া জলযোগ করিয়া আপনাদের শয্যাদি প্রস্তুত করিয়া খেলিতে যাইত। সন্ধ্যার সময় সঙ্গীত শিখিত। এখনো যেন কল্যাণীয় দিনুর সহিত তাহাদের গান শুনিতেছি।

"মোরা সত্যের পরে মন আজি করিনু সমর্পণ
জয় জয় সত্যের জয়"

তার পর শিক্ষকেরা ছেলেদের গল্প বলিতেন। গল্প শুনিয়া তাহারা শিশুবিভাগে আসিত। আমি সেই খোলা জানালার ধারে তাহাদের পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতাম। যখন সকলে গল্প শুনিয়া সেই পথ দিয়া আসিত, সেই শিশুকণ্ঠের কলরবে প্রাণে কি আনন্দই হইত তাহাদের আহারাদি করাইতাম। সকলে শয্যায় শয়ন করিলে প্রত্যেকের শয্যাপ্রান্তে গিয়া একবা: না দাঁড়াইলে যেন প্রাণে শান্তি পাইতাম না।

সেই স্কুলের দুইটি ছেলের কথা আমার এখনো মনে আছে। শুকদেব ও পরিমল হালদার। তাহারা দুইটি ক্ষুদ্র শিশু আমায় এত ভাল বাসিত। পরিমলকে শিশু-বিভাগে রাখা হইত না, স্কুল বিভাগে ছিল। কিন্তু সে কোনমতে সে দিকে থাকিতনা, কোন ও শিক্ষক পারিয়া উঠিতেন না। অবশেষে একদিন শ্রদ্ধাস্পদ রবিবাবু তাহাকে আমার নিকট আনিয়া দিয়া বলিলেন "দেখুন আপনি যদি ইহাকে পারেন।" আমি যত দিন বোলপুরে ছিলাম, বালক শিশু বিভাগেই ছিল। আমার নিকট থাকিতে বড় ভালবাসিত। যেদিন শুকদেবকে আমরা গাহিতে বলি সে প্রথমেই গাহিল

"কি ছার আর কেন মায়া কাঞ্চন কায়া ত রবে না"

আমরা তখন শিশু কণ্ঠে সেই গান শুনিয়া হাসিয়া ছিলাম। তখন জানিতাম না তাহার অনতি বিলম্বেই তাহারা দুটি ভাই অকালে কাঞ্চন কায়ার মায়া ত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিবে।

বাটীতে তাহাদের জননীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া ছিল তিনি বলিলেন যে রোগ শয্যাগত শুকদেব "মাসিমা' 'মাসিমা' বলিয়া ডাকিয়াছিল।

কল্যাণীয় সুহৃদ তখন স্কুল বিভাগে ছিল, শিশুবিভাগে তাহার আসিবার কথা নহে, তবু সে রোজ দুপুরে তার সরোজ মাসিমার কাছে আসিয়া একবার দেখা দিয়া যাইত। প্রদ্যোত তখন শিশু বিভাগেই ছিল। সেই সুহৃদ তার মার প্রাণকে চূর্ণ করিয়া অকালে কোন আহ্বানে সেই স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছে।

মাঝে মাঝে দুএকটি ছেলে স্কুলের হাঁসপাতালে যাইত। আমি সেখানেও গিয়া তাহাদের দেখিতে যাইতাম। শুকদেবের পায়ে কাঁটা ফুটিয়া ফোড়ার মত হইয়াছিল, হাঁসপাতালে রাখার কথায়, কোনমতে সে রহিল না। কাঁদিয়া আমার সহিত চলিয়া আসিল।

নীচুবাংলার তলায় পুকুর, ছেলেরা সেখানে সাঁতার কাটা শিখিতে যাইত। একদিন দুপুরে কয়েকটি ছেলে পলাইয়া গিয়াছিল দিনু তাহাদের ধরিয়া আনিলেন।

কয়েকদিন প্রাতঃকালে শ্রদ্ধাস্পদ রবিবাবু উপাসনা করিয়াছিলেন। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া আমরা সেই ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইতাম। রবিবাবু মন্দিরগৃহের মধ্যে বসিয়া উপাসনা করিতেন, আমারা দালানে বসিতাম। আমি তাহার পূর্ব্বে কখনো এরূপভাবে উপাসনায় যোগ দিই নাই। সেই আমার প্রথম শিক্ষা, এ জীবনে সে কথা কখনো ভুলিব না। সেই বর্ষার প্রভাত, সেই সবুজ গাছ পালা, সেই ফুল ভরা গাছগুলি, আর বাংলা দেশের সেই পাখীর গান, এসব মিলিয়া মিশিয়া প্রাণে যে কি অপূর্ব্ব ভাব জাগাইয়া দিত তাহা বলিবার নয়। আর সেই মন্দিরের সৌন্দর্য্য সেই সার পূর্ণ উপাসনা তাহাও ভুলিবার কথা নয়। বিশেষতঃ ইহা সেই ৺মহর্ষিদেবের উপাসনা-মন্দির মনে হইলেই হৃদয়ে যেন কেমন ভক্তির ভাব জানিয়া উঠিত।

আমি যে কতদিন সন্ধ্যার সময় সেই মন্দিরের দালানে বসিয়াছি তাহা বলিবার নয়। আমার শতদলের অনেক কবিতাই সেই স্থানে লেখা। সেই শিশু কণ্ঠের "ওঁ পিতা নোহসি" শব্দের সহিত আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিত।

"পিতা তুমি, প্রভু তুমি, তুমি যে আমার,
কর জোড়ে প্রণিপাত করি বার বার।
তোমারে বুঝিতে চাই এ ক্ষুদ্র জীবনে,
তোমারে হেরিতে চাই, এ দীন নয়নে।

তোমার মঙ্গল স্পর্শ পুলক মাঝার,
অভিষিক্ত হয়ে থাক হৃদয় আমার।
আমার আমিত্ব সব দাও ভুলাইয়া,
তোমাতেই যুক্ত হোক, মুক্ত হোক হিয়া।
ভুলে যাই স্বার্থপাপ, দৈন্য মাঝে আর,
যেন না বাঁধিয়া রাখি, কল্পনা আমার।
আমার হৃদয় মাঝে প্রেম ভক্তি দিয়া,
তোমায় পূজার স্থান রাখিব রচিয়া।
পুষ্প সম যেন প্রাণ তোমার পরশে,
হাসিয়া ফুটিয়া উঠে মঙ্গল হরষে।

আমাদের বেড়াবার যায়গা ছিল ছাতিমতলা। সেখানে যে কতবার গিয়াছি তার ঠিক নাই।

একদিন আমরা রেলের লাইন দেখিতে পথের ওধারে গিয়াছিলাম, যে সময় ট্রেণ যাইত আমরা দাঁড়াইয়া দেখিতাম। আমি বোলপুরে এক বৎসর থাকিব বলিয়া গিয়াছিলাম। সবে ১৫ দিন হইয়াছে, যখন হেমলতাকে বলিলাম এক বছরের পনের দিন কাটিল, হেমলতার কি হাসি। সে কথা মনে হলে এখনো আমার হাসি আসে।

আমরা যে সময় বোলপুরে ছিলাম রবিবাবুর গীতাঞ্জলির অনেকগুলি গান সে সময়ের লেখা। জগৎজুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে" যেদিন লেখেন সেই দিন সুর দিয়ে দুপুরে যখন গান করেন আমরা তখন শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলাম। প্রায়ই তাঁর দুপুর আহারের সময় হেমলতার সহিত যাইতাম। 'কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো' ইত্যাদি অনেকগুলি গানই যখন আষাঢ় মাসে আমরা ছিলাম সেই সময়ের লেখা। একদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের অনুরোধে রবিবাবু দিনু ও অজিতবাবু তিনজনে গান গাহিয়াছিলেন। সন্ধ্যা হইতে রাত ৯টা পর্য্যন্ত সেই গানের পর গান, সেদিন আমরা কি আনন্দই উপভোগ করিয়াছিলাম। আমাদের সেই ঘরের দালানে বসিয়া গান গাহিয়াছিলেন।

অনেকদিন আগে যখন আমার বার তের বছর বয়স, তখন আমাদের ৪৮নং গ্রেষ্ট্রীট বাড়ীতে আমার দাদা (নগেন গুপ্ত) রবিবাবুকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, সেই দিন প্রথম রবিবাবুর গান শুনি। কড়ি ও কোমলের সব গান, "আজি প্রভাত তপনে" থেকে আরম্ভ করিয়া সব গান গুলিই গাহিয়াছিলেন। সেই তাঁর গান আমরা প্রথম শুনিয়াছিলাম। তখন যে আবার গিয়া রবিবাবুর বোলপুর আশ্রমের অতিথি হইব স্বপ্নেও ভাবি নাই। তারপর কত গানই শুনিয়াছি।

বোলপুরে অনেক সময় আমি ছেলেদের পড়ার প্রণালীও বিশেষভাবে দেখিতাম। রবিবাবু যখন পড়াইতেন আমি প্রায় সে সময় উপস্থিত থাকিতাম। একমাসে যতটা সম্ভব আমি জ্ঞান সেখান থেকে সঞ্চয় করে এনেছি, ও সেই জ্ঞানের বলেই আজ ১১ বৎসর এই ক্ষুদ্র দেশে একাকী একটি বালিকা বিদ্যালয় চালাইতে সক্ষম হইয়াছি। আমি সেখানে আরো বেশী দিন থাকিলে আরো শিখিতে পারিতাম। এখন এক একবার গিয়া সব দেখিয়া আসিতে ইচ্ছা করে। অন্তরের সহিত বিদ্যালয়ের উন্নতির শুভ কামনা সর্ব্বদাই করিয়া থাকি।

জ্যোৎস্নার শরীর অসুস্থ হওয়ায় আমায় বাধ্য হইয়া বোলপুর ছাড়িয়া আসিতে হইল। সে সময় শ্রদ্ধাস্পদ রবিবাবু বোলপুরে ছিলেন না, শিলাইদহে গিয়াছিলেন। আসিবার দিন স্কুল ছাড়িয়া আসিতে সুকুমারের কি কান্না সে কোনমতে দিনুকে ছাড়িতে চায় না। সেখান হইতে আসিয়াও প্রভাতরা যখন বোলপুরে যায় সে একটি চাকরের মাথায় নিজের ট্রাঙ্কটি দিয়া হাতে সোরাই দিয়া, নিজের হাতে একটি আসন লইয়া হাঁটিয়া বোলপুর যাইতেছিল। এখন পর্য্যন্ত সে কথা বলিয়া আমরা কত হাসি। অনেকদিন পর্য্যন্ত সে বোলপুরের মায়া ছাড়িতে পারে নাই।

আমি বোলপুর হইতে আসিয়া শ্রদ্ধাস্পদ রবিবাবুর এই পত্রখানি পাইয়াছিলাম।

माননীয়াসু

শিলাইদা
নদিয়া

আপনার ছেলের চোখের পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ পরশ্ব

বৌমার পত্রে জানিতে পারিয়া উদ্বিগ্ন ছিলাম। অবশেষে এই উপলক্ষ্যে আপনাদিগকে বোলপুর বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইতে হইল জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আপনারা যদিও অল্পদিন মাত্র ছিলেন, তথাপি আশ্রমের সহিত আপনাদের যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, আশা করিতেছি তাহা স্থায়ী হইবে। আপনি বিদ্যালয়ের মধ্যে আসিয়াই স্থান লইয়াছিলেন, ইহার সমস্ত অভাব ত্রুটি অসম্পূর্ণতা আপনার গোচর হইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও আমাদের সমস্ত দৈন্য ও অক্ষমতার ভিতর দিয়াও আমাদের সাধনার যিনি লক্ষ্য, তাঁহাকে যদি আমাদের চেষ্টার মধ্যে দেখিয়া থাকেন তবে আপনাদের সঙ্গে আমাদের সম্মিলন সার্থক হইয়াছে বলিয়াই জানিব। আমাদের বিদ্যালয়ের যেটুকু সত্য আছে গ্রহণ করিবেন ও স্মরণে রাখিবেন—আর যা কিছু সমস্তই ভুলিবার ও ক্ষমা করিবার। অগ্নি জ্বলিবে এই আমাদের আকাঙ্ক্ষা, ধোঁয়া করিয়া তুলি সে আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু এই ক্লেশকর মলিন ধোঁয়াও অগ্নির ভূমিকা বলিয়া আমি গণ্য করি—সেইজন্য দুই চক্ষু দিয়া জল বাহির হইলেও এই তপস্যাতেই লাগিয়া থাকিতে হইবে।

আপনি যে একান্ত ইচ্ছা লইয়া, অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা পূরণ করা আমাদের সাধ্যের মধ্যে ছিল না—ঈশ্বর করুন যেন উপযুক্ত ক্ষেত্রে আপনার সন্তান দুটি শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ লাভ করিয়া আপনাদিগকে নিরুদ্বিগ্ন করে। আপনি আমার সাদর অভিবাদন গ্রহণ করিবেন ও নমস্কার জানিবেন এবং আমার ক্ষণকালীন দুটি ক্ষুদ্র ছাত্রকে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানাইবেন।

ইতি ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩১৬।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এইরূপে একমাস কাল বোলপুরে কাটাইয়া আসিয়াছি, সেখানকার স্মৃতি, মনের একটি কোণে মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠে। আবার হয়ত কোন্ দিন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইব কে জানে? ইচ্ছা আছে যখন রবিবাবুর সেই ক্ষুদ্র দুটি ছাত্র জীবনের পথে কৃতিত্ব লাভ করিবে তখন তাহাদের লইয়া গিয়া একবার উপস্থিত হইব।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী

বুড়ো-বুড়ির গল্প

এক বুড়ি আর এক বুড়ো আছে। বুড়ি আপনার এক-দিন বল্‌চে যে বুড়ো আজকে আমি মেয়ের বাড়ী যাব, পুকুরে আমার সাতটি পুঁটিমাছ রইল দেখো যেন খেওনা।

এই বলে বুড়ি চালকড়াই ভাজ্‌লে, মিষ্টি নিলে—নিয়ে একটা লাউয়ের খোলের ভেতর ঢুকে মেয়ের বাড়ী চলেচে—আর পথে যাকে দেখ্‌চে তাকেই বল্‌চে—

"লাউ গড়াগড়ি যায়রে বুড়ি লাউ গড়াগড়ি যায়,
লাউয়ের ভেতর বসে বুড়ি চালকড়াই ভাজা খায়।
দেনা বাবা একটা ঠেলা।"

এমনি করে বুড়ি মেয়ের বাড়ী গিয়ে পৌঁছিল। তারপর সেখানে দু'তিন দিন রইল।

বুড়ো এদিকে করেচেকি, পান্তাভাত ছিল হাঁড়িতে, বুড়ি রেঁধে রেখে গিয়েছিল—সেগুলো থালায়বেড়েছে—বেড়ে পুকুর পাড়ে গিয়ে "আয় পুঁটিমাছ আয়, আয় পুঁটিমাছ আয়" বলে পুঁটিমাছদের ডেকেচে,—ডেকে একটিকে ধরে পুড়িয়ে পান্তাভাত দিয়ে খেয়েচে।

তারপর সেই কাঁটা ফেল্‌তে যায় বনে। বন বলে আমি

বুড়ি এলে বলে দেব। দেয়ালে গুঁজ্‌তে যায়—দেয়াল বলে আমি বুড়ি এলে বলে দেব।

কি করে শেষে বুড়ো সেই পুঁটিমাছের কাঁটা তার মাথায় চুলের ভেতর গুঁজে রেখে দিলে।

এদিকে বুড়ি মেয়েকে বললে "মা আমি তবে বাড়ী যাই?" বলে বুড়ি আপ্‌নার বাড়ী চলে এল। এসে পুকুর পাড়ে গিয়ে আদর করে ডাক্‌তে লাগ্‌ল—

"আয় আয় পুঁটিমাছ আয়
সরলপুঁটি চুনোপুঁটী আয়
ঘিভাত খাবি আয়—আয়—"

তার ডাক শুনে ছ'টা পুঁটিমাছ ঘিভাত খেতে এল; একটা আর এল না। তখন বুড়ি বুড়োকে বল্‌লে তুই পুঁটিমাছ খেয়েছিস?

বুড়ো বল্‌লে "না"

বুড়ো এদিকে বুড়ি চলে যাবার পর থেকে আর নায়নি। তাই দেখে বুড়ি বললে—"আয় বুড়ো, তুই কতদিন নাস্‌নি —তেল মাখবি আয়।" বলে জোর করে যেমন তেল মাখাতে যাবে কি অমনি তার মাথা থেকে পুঁটিমাছের কাঁটা বের হয়ে পড়্‌ল; বুড়ি তখন সব বুঝতে পার্‌লে কি বুড়োই তার পুঁটিমাছ খেয়েচে।

এখন বাড়ীতে খোলার চালে নাউ হয়েচে। বুড়ি এক-দিন বুড়োকে বললে—"তুই এই খোলার চালে উঠে নাউ

পাড়।" বলে তাকে একটা মই এনে দিলে। বুড়ো যেমনি মই বেয়ে উঠ্‌তে যাবে কি, অমনি গড়িয়ে পড়ে—মরে—গেল।

বুড়ো মরে যেতে বুড়ি আর কি করে! বুড়োর একটি কুলগাছ ছিল, এক গাছ তাতে কুল হয়েচে—বুড়ি তার তলায় বসে বসে কাঁদচে—আর বল্‌চে—

"বুড়ো মলো বুড়ি মরে
তার কুলগাছটি কে যত্ন করে?"

এমন সময় এক কাক এসে বল্‌লে—

"বুড়ি বুড়ি কাঁদচিস্ কেন?"

বুড়ি বল্‌লে—"তোকে বলে আর কি হবে?"

কাক বল্‌লে—"আমাকে বল্‌লে তোর ভাল হবে।"

বুড়ি বল্‌লে—

"বুড়ো মলো বুড়ি মরে
তার কুলগাছটি কে যত্ন করে?"

কাক বল্‌লে—"আমি করবো।" বুড়ি বল্‌লে—"কি বলে আগ্‌লাবি?"

কাক বল্‌লে— "কা—কা—কা—
বুড়ির মাথা খা"—

বুড়ি বল্‌লে—"দূর দূর ঝাঁটা মার—ঝাঁটা মার।"

কাক উড়ে গেল।

বুড়ি আবার কুলতলায় বসে বসে কাঁদচে। এমন সময়ে একটা বক এসে বল্‌লে "বুড়ি বুড়ি কাঁদচিস্ কেন?" বুড়ি বল্‌লে—"না তোকে বলে আর আমার কি হবে?" বক বল্‌লে—"বল্‌ই না।" বুড়ি বল্‌লে—

বুড়ো মলো বুড়ি মরে
তার কুলগাছটি কে যত্ন করে?"

বক বল্‌লে—"এই কথা? তা আমি করবো।"

বুড়ি বল্‌লে—"কি বলে আগ্‌লাবি?"

বক বল্‌লে— "বক্ বক্ বক্
বুড়ির মাথায় ঠক্ ঠক্ ঠক্।"

বুড়ি বল্‌লে—"দূর দূর ঝাঁটা মার—ঝাঁটা মার।"

বক উড়ে গেল।

বুড়ি আবার কুলতলায় বসে কাঁদচে,—এমন সময় একটা চিল এসে বল্‌লে—"বুড়ি বুড়ি কাঁদচিস্ কেন?"

বুড়ি বল্‌লে—"তোকে বলে আর আমার কি হবে?"

চিল বল্‌লে—"আমায় বল্‌লে তোর ভাল হবে।"

বুড়ি বল্‌লে— "বুড়ো মলো বুড়ি মরে
তার কুলগাছটি কে যত্ন করে?"

চিল বল্‌লে—"আমি করবো।"

বুড়ি বল্‌লে—"কি বলে আগ্‌লাবি?"

চিল বল্‌লে— "চিল্ চিল্ চিল্
বুড়ির মাথায় মারি ঢিল্ ঢিল্ ঢিল্॥"

বুড়ি বল্‌লে—"দূর দূর ঝাঁটা মার—ঝাঁটা মার।"

চিল উড়ে গেল।

বুড়ি আবার কুলতলায় বসে কাঁদচে। এমন সময়ে এক ফিঙেপাখী এল। সে এসে বুড়িকে বল্‌লে—"বুড়ি বুড়ি কাঁদচিস্ কেন?"

বুড়ি এবার রাগে আর কথাই কইলে না। ফিঙে বল্‌লে—"আমাকে বল্‌না তোর কি হয়েচে? বল্‌লে তোর ভাল হবে।" বুড়ি বল্‌লে—"আমার অমন ভালয় কাজ নেই বাপু।" ফিঙে বল্‌লে—"বলই না কেন? বুড়ি বল্‌লে—

"বুড়ো মলো বুড়ি মরে
তার কুলগাছটি কে যত্ন করে?"

ফিঙে বল্‌লে—"এই কথা তা আমি করবো।" বুড়ি বল্‌লে—"তা কি বলে আগ্‌লাবি?" ফিঙে বল্‌লে—

"ফিঙ ফিঙেটি বাবুই হাটি
যে বুড়ির কুলগাছে হাত দেবে
তার নাকচুল কাটি, নাকচুল কাটি, নাকচুল কাটি।"

বুড়ি খুসী হয়ে বল্‌লে—"হাঁ বাবা, তবে তুই বুড়োর কুল-গাছ আগ্‌লা।" এই বলে বুড়ি বুড়োর শোকে মরে গেল।

সেই কুলগাছে ফিঙে বসে থাকে। এমন সময়ে একদিন এক সওদাগর বাণিজ্য ব্যবসা করে সেই পথ দিয়ে আসচে

—দেখে একগাছ বড় বড় কুল হয়ে রয়েচে। তাই দেখে সে চাকরদের বল্‌লে "ওরে গোটাকতক কুল পেড়ে আন্‌ত গাছ থেকে।" চাকরেরা কুল পাড়তে গিয়েচে আর ফিঙে বল্‌চে—

"ফিঙ্ ফিঙেটি বাবুই হাটি
যে বুড়ির কুল গাছে হাত দেবে
তার নাকচুল কাটি, নাকচুল কাটি, নাকচুল কাটি।"

তাই শুনে তারা ভয়ে পালিয়ে এল। সওদাগরকে বল্‌লে "মহাশয় কুল আমরা পাড়তে পারব না।" সওদাগর বল্‌লে "কেন?" তারা বল্‌লে ডালে একটা পাখী বসে আছে, সে বল্‌চে কুল পাড়লে সে আমাদের নাকচুল কাট্‌বে।"

সওদাগর বল্‌লে "একটা পাখীর ভয়ে তোরা কুল পেড়ে আন্‌তে পারলিনে চল্ দেখি আমি যাই। বলে সওদাগর নিজেই কুল পাড়তে গেল। কুলগাছে হাত দিতেই ফিঙে বল্‌লে—

"ফিঙ্ ফিঙেটি বাবুই হাটি
যে বুড়ির কুল গাছে হাত দেবে
তার নাকচুল কাটি, নাকচুল কাটি, নাকচুল কাটি।"

সওদাগর রেগে বল্‌লে ধরতো পাখীটাকে। এ-ডাল ও ডাল করে সকলে মিলে পাখীকে ধরল। তারপর তাকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সওদাগর বউকে ডেকে বল্‌লে "ও বউ এটাকে রেঁধে ঝোল করে আমাকে খেতে দিওতো। এখন ঢাকা দিয়ে রেখে দাও।" বলে সে বেরিয়ে গেল। এদিকে ঢাকার ভেতর থেকে ফিঙে বল্‌চে—

ও বউ ঢাকন্ খোল নাচন্ দেখ্
ঢাকন্ খোল নাচন্ দেখ্।

বউ ভাব্‌লে তাইতো পাখীর নাচতো কখনো দেখিনি। দেখি দিকি ঢাকা খুলে, বলে যেমনি ঢাকা খুলেচে অমনি ফিঙে ফুড়্—ৎ করে উড়ে পালাল।

এখন কি হয়? বউ একটা কোলা ব্যাং রেঁধে তারির ঝোল সওদাগরকে খেতে দিয়েচে। তাই দেখে ফিঙে বল্‌চে—

"আমি ফিঙে হেথা, আর সওদাগর খায় কোলা
ব্যাংএর মাথা।"

তাই শুনে সওদাগর ফিঙেকে ধরে এনে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বউকে বল্‌লে "একে কেটে ভেজে ঝোল করে দাও।" বউ যখন ফিঙেকে কাট্‌চে তখন সে বল্‌চে—

"আমি কাটি কুটি যাই।"

তারপর তাকে নূন হলুদ মাথান হ'ল। সে বল্‌চে—

"আমি নূন হলুদ মাথি।"

তারপর তাকে তেলে ভাজা হল। সে কড়ার ওপর থেকে বল্‌চে—

"আমি ভাজা ভুজি যাই।"

তারপর তাকে ঝোলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হ'ল। সে তখনো মরেনি বল্‌চে "আমি ঝালে ঝোলে যাই।" তারপর সওদাগর তাকে খেয়ে ফেল্ল।

তখন সে পেটের ভেতর গিয়ে ভয়ানক লাফাতে লাগলো। কাজেই সওদাগরের গা বমিবমি করে এল। সে যেমন হাঁ করেচে অমনি ফিঙে মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে উড়ে পালাল। সওদাগর যেমনি ফিঙেকে কামড়াতে যাবে কি আর অমনি দাঁতে লেগে তার জিভ কেটে গেল। বেচারা বোবা হয়ে রইল।

এবারে সওদাগর ফিঙেকে ধরে মাটিতে পুঁতে রেখে দিলে। ফিঙে মাটির ভেতর থাকে আর ভাবে কি করে বেরুব। এখন একদিন হয়েচেকি একটা শেয়াল এসে সেই মাটি শুঁকচে। ফিঙে ভেতর থেকে বল্‌চে ওরে ভাই শ্যাল আমাকে তোলনা ভাই মাটির ভেতর থেকে, তারপর তুই আমাকে খাস এখন। এই কথায় শেয়াল তাকে মাটি খুঁড়ে তুল্‌ল।

তখন ফিঙে তাকে বল্‌লে দেখ ভাই আমাকে বেশ করে জলে ধুয়ে নিয়ে আয়, কাদা লেগে আছে গায়ে কি করে খাবি? শেয়াল বেশ করে জল দিয়ে তার গা থেকে কাদা ধুয়ে দিলে। তখন ফিঙে বল্‌লে ভাই জল শুদ্ধ কেন খাবি? আগে আমি ডানাগুলো শুকিয়ে নিই তারপর খাস্। শেয়াল তাকে খাবে বলে তার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। মুখ দিয়ে তার নাল পড়চে।

এদিকে রোদে ফিঙের ডানা বেশ শুকিয়ে গেল। সে দুবার ডানা ঝাড়া দিয়ে দেখলে হাঁ এইবার হয়েচে। শেয়াল তখন তাকে বললে এবার তোকে খাই। ফিঙে বললে খা।

তাই শুনে যেমন শেয়াল হাঁ করে তাকে ধরতে যাবে কি অমনি ফিঙে ফুড়ুৎ করে উড়ে গিয়ে বুড়ির কুলগাছের ডালে গিয়ে বসলো আর বলতে লাগলো—

ফিঙ্ ফিঙেটি বাবুই কাটি
যে বুড়ির কুলগাছে হাত দেবে
তার নাকচুল কাটি, নাকচুল কাটি নাকচুল কাটি।

অন্নবস্ত্র

মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে আজ কথা উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে— মেয়েদের জন্য কাজ চাই, কেবলমাত্র পুরুষের একার আয়ে আর চলে না। সে কাজ কি এবং কোথায়, এবং কি উপায়েই বা শিক্ষা করিতে হইবে, তাহার কিন্তু কোনো কূল কিনারা নাই।

এখন দেখা দরকার মেয়েরা নিজের এবং পরিবারের সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া কি কি কাজ গ্রহণ করিতে পারেন। আমাদের দেশে শিক্ষার সুযোগ এত অল্প এবং কর্মক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ যে কি কাজ করা যাইতে পারে তাহা ভাবিয়া পাওয়াই কঠিন।

ভদ্রঘরেও নিরক্ষর স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী, শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প। বাস্তবিক শিক্ষিতা মেয়ের সংখ্যা এত অল্প যে তাঁহারা দেশের স্ত্রীলোক সংখ্যার তুলনায় গণনার মধ্যেই নহেন। তাহা হইলেও তাঁহাদের দিকে তাকাইয়াই আমরা আশ্বস্ত হইতেছি। "আমরা মেয়েদের শিক্ষা দিবই," একথাটা আজও সকলের মনেই উদিত হইতেছে না। মেয়েটিকে কোনো প্রকারে পাত্রস্থ করিতে পারিলেই পিতা মাতার দায় চুকিয়া গেল। কিন্তু যে দুই চার জন দায়মুক্তির এই সহজ পথটিই চরম নয় বুঝিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের আশাস্থল।

যে দেশে ২৫ বৎসরের পুত্র হইলেও সে "ছেলে মানুষ" বলিয়া পিতামাতা তাহার গতি নির্দ্দেশ করিয়া দেন, সেই দেশেই মাত্র ১২।১৪ বৎসরের মেয়েকে যেমন তেমন করিয়া বিবাহ দিয়া পরের হাতে তুলিয়া দিয়া পিতামাতা কি করিয়া কোন্ প্রাণে ভাবেন যে সন্তানের প্রতি তাঁহাদের সব কর্ত্তব্য পালন করা হইল? আমি ত বলি, অন্ততঃ তাহার প্রাথমিক শিক্ষাটা যেমন করিয়া হউক দিতেই হইবে। সব ছেলেই যে 'মানুষ' হয় এবং পিতামাতার দুঃখ বোঝে এমন নহে, তবুও সেই ছেলেটির বেলা পিতামাতা চেষ্টার ত্রুটি করেন না। তবে মেয়েটির বেলাই বা অন্যথা হইবে কেন?

অবশ্য আর একটা কথাও আছে। আমাদের আজকাল লেখাপড়ার খরচ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে মধ্যবিত্ত লোকের পুত্রের শিক্ষা দেওয়াই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে, ত কন্যার শিক্ষা কোথা হইতে দিবে? তবে সমাজ যদি এমন হইত যে কন্যা 'মানুষ' হইয়া নিজেই উপার্জ্জন করিতে পারিত, তাহা হইলে পুত্রকন্যা সমানই হইত।

কন্যা প্রায়ই পিতা মাতার আর্থিক সাহায্য করিতে পারে না; কেননা সে তাহার স্বামীর নিকট নিজের পিতামাতার জন্য সাহায্য চাহিবে, তবে দিতে পাইবে। কাজেই কন্যার থাকিলেও পিতামাতার তাহাতে কোনো সাহায্য হয় না। পিতামাতা যদি বুঝিতেন তাঁহাদের কন্যা নিজের উপার্জ্জন হইতে তাঁহাদিগকে দিতেছে তাহা হইলেই তাঁহারাও নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিতেন।

যাঁহারা উচ্চশিক্ষিতা তাঁহাদের জন্য তবু শিক্ষয়িত্রীর টাইপ্‌রাইটারের, চিকিৎসকের, প্রুফ দেখার, বা অন্যান্য লেখাপড়ার কাজের ক্ষেত্র কিছু কিছু আছে। কিন্তু যাঁহারা

তেমন ভাল লেখা পড়া শিখেন নাই, সমস্যা তাঁহাদের লইয়া। সেলাই, (পোষাক তৈয়ারি বিশেষ করিয়া) ছবি বাঁধানো, ছবি আঁকা, মাদুর বোনা, বই বাঁধানো, আসামী তাঁত বোনা, রেশম বাহির করা, কাপড় ও কাগজের ফুল করা, অভ্রের ফুল ও মালা তৈয়ারি করা, বেতের কাজ করা, এই রকম ছোট খাট কিছু কিছু কাজ অবশ্য আছে, যাহা ঘরে বসিয়াই হইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ সংসারের কাজ চালাইয়া ইহাতে যে সামান্য উপার্জ্জন হইবে, তাহাতে অস ্ল সংসারের আংশিক সাহায্য মাত্র হইতে পারে।

বরং মেয়েরা যদি কৃষির দিকে মন দেন তবে অপেক্ষাকৃত সহজ বেশী উপার্জ্জন হইতে পারে। দুই চারিটি গো পালন, তরকারীর বাগান, ফলের বাগান, ফুলের বাগান, মধুমক্ষিকা পালন প্রভৃতির দ্বারা শুনিতে পাই পাশ্চাত্য দেশে অনেক মহিলারা ঘরে বসিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন। যাঁহারা লেখাপড়া তেমন জানেন না, এ দিকে তাঁহাদের উপার্জ্জনের একটি বড় পথ আছে। ইহার জন্য বেশী জমি কি খুব বেশী অর্থের প্রয়োজন নাই। এক আধ বিঘা জমি হইলেই চলিয়া যায়। রেশম কীট পালন হইতেও অপেক্ষাকৃত সহজে মেয়েরা অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন।

যে দেশে মেয়েদের উপার্জ্জনের জন্য সহস্র সহস্র পথ খোলা আছে, সেই সুদূর পশ্চিম দেশেও মেয়েরা আরো কি কি কাজ গ্রহণ করিতে পারেন এ বিষয়ে একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে। যুদ্ধের পরে দেখাও যাইতেছে, যে এই অবলা জাতির দ্বারা এক একটা দেশের প্রায় অধিকাংশ কাজই সম্ভব হইতেছে। ও দেশে যেমন সহস্র সুবিধা আমাদের তেমনি সহস্র সহস্র বাধা বিপত্তি। একটা বাহিরের কাজ করিতে হইলে এই অসংখ্য বাধা অতিক্রম করিতে হইবে।

মেয়েদের মধ্যেই পাঁচজনে মিলিয়া যদি আমরা একটা কাজ গ্রহণ করি, তবে একটা একটা করিয়া ছোট ছোট হইতে সুরু করিয়া, অনেক বড় কাজ আমাদের দ্বারা সম্ভব হয়। পাঁচজনে মিলিয়া একটা কাজ গঠন করার শিক্ষা আমাদের নাই। কিন্তু এই সকল খুচরা কাজকে সফল করিতে হইলে আমাদের সকলেরি ছোট বেলা হইতে একত্রে কাজের শিক্ষা আবশ্যক। একজনের চেষ্টায় কোনো কাজেই সফল হইবার আশা করা যায় না। সমবেত চেষ্টাই মানুষের উন্নতির উপায়।

শ্রীযুগলমোহিনী দেবী।

অজানা দেশ

(Mrs. Galtyর Parables from Nature হইতে অনুদিত)

ছোট্ট টুনটুনি পাখিটী! তার কাছে দিন রাত্রির কোনই প্রভেদ নেই। নদীর ধারে বাবলা গাছের ঝোপের আড়ালে যে ক্ষুদ্র নীড়টা সে রচনা করেছে সেই ছোট আশ্রয়টীর মধ্যে তার ডানা দুটী মেলে দিয়ে আপন মনে বসে বসে পরমানন্দে রাত্রিদিন সে গান গেয়ে চলেছে।

গ্রীষ্মকালের নিস্তব্ধ রাত্রিতে চাঁদ যে দিন তার সোণার আলো নদীর জলের ঢেউয়ের উপর ফেলে তাকে সোণার ছন্দে নাচিয়ে তুলেছে সেদিন টুনটুনির ছানাগুলি নীড় থেকে মাথা তুলে, তাদের নতুন জীবনকে সার্থক করে প্রথম এই পৃথিবীর পানে দৃষ্টিপাত করলো। টুনটুনির দিকে বিস্ময় পূর্ণ চোখে তাকিয়ে তারা বল্লে "মাগো! এ নদী কোথায় চলেছে? কোন দেশে?" টুনটুনি বুদ্ধির গণ্ডীতে ক্ষুদ্র রেখা টেনে দিয়ে বাবলা গাছের ঝোপে বাঁধা নীড়টীতে বাস করে আসছে। সে এ সবের কোন খবরই রাখে না। তার ছানাদের এই অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তরে একটু হেসে সে বল্লে "বাছা; কাল ভোরের বেলায় চড়ুই পাখী যখন রাজ্যের খবর জোগাড় করে এনে গান গেঁথে বাবলা গাছের ওপর বসে গাইবে, তখন তার কাছে এই প্রশ্নের উত্তর শুনে

নিও। আমি তো এর কিছুই জানি না।" এই বলে টুনটুনি চড়ুই পাখীর অনুকরণে গলার স্বরকে যত দূত সম্ভব সরু করে গাইতে সুরু করলো চড়ুই পাখীর কাছ থেকে শোনা, সেই যে নদ, নদী, পাহাড়, বড় বড় সব প্রাসাদের কথা সে সব সে চড়ুই পাখীর মতন করে নিজের ছন্দে গেয়ে গেলো। টুনটুনি ভারী চঞ্চল! সে চড়ুই পাখীর গান ধৈর্য্য ধরে শেষ পর্য্যন্ত কোন দিনও শোনে না। গান গাইতে গাইতে টুনটুনির সব কথা ভারী অস্পষ্ট হয়ে উঠলো। কিন্তু টুনটুনির ছানাদের কাছে তাদের মায়ের গান চড়ুই পাখীর গানের মতনই বিস্ময়কর ঠেকলো। তারাও তাদের মায়ের সঙ্গে গান ধরলো। গাইতে গাইতে খড় কুটো দিয়ে বাঁধা ছোট্ট নীড়টীতে মাথা রেখে তারা সব ঘুমের রাজ্যে চলে গেলো। তারপর রাত্রি শেষে সূর্য্য যখন তার অরুণ আলোর ছোট্ট একটী কণা তাদের নীড়ের উপর ফেলে তাদের জাগিয়ে তুল্লে তখন সকাল বেলাকার আলোর সুরে সুর মিলিয়ে তারা আবার গান ধরলো।

টুনটুনি কিন্তু ভোরের আলোর সঙ্গে বাবলা গাছ ছেড়ে উড়ে আর একটা গাছের উঁচু ডালে বসে গান ধরলো। যত দিন যেতে লাগল বসন্ত তার আগমণের বার্ত্তা অল্পে অল্পে সমস্ত বনময় ছড়িয়ে দিলো টুনটুনি আজকাল তার ছানাদের কাছে বড় বেশী থাকে না। যখনই সময় পায় বাবলা গাছ ছেড়ে উড়ে বড় গাছের উঁচু ডালে একলাটী বসে আপন মনে গান গায়। গানের সুর নদীর জলের স্রোতের সঙ্গে ভেসে যায় কোন অজানা দেশে তা সে নিজেই জানে না। সে গায় সে দেশের কথা যে দেশে আর অল্পদিন পরেই সে তার সঙ্গীটীর সঙ্গে ছানাগুলিকে নিয়ে উড়ে চলে যাবে। সে দেশ টুনটুনির কাছে এক অজানা দেশ। যদিও টুনটুনি সে দেশ থেকেই একদিন উড়ে এসে এই খানে নীড় বেধেছিল, আজ আর টুনটুনির মনে সে দেশের স্মৃতির এক কণাও জাগে না। ক্রমে বসন্ত এসে দেখা দিলো। টুনটুনি যে দেশের কথা এতদিন আপন মনেই গেয়ে বেড়াত এবার তার ছানাদের সেই অজানা দেশের কথা গান গেয়ে শোনালো। আর তো বেশী দিন নেই এবার যে তার ছানাগুলিকে তার সঙ্গে সেই অজানা দেশে উড়ে যেতে হবে, এখন থেকেই যে তাদের এ সব বিষয় জেনে রাখা দরকার! মায়ের গান শুনে টুনটুনির ছানাদের অজানা দেশের বিস্তারিত খবর শোনবার জন্যে মন উৎসুক হয়ে উঠলো তাদের মধ্যে যে ছানাটী একটু বড় সে বল্লে "এই নদীটা নিশ্চয় মাগো সেই দেশের উদ্দেশ্যেই ভেসে চলেছে?" এমনি করে অজানা দেশের গান গেয়ে আর তার মধুর কল্পনা নিয়ে টুনটুনি তার ছানাদের সঙ্গে নদীর পাড়ে পাড়ে ঘুরে বেড়ায়।

এমনি করে রোজই টুনটুনি গান গায় আর ছানারা শোনে। একদিন টুনটুনির গান গাওয়া শেষ হলে তার সব চাইতে যে ছোট ছানাটি সেটি বলে উঠলো "মাগো কেন তুমি শুধু সেই দেশেরই গান গাও? সে দেশ তো আমরা কেউ কখনও চখে দেখিনি? আমাদের এই নদীর ধারের লাল রাস্তা, বাবলা গাছের ছোট নীড় এ ছেড়ে অন্য দেশে কেন আমরা উড়ে যাবো মাগো? সেই অজানা দেশে কি এখানকার মতন নদীর পাড়ে কচি ঘাসের ক্ষেত আছে? এস না তার চাইতে আমরা এইখানেই নদীর ওপারে সুন্দর নীড় বেঁধে থাকি গিয়ে চল? এ দেশ ছেড়ে আর কোন নতুন দেশে আমি যেতে চাই না। এখানে আমরা কত সুখে আছি। মাগো তুমি আর সে অজানা দেশের গান গেও না। আমার একটুও ভাল লাগে না।" ছানাটির কথা শুনে টুনটুনির মনে কত কথা জেগে উঠলো। সে নীরবে ডালের প্রান্তে বসে রইলো। কিছুই বল্লো না। ছানাটি মায়ের প্রতি একবার চেয়ে আবার বল্লে "সকাল বেলাকার আকাশের গায়ে রঙ্গীন আলোর কথা একবার মনে করে দেখ তো মাগো! সেই নদীর ওপার থেকে সূর্য্যের উত্তপ্ত কিরণ এসে যখন আমাদের রাত্রিবেলাকার শিশির সিক্ত নীড়ের উপর পড়ে তখন কি আনন্দেই আমরা গান গেয়ে উঠি! মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত সূর্য্যে যখন চারিদিক ধূ ধূ করে তখনও কত আনন্দ! আর দিনের শেষে সূর্য্য যখন নদীর ওপার দিয়ে নেমে চলে যায় তখন গান গাইতে

গাইতে—আমরা সবাই বাসায় ফিরে এসে এমনি করে তোমার চারিদিকে বসে তার দিকে চেয়ে থাকি, আর তুমি আমাদের কত গান শোনাও! তার পর চাঁদের আলোর সঙ্গে গান গাইতে গাইতে ঘুমের দেশে চলে যাই। চাঁদের আলোয় তরী বেয়ে মাঝি যখন আমাদের নীড়ের কাছ দিয়ে চলে যায় তখন জেগে উঠে তার তরী বাওয়ার তালে তালে কি আনন্দেই আমরা গেয়ে উঠি। আর যখন বৃষ্টি পড়ে? তখন নীড়ের মধ্যে যে কোমল শয্যা তুমি আমাদের জন্যে পেতে রেখেছ, আমরা সব ভাই বোনেরা তারই ভেতর গুড়ি মেরে তোমার চারিপাশে শুয়ে শুয়ে, পাতার উপর বৃষ্টির ফোঁটা গুনি; তখন কত আনন্দ! এ নদীর পাড় ছেড়ে, এ দেশ ছেড়ে, আমি কোথাও যাবো না মাগো! এখানে কত সুখ, কত তৃপ্তি। শুনবো না, আর আমি তোমার সেই অজানা দেশের কথা শুনবো না। তুমি আর আমাদের কাছে সে দেশের গান গেও না।”

(ক্রমশঃ)

মুসলমানের বিবাহ পদ্ধতি

একবার ষ্টীমারে একটি সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলা আমার সঙ্গী ছিলেন। তাঁহার কাছে তাঁহাদের আচার ব্যবহারের বিষয় কিছু শুনিয়াছিলাম তাহাই আজি কিছু লিখিতেছি।

মুসলমান মেয়েরা মোটে বার বছর পর্য্যন্ত স্বাধীন থাকে বার বছর হইলেই তাঁহাদের পর্দ্দা হয়। ঢাকনা বা পর্দ্দা ব্যতীত কোথাও বাহির হইতে পারেন না। পিতা, পিতামহ, ও সহোদর ভাই ছাড়া আর কোন পুরুষের সামনে বাহির হওয়ার নিয়ম নাই ইহা তাঁহারা অত্যন্ত পাপ বলিয়া মনে করেন বিবাহ হইলেও তাঁহাদের পর্দ্দা বিশেষ কিছু মাত্র কমে না তবে নেহাত নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সামনে বাহির হইতে পারেন। এই গেল তাঁহাদের অবরোধ প্রথার কথা।

কুমারী অবস্থায় যদি কোন মেয়ে কোরাণ শরিফ পড়িয়া শেষ করেন তবে তাঁহাদের মা, বাবার বেহস্ত অর্থাৎ স্বর্গ হয় এই তাঁহাদের বিশ্বাস। ইহাতে বাবা, মা, খুব পুণ্য মনে করেন।

তাঁহাদের বিবাহ ব্যাপারটি বড় মজার। কোন স্থানে বিবাহ স্থির হইলে ছেলের অবিভাবক ও মেয়ের অবিভাবক একটা প্রকাশ্য স্থানে সমাজের পাঁচ জনকে লইয়া লেন দেন বিষয় ঠিক করিয়া আসেন। তাহার পর বিবাহের দিন খুব সমারোহ করিয়া অনেক লোক-জন লইয়া বর মেয়ের বাড়ীতে আসেন। বাহির বাড়িতেই বরকে বসান হয় সেখানে একটা বড় মজলিশ বা সভা হয়। তখন সেখানে কয়েকটি কোরাণের বয়েৎ বরকে উচ্চারণ করিতে হয়। তাহার পর মৌলবী তাঁহাকে প্রশ্ন করেন তার ভাবটা এই যে, তুমি এই মেয়ের ভার নিতে রাজী আছ কিনা বর তখন কোরাণ হাতে লইয়া তিন বার বলেন ভার নিলাম। তার পর মৌলবী একবার নামাজ পড়েন। এখন হইতে বর অন্দরে যাইবার অধিকার পায়।

তখন বর বাড়ীর ভিতর একটা ঘরে যায়। কিন্তু বরের সঙ্গের একটি পুরুষ ও ভিতরে যাইতে পারে না।

এদিকে বিবাহের দিন মেয়েকে বরের বাড়ী হইতে সাজ-সজ্জার সমস্ত জিনিষ পাঠান হয় গন্ধ আতর, কাপড় জুতা গহনা প্রভৃতি পাঠায়। সে দিন মেয়েরা সকলে মিলিয়া কণেকে স্নান করাইতে যায়। একটা মশারী টানান থাকে তাহার ভিতরে কণে গিয়া স্নান করে। স্নানের পর সাজাইবার পালা আরম্ভ হয়। বরের বাড়ী হইতে একটা বিছানা মেয়েকে দেয় সেই বিছানায় বসাইয়া সাজায়। যে মেয়েরা স্নান করায় এবং সাজায় তাহাদেরও কিছু প্রাপ্য থাকে।

তার পর বর আসিয়া যে ঘরটায় বসিল সেই ঘরে কণেও

যায় কিন্তু মেয়ের সঙ্গে ঠাট্টার সম্পর্কীয় একজন ছাড়া আর কেহই সে ঘরে থাকিতে পারে না এমন কি বাহিরে একজনকে পাহারা দিবার জন্য রাখা হয় যেন আর কেহ ঢুকিতে না পারে। ঠাট্টা সম্পর্কীয় যে থাকে সে হয় বড় ভাজ নয় ভগ্নী পতি। সেই ঘরে মাঝ খান দিয়া একটা পরদা টানন থাকে এক দিকে বর ও অন্য দিকে কণেও সঙ্গীটি থাকে তখন কণে পুর্দ্দার একটা ছিদ্র দিয়া একটি অঙ্গুলি ঢুকাইয়া দেয় বর একটি অঙ্গুরী কণের আঙ্গুলে পরাইয়া দেয়। তখন সেই সঙ্গীটি পর্দ্দাটা উঠাইয়া ধরে সেখানে একটা আয়না পাতা থাকে তাহার মধ্য দিয়া বরও কণে পরস্পরকে দেখে, দেখা হইলেই সেই সঙ্গীটি কণেকে উঠাইয়া ওদিকে বরের কাছে বসাইয়া দেয়। সেখানে ক্ষীর ও মিষ্টি থাকে। সেই মিষ্টি হইতে উঠাইয়া বর কণের মুখে তিনবার মিষ্টি দেয়, তাহার পর ক্ষীরের পাত্রটির দিকে বর তাকায় ইহার নাম ক্ষীর ভোজন। তখন বরের শাশুড়ি পর্দ্দার ওদিকে আসেন এবং তাহার আঁচল খানি পর্দ্দার এদিকে ফেলিয়া দেন সেই আঁচল দিয়া বর মুখ পুছিয়া সেই আঁচলে কতকগুলি টাকা বান্ধিয়া ফেরত দেয়। তখন শাশুড়ী বরের সামনে বাহির হন বর তাহাকে সেলাম করে তিনি তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করেন। ওদিকে অন্য মেয়েরা একটা পানের ঝাড় পর্দ্দার এদিকে দেয়। বর তাহাতে টাকা দিয়া ফেরত দেয় তখন পর্দ্দাটা সেখান হইতে সরান হয়।

বাহিরে এসময় মৌলবী নমাজ পড়েন তখনি বর সকলকে সেলাম করিয়া কনেকে লইয়া পাল্কীতে উঠিয়া নিজের বাড়ী চলিয়া যায়॥

এই হইল তাহাদের বিবাহ অনুষ্ঠান।

শ্রীরেণুকা দেবী।

শ্রেয়সী পত্রিকার নিয়মাবলী

১। শ্রেয়সীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা।

বৈশাখ মাস হইতে পর বৎসরের চৈত্র পর্য্যন্ত শ্রেয়সীর বৎসর গণনা করা হয়। যিনি যে বৎসরের গ্রাহক হইবেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে পত্রিকা দেওয়া হইবে।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে শ্রেয়সী প্রকাশিত হয়। কোন গ্রাহক সময় মত না পাইলে ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৩। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পত্রিকা প্রকাশের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমাদিগকে জানাইবেন নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী থাকিব না।

৪। শান্তিনিকেতনবাসীদের জন্য শ্রেয়সীর বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

৫। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থাদি ও চিঠি পত্র পাঠাইবেন।

৬। ডাকমাশুল সমেত চিঠি না দিলে কাহারও চিঠির জবাব দেওয়া হয় না।

বীরভূম
শান্তিনিকেতন পোঃ

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীপ্রতিমাদেবী,
শ্রীরমাদেবী।

১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা   কার্ত্তিক, ১৩২৯

শ্রেয়সী

মাসিক পত্র

সম্পাদিকা—শ্রীকিরণবালা সেন

মূল্য, বার্ষিক সডাক ২৲ টাকা।

শ্রেয়সী

মাসিক পত্র

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্য মেত
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুর্ভবতি।
হীয়তেঽর্থাৎ য উ প্রেয়োবৃণীতে॥"

"শ্রেয়ঃ প্রেয় সবাইকে পায়।
দেখে' বেছে' ধ্যায়্ যে যেটা চায়॥
যে ধ্যায়্ শ্রেয়—সে পায় কূল।
যে ধ্যায়্ প্রেয়—খোয়ায় মূল॥"

কঠোপনিষদ্।
১ম অধ্যায়, ২য় বল্লী।

১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

কার্ত্তিক, ৩২৯ সাল

মেয়েদের দেহচর্য্যা ও বেশভূষা

এদেশে মেয়েদের বেশভূষা সাধারণতঃ বিলাসিতা বলিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষেই দেখা হইয়া থাকে। অবশ্য এই বিষয়েই আবার তাঁহারা অন্য সকল বিষয় অপেক্ষা সকল দেশেই ছাড়া পাইয়া আসিতেছেন সন্দেহ নাই। ইহা যখন এতই সর্ব্বত্র প্রচলিত ও মেয়েদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য প্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন ইহাকে একেবারে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করা সঙ্গত হইতে পারে না। বাস্তবিক, আমাদের সকল স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই যেমন ঘৃণার বস্তু নয়, কেবল তাহার অপব্যবহারেই দোষের হইয়া উঠে, ইহাও সেইরূপ।

মনের ন্যায় দেহের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির চেষ্টাও স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই করা উচিত।

মেয়েদের সম্বন্ধেও তাহা বিশেষরূপেই খাটে। তাঁহারা সাজিয়া গুজিয়া পুতুল বা গৃহসজ্জার একটি অংশমাত্র হইয়া থাকেন, ইহা যেমন অনুচিত তেমনি ঘৃণাই। প্রকৃতপক্ষে বহু আড়ম্বরপূর্ণ বেশভূষায় সজ্জিত মেয়েদের অনেকের মধ্যে যে একটি অন্তঃসারশূন্যতা, কিংবা অর্থশূন্য চাহনি ও জড়ভাব ফুটিয়া ওঠে তাহা দেখিলে ঐগুলি দূরে ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা করে। মনে হয় এই সব মেয়েদের যেন পৃথিবীর সমস্ত সার পদার্থ হইতে বঞ্চিত করিয়া খেলনা দিয়া ভুলাইয়া রাখা হইয়াছে। ঐরূপ সাজ সজ্জায় সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ত হয়ই না, অধিকন্তু, উজ্জ্বল বস্ত্ররাশির মধ্য হইতে অন্তরের দৈন্য আরো পরিস্ফুট হইয়া দেখা দেয়। আসল কথা, দেহচর্য্যা ও বেশভূষা রুচিজ্ঞান ও শিক্ষাসাপেক্ষ; এবং মনের সম্পদ তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশ না পাইলে তাহাতে কখনই

প্রকৃত সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতে পারে না। এই কথাটি মনে রাখিয়া মেয়েদের মানসিক ও শারীরিক উভয়বিধ সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির চেষ্টাই একসঙ্গে করা উচিত। ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়, মানুষের জ্ঞানের পরিধি যতই বিস্তার লাভ করিতেছে, পূর্ব্বে যেগুলিকে পরস্পর বিরোধী বোধ হইত তাহাদের অন্তর্নিহিত সম্বন্ধসূত্র ততই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে যাঁহারা মনের সম্পদ বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইতেন, দৈহিক সৌন্দর্য্যের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব থাকিত। সেইজন্য মেয়েদের মধ্যেও যাঁহারা মানসিক উন্নতির চেষ্টা পাইতেন, তাঁহাদেরও দৈহিক সৌন্দর্য্য ও বেশভূষায় ঔদাসীন্য দেখা যাইত। Blue stocking বা বিদুষীদের লোকের নিকট অপ্রিয় হইবার ইহাও একটি কারণ। এদিকে মার্জ্জিতরুচি, যথার্থ সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে বঞ্চিত হইয়া মেয়েদের দৈহিক সৌন্দর্য্য ও বেশভূষাও মলিন হইয়া থাকিত। বিদুষীরা তাহাই দেখিয়া ঘৃণাভরে ঐসকল পরিত্যাগ করিতেন। কিন্তু এখন ক্রমেই লোক বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে বাস্তবিক দেহ ও মনের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই। একটির সঙ্কোচে অপরটির অবনতি ব্যতীত উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, আপাততঃ যখন আমরা দেহচর্য্যা ও বেশভূষার কথাই বলিতে বসিয়াছি তখন তাহাই আরম্ভ করা যা'ক। তবে মনের বিকাশ ব্যতীত যে তাহার চেষ্টা বৃথা, তাহাই কেবল বলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি।

আমাদের দেশে মেয়েদের দেহচর্য্যা এবং বেশভূষার সৌন্দর্য্য চর্চ্চার চেষ্টা অন্য সকল প্রকার শিক্ষার মত যথার্থভাবে আরম্ভই হয় নাই বলা যাইতে পারে। অল্পসংখ্যক শিক্ষিতারা বেশভূষায় অনেকটা উন্নতি করিয়াছেন, এবং অপর অনেকে তাহার যথেষ্ট নিন্দা করিতে করিতেও অনুকরণ করিতেছেন দেখা যাইতেছে। কিন্তু বেশভূষার শোভনতার আগেও যে দেহচর্য্যার প্রয়োজন, তাহার সুযোগ শিক্ষিতারাও অল্পই পাইয়াছেন। বাস্তবিক, মেয়েদের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উপায় যে স্বাস্থ্যলাভ তাহাতে এ পর্য্যন্ত কেহই ভালরূপে মন দেওয়ার চেষ্টা করিতে পারেন নাই। সেইজন্যে আমাদের দেশের দুষ্টিমেয় শিক্ষিতাদেরও স্বাস্থ্যহীনতার অপবাদ শোনা যায়। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার ঠিকমত সুযোগ তাঁহারাও যে প্রায় কিছুই পান না, অধিকন্তু মানসিক পরিশ্রমে দেহের ক্ষয়মাত্র সার হয়, তাহা কেহই ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখেন না। ইহার জন্য বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীও কতকটা দায়ী সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রধান কারণ স্বাস্থ্যরক্ষায় নিয়মলঙ্ঘন। মানসিক পরিশ্রমের সহিত যেরূপ পুষ্টিকর আহার, মুক্ত বাতাসে অবস্থান, মনের প্রফুল্লতার সহিত সকল অঙ্গের যথাযথ সঞ্চালন আবশ্যক, তাহা হইতে তাঁহারা একান্তভাবে বঞ্চিত হইয়াছেন। তাহা না হইলে ঠিকমত মানসিক পরিশ্রমে স্বাস্থ্যহানির কিছুমাত্র কারণ নাই। অনেক সময় মানসিক পরিশ্রমের পরে মনের বিশেষ স্ফূর্ত্তি, ও শারীরিক পরিশ্রম, আমোদ আহ্লাদ করিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয়। সেই স্বাভাবিক ইচ্ছা ঠিকমত পথে পরিচালিত হওয়া উচিত, নতুবা স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী।

শারীরিক পরিশ্রমে সকল অঙ্গের সঞ্চালনের সহিত মনের স্ফূর্ত্তি একান্ত আবশ্যক। সুতরাং সাধারণতঃ ঘরের কাজে যে, পরিশ্রম হয়, তাহাই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না। কারণ আমাদের প্রকৃতি সর্ব্বদা কাজ চাহে না, অনেক সময় তাহাকে নিছক আনন্দ, খেলাতেও ছাড়িয়া দেওয়া দরকার। বিশেষতঃ বালিকাদের সম্বন্ধে ইহা যে কত সত্য তাহাত বলাই বাহুল্য। মানসিক পরিশ্রম যাহাদের করিতে হয়, তাহাদের ইহা আরো আবশ্যক। সুতরাং মেয়েরা স্কুল হইতে আসিলেই সংসারের সব কাজ তাহাদের উপর চাপানো ঠিক নহে। তখন তাহাদের উপযুক্ত আহারের পর হাসিখেলা করিতেই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে যাঁহারা মনে করেন মেয়েরা ঘরের কাজ কিছুই শিখিবে না, তাঁহাদের কথায় সায় দেওয়া কঠিন। রাতারাতি সকল বিদ্যায় পারদর্শী করিতে গেলে কিছুই হইয়া উঠে না; সকল বিষয়ে রহিয়া সহিয়া করিলেই পরিণামে হিতকর হয়। গৃহকর্ম্মও প্রথম

হইতেই মেয়েদের ঘাড়ে না চাপাইয়া খেলাচ্ছলে ক্রমে ক্রমে শেখানো যাইতে পারে, তাহাতে তাহাদের উহাতে আগ্রহ ও স্ফূর্ত্তি জন্মাবে। বাস্তবিক, মেয়েদের শরীর, মন সুস্থ থাকিলে গৃহকর্ম্মেও তাহাদের স্বভাবতঃ অনুরাগ আসিতে দেখা যায়। কিন্তু একথাও না বলিয়া পারা যায় না যে গৃহকর্ম্মে বালিকাদের তেমন অপকার না হইলেও সর্ব্বদা শিশুদের কোলে লইয়া থাকিলে তাহাদের শরীরবৃদ্ধির যথার্থ ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু ঘরের কাজ বিশেষ কিছু না করিলেও ছোট ছোট মেয়েদের সমস্তক্ষণ শিশুদের কোলে লইয়া বাঁচিয়া থাকাই আমাদের দেশের সাধারণ দৃশ্য। ইহার পরিণামে মেয়েদের যে কত অপকার হইয়া থাকে ও তাহারা ঠিকমত বাড়িতেই পায় না, ইহা মনে রাখা উচিত। এখানেও মেয়েদের সন্তানপালন শিক্ষার কথা উঠিতে পারে জানি, কিন্তু ঐ শিক্ষাটি ঐরূপভাবে না হইলেও কোনো ক্ষতি হয় না। মেয়েরা ছোট ছোট ভাই বোনদের লইয়া আমোদ প্রমোদ, খেলা করিতে করিতেই তাহাদের শিশুদের প্রতি ভালবাসা বেশী হইবার সম্ভাবনা। আমরা অনেক স্থলেই দেখিয়াছি ঐরূপ সর্ব্বদা ছেলে লইতে লইতে তাহাদের ভাই বোনদের প্রতি ঘৃণার ভাব আসিয়া থাকে, এবং বাড়ীতে ঐরূপ নূতন প্রাণীর আগমন সম্ভাবনাও তাহারা আশঙ্কার চক্ষেই দেখিয়া থাকে। তাহা অপেক্ষা সংসারের কাজও তাহারা অনেক পছন্দ করে।

কথা হইতে পারে মেয়েরা ঘরের কাজ, ছেলেদের রাখা কিছুই না করিলে গৃহস্থলোকের কেমন করিয়া চলিবে। সকলের ত আর বেশী দাসদাসী রাখিবার ক্ষমতা নাই; আর তা রাখাও ক্রমেই যেরূপ ব্যয়সাধ্য ও কঠিন হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে বলিতে হয় যে মেয়েটি বড় হইতে না হইতেই যদি এত কাজের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আর একটু বড় হইয়া সম্পূর্ণ কাজের উপযুক্ত হইলে যখন তাহার বিবাহ হইয়া শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইবে তখন চলিবে কি করিয়া, তখন ত যেমন করিয়া হউক তাহাকে বাদ দিয়াই কোনো একটা ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে? তাহা হইলে ত মেয়েদের বিবাহ দেওয়াও বন্ধ করিতে হয়। আসল কথা, ঘর সংসারের গঠনপ্রণালী যথেচ্ছাচারতন্ত্রে (autocratic) চালিত না হইয়া জনতন্ত্রের (democratic) অনুবর্ত্তী হইলেই শ্রমবিভাগ ঠিক থাকিতে পারে। অধিকাংশ পরিবারেই অবস্থা যেমনই হউক, কর্ত্তা হইতে বাড়ীর ছেলেরা পর্য্যন্ত সকলেই "বাবু"। তাঁহাদের কাজ কিছু করা দূরে থাকুক, নবাব, বাদশার মত পান, তামাক, খাবার বাড়ার মেয়েদের কাজ ভাঙ্গা খাটিয়া হাতে হাতে যোগাইতে হয়। [illegible] কলিকাতা ও তাহার আশেপাশের "বাবুদের" ব্যবহারই অধিকতর প্রসিদ্ধ। ইহার উপর পূর্ব্ব আভিজাত্যের এতটুকু গন্ধ থাকিলে ত আর রক্ষা নাই। অনেকে বলিবেন কর্ত্তাদের অর্থোপার্জ্জন ও ছেলেদের পড়াশুনার জন্য এমনই অনেক খাটিতে হয়, তাঁহার উপর ঘরের কাজ কখন করিবেন। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে তাঁহারা ঐসকল কাজকর্ম্ম এবং পরিমিত বিশ্রামাদি করিয়াও যেটুকু করিতে পারেন তাহাই সকলে করিয়া থাকেন কি?—তাহার অধিক অবশ্য তাঁহাদের কাছে কেহ চাহিতেছেন না। তাঁহারা বুঝিয়া সংযত হইয়া চলিলেই যে বাড়ীর কাজ অনেক কমিয়া যাইতে পারে। অবস্থা বুঝিয়া খাওয়াদাওয়ার অন্যান্য হাঙ্গামা ইত্যাদি ছাড়িয়া বাড়ীর প্রত্যেক আপনাপন কাজ নিজ হাতে করিতে থাকিলেই শুধু মেয়েদের উপর অতটা চাপ পড়িতে পারে না। বাস্তবিক, ইহাতে কেবল মেয়েরাই যে কষ্ট পান তাহা নহে, শিশুরাই অধিকতর দণ্ডভোগ করে। মা'র প্রধান কাজ তাহাদের লালন পালন না হইয়া তাঁহার অধিকাংশ সময় বাড়ীর পুরুষদিগের রসনার তৃপ্তিসাধন ও তাঁহাদের পরিচর্য্যাতেই অতিবাহিত হওয়া ঐ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকে না। ইহাতে শিশুমৃত্যুর হারও যে কতটা বাড়াইতেছে বলা যায় না। তাহার পর শিশুরা যেরূপ দায়িত্বশূন্যভাবে আমাদের এই অনটনের সংসারে "আসিতেই" থাকে, তাহা আর আজকালকার দিনে চলিতে পারে না। এ বিষয়ে আমাদের কুসংস্কার, অজ্ঞতা, ও দায়িত্বশূন্যতার পরিমাণ দেখিয়া

অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। বিষয়টি এতই গুরুতর যে এখানে উল্লেখমাত্র ভিন্ন আর কিছুই বলা সম্ভব নহে। এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি আসিলে সন্তানপালন ও গৃহকর্ম্ম এত বিরাট ব্যাপার অথচ এত কুপরিচালিত হইতে পারিবেনা।

এখন আমাদের আসল কথায় ফিরিয়া আসা যা'ক্। আমাদের মেয়েদের আর একটি অভাব তাঁহারা দেহের সকল অঙ্গ অবলীলা ক্রমে ও শোভনভাবে সঞ্চালন করার কৌশল কিছু শেখেন না। ইহাতেও তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের অনেক হানি হইয়া থাকে। ইহা ঠিকমত আয়ত্ত করিতে হইলে উপযুক্ত ব্যায়ামের সহিত নৃত্যকলাও কিছুদূর পর্য্যন্ত শেখা উচিত। ইহাতে অনেকেই হয়ত বিরুদ্ধ হইয়া উঠিবেন, অথবা হাসি রাখিতে পারিবেন না জানি, তথাপি মেয়েদের ব্যায়াম ও সহবৎ শিক্ষার জন্য নৃত্যকলার উপযোগিতা স্বীকার করিতেই হইবে। পাশ্চাত্যদেশে ইহার প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হয়, আমাদের অবশ্য তাহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কয়েকটি দেশী, বিলাতী নৃত্যকলা পদ্ধতি, ও শোভনভাবে দেহ সঞ্চালন করিবার কৌশল মেয়েদের শেখানো দরকার। এবিষয়ে, Isabella Duncan নামক মহিলাটি মেয়েদের যে নূতন প্রণালী অনুসারে নৃত্য-কলা শিখাইতেছেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ আনাইয়া আমা-দের দেশের মেয়েদের তাহা কতটা উপযোগী হয় পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। কেবল মাংসপেশীর পুষ্টির উপর এখন সকল বিশেষজ্ঞরাই বিশ্বাস হারাইতেছেন, সুতরাং মেয়েদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য dumb-bell ইত্যাদি অপেক্ষা যাহাতে মনের স্ফূর্ত্তির সহিত সকল অঙ্গের চালনা হয় তাহাই বাছিয়া লইতে হইবে। মুক্তবাতাসে খেলা ও নৃত্যকলার চর্চ্চা ইহার সবিশেষ উপযোগী বলিয়াই বোধ হয়। সাঁতার শিক্ষাও আর একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। ইহা শেখাও যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, ব্যায়ামের কাজও ইহাতে তেমনি হইতে পারে। Swiss drill এবং জিউজিৎস্থও মেয়েদের শেখানো মন্দ নহে। তবে সকল ব্যায়ামই যে মেয়েদের শক্তি, প্রকৃতি বুঝিয়াই করা উচিত তাহা অবশ্য সকল সময়েই মনে রাখিতে হইবে।

এইবার বেশভূষার কথা কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে "শিক্ষিতারা" অনেকটা উন্নতি করিয়াছেন এবং অপর সকলে নিন্দা করিলেও তাহাই গ্রহণ করিতেছেন তাহা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু জাতি হিসাবে বলিতে গেলে আমাদের বাঙালী মেয়েদের ইহাতে বড়ই অভাব ও ঔদাসীন্য দেখা যায়। প্রকৃত পরিচ্ছন্নতায় তাঁহারা হয়ত অপর প্রদেশ অপেক্ষা পশ্চাদ্‌বর্ত্তী নহেন, কিন্তু সৌন্দর্য্য প্রিয়তার অভাব তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্টই আছে। বাঙালী মেয়েদের সাধারণ বেশ যে শোভনতা, শালীনতা কিছুর পক্ষেই পর্য্যাপ্ত নহে তাহা বলাই বাহুল্য। তবে ইহাতে যে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ক্রমেই তাহা বিস্তৃত হইবার আশা আছে।

এই প্রসঙ্গে দারিদ্র্যের কথা উঠিতে পারে, কিন্তু ইচ্ছা করিলে অনেকেই কি অবস্থানুযায়ী চলিয়াও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও শোভনতার দিকেও কতকটা দৃষ্টি রাখিতে পারেন না? ইহাতেই ত আরও বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। অবস্থা ভাল নয় বলিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার চেষ্টাও ছাড়িয়া না দিয়া তাহার মধ্যেই যতটা পারা যায় ঐ বিষয়ে প্রয়াস করাই উচিত নহে কি? ভূষণের প্রতি আমাদের যে অনুরাগ, তাহা বসনের দিকে আর একটু যাওয়া উচিত। অনেকে বলিতে পারেন গহনার একটি স্থায়ী মূল্য আছে, এবং আমাদের মেয়েদের যখন তাহাই সম্বল, তখন তাহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার সত্যতা কতকটা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই অবস্থাই কি চিরকাল চলিতে থাকিবে?—বর্ত্তমান অবস্থা মানিয়া লইয়াই কেবল যদি চলিতে হয়, তাহা হইলে ত কোনো উন্নতির কথা বলাই সম্ভব হয় না।

তাহার পর আর একটি কথা বলাও আবশ্যক। আমাদের পোষাকী ও আটপৌরে পরিচ্ছদের যেরূপ আকাশ পাতাল পার্থক্য তাহা আর একটু কমাইলে ক্ষতি নাই।

এই দুইরকম পরিচ্ছদের কতকটা ভেদ রাখা প্রয়োজন হইলেও বাড়ীতেই যখন অধিকাংশ সময় কাটাইতে হয় তখন পোষাকী পরিচ্ছদে অযথা ব্যয় বাহুল্য করিয়া সদাসর্ব্বদা কুবেশে থাকা কখনই ঠিক নহে। বাড়ীতে মোটা কাপড়ও শোভনভাবে পরিবার ভঙ্গী ও রীতি শেখা উচিত, এবং তাহার মধ্যেও পরিচ্ছন্নতার সহিত যতটা সম্ভব সৌন্দর্য্য ও সামঞ্জস্যের দিকেও দৃষ্টি রাখা যাইতে পারে। তাহার পর বাহিরের পরিচ্ছদেও অবশ্য স্থান, কাল, ও উপলক্ষ্য ভেদে উপযোগিতা বিচার করিয়া ব্যবহার করা উচিত। শীতের দিনে বা সমুদ্রের ঝড়ো বাতাসের মধ্যে পাতলা কাপড় পরিয়া বেড়ান, কিম্বা রেল গাড়ীতে যাতায়াতে হাল্কা রংএর কাপড়, যাহা সহজে ময়লা হইয়া যায় তাহা ব্যবহার করা সুবুদ্ধির পরিচয় নহে। স্থান, কাল ভেদে ভিতরের কাপড়ও ঠিক মত ব্যবহার করিতে জানা চাই। বাহিরে হাঁটিয়া বেড়ান ও গাড়ীতে নিমন্ত্রণে যাইবার কাপড়ও এক রকম হইতে পারে না। এই সকল ঠিক রাখিতে খুব অতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্যের প্রয়োজন হয় না। আমাদের সচ্ছল অবস্থার মধ্যবিত্ত লোকেও আজকাল মেয়েদের বেশভূষায় যেরূপ খরচ করেন তাহাতে ত সব গুছাইয়া করাই যায়, অপেক্ষাকৃত অল্প সৌভাগ্যশালীরাও আপনারা পরিচ্ছদ প্রস্তুত শিখিলে সহজেই অনেকটা সুবেশে থাকিতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ইহাও বলা উচিত, আজকাল মেয়েদের যেরূপ মূল্যবান পরিচ্ছদের উপর আসক্তি দেখা যায়, তাহা সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার পরিচয় হইলেও সমর্থনযোগ্য নহে। বেশভূষা প্রয়োজনীয় হইলেও তাহাকে অতিরিক্ত বাড়াইয়া তোলা, বা তাহাতে অধিক অর্থ ব্যয় করা কিছুই ভাল নহে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্যদেশের অবস্থা দেখিয়া আমাদের চৈতন্য হওয়া উচিত। তাঁহাদের মেয়েদের ঐ ব্যসনটি না থাকিলে তাঁহারা বোধ হয় আপনাদের আরো অনেক উন্নতি করিতে পারিতেন। তবে সমস্ত সমাজের গতিই মেয়েদের ঐ দিকে চালাইতেছে, সুতরাং কেবল তাঁহাদের উপরই সমস্ত দোষ দেওয়া চলে না। যাহা হউক, আমাদের যখন সে বালাই নাই, তখন অন্যের অমঙ্গল ডাকিয়া আনিয়া কাজ নাই। তা ছাড়া আমাদের অর্থ, সামর্থ্য কোন বিষয়েই তাঁহাদের সহিত তুলনা হইতে পারে না। বসন, ভূষণ ব্যতীত আর একটি জিনিষেও মেয়েদের সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া থাকে—তাহা যথোপযুক্ত কেশরচনা। ইহাতেও অনেক শিখিবার আছে।

মেয়েদের মধ্যে স্বাস্থ্য, প্রফুল্লতা, সৌন্দর্য্যচর্চ্চা ও সুবেশের যোগ হইলে তাঁহারা বাড়ী ঘরও অপরিচ্ছন্ন ও কুদৃশ্য করিয়া রাখিতে পারিবেন না; ছোট ছেলেমেয়েরাও এখনকার ন্যায় আগাছার মত অযত্নে কোন মতে বাঁচিয়া থাকিবে না, তাহাদের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, পরিচ্ছন্নতার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি না পড়িয়া যাইবে না। তাহা হইলে আমাদের নিরানন্দ সংসারের কতটা যে শ্রী ফিরিয়া যাইতে পারে, তাহা সকলে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

বঙ্গনারী

'নারীর স্থান'

কর্ত্তৃপক্ষীয় ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা ধর্ম্মের ও সমাজের সঙ্কীর্ণ আদর্শটাই নারীদের উপর খাড়া করে মানবতার দাবী থেকেও তাদের বঞ্চিত করে এনেছেন এতকাল। এই কর্ত্তৃত্ব করার ফলে বর্ত্তমানের নারীশিক্ষার আলোচনাকে এঁরা স্বেচ্ছাচারিতার ইতিহাসের চোখে সামাজিক বিপ্লবের কল্পনায় ভীত হ'য়ে উঠেছেন।

মেয়েদের এই মানবতার দাবীকে যদি এঁরা স্বাধীনতা বলেন তবে সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এই বুদ্ধিমানদের অভয়

দিয়ে বলছি স্বাধীনতার মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়। দুটো কথার দু রকম মানে বর্ত্তমান থাকতে মেয়েরা যদি সমাজের অকল্যাণ করে বসে তার মানে দাঁড়ায় স্বেচ্ছাচারিতা। কিন্তু নারী মানবতার স্বাধীনতাই চায়,—উচ্ছৃঙ্খলতা নয়।

নারী জানে সে মাতা, ভগিনী, পত্নী এবং কল্যাণময়ী মাধুরীকে বাদ দেবার অধিকার তার নেই। ভগবানের শ্রেণী বিভাগের সৃষ্টিকেও সে এক করে দিতে দাঁড়ায় নি। সে দাঁড়িয়েছে অজ্ঞ সমাজের ক্ষতে পবিত্র চন্দন প্রলেপ প্রদান করতে। সে দাঁড়িয়েছে অন্নবস্ত্র, বিবাহ সমস্যার দানবী তাড়নার সঙ্কট বুকে তুলে নিয়ে প্রতিকারের আশায়। এই অর্থসঙ্কটের সময়ে বিলাসের পুতুল হয়ে না থেকে জীবনযুদ্ধের সম্মুখে নিজেদের সত্যিকার পরিচয় নিয়ে দাঁড়াতেই সে সাময়িক আন্দোলনে বিপুল শক্তি সঞ্চার করছে। বিশ্বপরিচালন ব্যাপারে মেয়েদের স্থান আছে কি নেই তা নিয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ব্যস্ত হ'লেও সহজ অনুভবের দ্বারা নারীর কর্ত্তব্য আজ নারীরই প্রাণের মাঝে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে তটপ্লাবিনীর মতো প্লাবনের ভারে তর্কবুদ্ধির বাঁধা ধরা বেড়া ভাসিয়ে নিয়ে মহা শক্তিতে জেগে উঠেছে। এ সত্যগতিকে বাধা দেবার শত সহস্র প্রচেষ্টা ব্যর্থতারই বিপুল বোঝায় ভারী হ'য়ে চূর্ণ হয়ে পড়ে থাকবে বিশ্বজগতের দুয়ারে।

শিক্ষা সৌন্দর্য্যে নারী আপন দক্ষতায় বিশ্ববৈচিত্র্যকে সম্যক্ উপলব্ধি করে নিজের কর্ত্তব্য অনায়াসলব্ধ করে নিয়ে করুণাময়ীই হতে চায়,—বিদ্রোহী নয়। চিরকল্যাণময়ী নারীশক্তি মৌন, ধ্যানপূর্ণ, চিরন্তনী সাধনায় নিজের শিবকে জাগিয়ে জাতীয় জীবনকে সুস্থ, সবল এবং উজ্জ্বলতার, শৃঙ্খলায় পূর্ণ করতে চায়,—ভেঙ্গে দিতে নয়। এই শক্তি অর্জ্জন করতে হলেই নারীর প্রথমেই লেখাপড়া শিক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। অবিদ্যার ব্যাধি, অজ্ঞতার রক্ত সন্তানদের দেহ মনে ঘোরতর বিপর্য্যয় ঘটিয়ে যে অকল্যাণ সাধিত করছে একথা স্বীকার করবার মতো সময় এখনও যদি না আসে তবে এর পরিণতি কোথায়? শিক্ষার উদ্দেশ্য না বুঝে তর্কযুক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে পথভ্রষ্টের পথ নির্দ্ধারণ করার স্পর্দ্ধাকে ভয় করে থাকবার সময় এখন কিছুতেই নেই। নারীশিক্ষা সম্বন্ধে রাশি রাশি লেক্‌চারের মন্তব্য শুনে শুনে আর স্থির অচঞ্চল হ'য়ে বসে থাকলে চল'বে না। প্রকৃত সত্যের পথে নারী প্রতিভাকে সমুজ্জ্বল করে তুলে ধরে' প্রথমেই বিদ্যাশিক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বাংলা জুড়ে গোটা দুই কলেজ আর কয়েকটী বিদ্যালয় অত্যন্ত জলন্ত হ'য়ে শুধু শিক্ষার দৈন্যই আমাদের চোখের সাম্‌নে ফুটিয়ে তুলেছে। বিশ্বব্যাপী জাগরণের মহতী সাড়া আজ দিক্ দিগন্তে ছুটে চলেছে অসীম প্রেরণায়,—আর আমরা হতাশার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ে' মনু, যাজ্ঞবল্ক শাসিত সেই সুদূর অতীতের স্বপ্ন দেখছি। বিশেষ করে এই বাঙলা দেশের নারীদের অবস্থা ভেবে দেখলে চারিদিকের অসামঞ্জস্য এতই সহজে চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেয় যে তখন আর কাহারও আশায় স্থির হয়ে বসে থাকবার ধৈর্য্য থাকে না। ধৈর্য্যের পিছটান ও যে এখন লোহার শৃঙ্খলের মতো আমাদের গায়ে শত পাকে জড়িয়ে পড়েছে সে কথাও আমাদের সকলেরই ভেবে দেখা উচিত।

আমাদের কর্ত্তা জাতির শিক্ষা গর্ব্বিত চাল চলন, আচারে ব্যবহারে সম্পূর্ণ নবাতন্ত্রের পতিত্ব দেখে মনে শুধু অসহ্য জ্বালায় এই কথায় বারে বারে জেগে উঠে, "কি দোষে আমরা উপেক্ষিত হ'য়ে অপমানের তিলক রেখা মাথা পেতে গ্রহণ করছি?" পূর্ব্বে আমাদের কর্ত্তা ও কর্ত্রীর আশা, আকাঙ্ক্ষায়, ধর্ম্মে, আচারে এতটা বৈষম্য ছিল না তাই এমন কোন স্থায়ী ক্ষোভ বিশেষ করে নারীকেই আঘাত দিত না। শুধু অন্ন বস্ত্রের যোগান পেয়ে সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁদের প্রকৃষ্ট আনন্দের কোন মতেই আর অংশী হ'তে না পেরে তাঁদের হৃদয়াসন থেকে আমরা যে ক্রমেই দূরে নির্ব্বাসিত হচ্ছি এবং কেবল হীনতার গ্লানিই যে অর্জ্জন করছি এ কথা না মানলে সত্যকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হ'বে। অথচ নতুনের বিচিত্র প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এই অন্নবস্ত্র সমস্যা ও সনাতন

বিধি, ব্যবস্থার গুণে কেমন করে দিন দিন জটিল হ'য়ে উঠে বিশেষ করে নারীকেই অবহেলায় ও লাঞ্ছনার কি ভীষণ নির্ম্মল আঘাতেই না জর্জ্জরিত কর্‌ছে সুদিনে ও দুর্দ্দিনে তা কর্ত্তাজাতির নিকট অতি সহজ ঠেক্‌লেও নারীর মনে তার বেদনা রাঙা হ'য়ে ফুটে আছে।

কোন অজানা কবির নিভৃত বীণা সাধনায় আজ নারীর মন জেগে উঠেছে বিশ্বব্যাপী জাগরণের প্রবল আনন্দে। থেকে থেকে দাক্ষিণা হাওয়ার পুলক শিহরণে তার বহুদিনের বিস্মৃত চেতনায় চকিতে জেগে ওঠে সুদূর সাগরপারের আবেশ বিভোল প্রীত মূর্চ্ছনা। বাসন্তী সন্ধ্যায় নিবিড় আঙিনার পিকের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কোন অজানার আনন্দ বন্দনা তার প্রাণের মাঝে জেগে উঠ্‌তে চায়। বিশ্বের যা কিছু পবিত্র, মহান্, সুন্দর ভাব আজ নারীর মনে মনে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাই শুধু বাঁধা ধরা সনাতন প্রণালীর স্রোতহীন খাতের মধ্য দিয়ে একই ভাবে দিন গুলিকে চালিয়ে নেওয়ার মতো বিড়ম্বনা নারীর ভাগ্যে আর আজ কিছু নেই।

বিশ্ববরেণ্য মহাকবি, সমুজ্জ্বল নবীন চিন্তাশীল প্রতিভাশালী মহাপুরুষ পূজনীয় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁর অসীম ব্যথা কাতর হৃদয়ে নারীর দুঃখ বিশেষ করে উপলব্ধি করেছেন বলেই উপোক্ষত জাতির কল্যাণে তাঁর মঙ্গলময়ী প্রচেষ্টাকে যথাশক্তি নিয়োজিত করেছেন। ভগবানের কাছে আজ নারীদের একান্ত কামনা,—

ভগবান তাঁকে তাঁর দুর্জ্জয় শক্তিতে পূর্ণ করে তাঁর এই মহতী চেষ্টাকে জয়যুক্ত করুন।

শ্রীসোণামাথা দেবী।

নারীর তপস্যা

তপস্বিনী নারী
স্রোতস্বিনী বারি
নিয়ত ধরণী বুকে
ঢালে প্রেম-ঝারি
অমৃত সঞ্চারি।
উভয়ে সমান
সদা করে রস দান
জীবনের মূলে আর
ধরণীর প্রাণ
করি প্রাণবান।
ঢালি নিজ রস
এরা নাহি খোঁজে যশ
নারীর তপস্যা আর
বারির পরশ
নিবিড় সরস।
নারী তপঃফল
আর বারি সুশীতল
নরের শকতি আর
ধরার সম্বল,
মহান মঙ্গল।
উভয়ের পথ
সেই জলধি মহৎ
প্রেম যাহে সুনিবিড়
প্রাণ সুবৃহৎ
মুগ্ধ জগৎ।

হৈমবতী দেবী

মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ

একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা মুর্শিদাবাদ দেখিতে গিয়াছিলাম এখান হইতে প্রথমে কাটোয়া গেলাম। তাহার পরদিন বেলা ১টার সময় অমরা নবদ্বীপ দেখিবার জন্য রওনা হইলাম। সেখানে গিয়া প্রথমে গঙ্গারধারে একটু বিশ্রামের জন্য বসিলাম। সেখানে গঙ্গা খুব স্বচ্ছ নীল ও স্থির। গঙ্গার ঘাটে কেহ কেহ স্নান করিতেছে, কেহ বা ঘাট হইতে জল লইয়া যাইতেছে। নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের অনেক মূর্ত্তি দেখিলাম। সেই সকল মূর্ত্তি ও তাঁহার কুটীর, জন্মস্থান দেখিতে দেখিতে আমার মনে হইতেছিল, এই সেই স্থান যেখানে চৈতন্যদেব পাপীর দুঃখে ব্যথিত হইয়া মাতা পিতা স্ত্রী সব ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইখানে তিনি হরি ভক্তিতে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। আগে চৈতন্য দেবের টোল যেখানে ছিল সেই জায়গাটি দেখিলাম। সব মূর্ত্তি দেখিয়া 'গৌরের বাড়ী' বলিয়া একটি জায়গায় গিয়া বিশ্রামের জন্য উঠিলাম। অনেকক্ষণ সেখানে থাকিবার পর আমরা ষ্টেশনে গেলাম। ষ্টেশনটি বেশী বড় নহে, খুব নির্জ্জন এবং উচ্চতায় প্রায় রেল-লাইনের সহিত সমান তখনো ট্রেণের অনেক দেরী আছে দেখিয়া ষ্টেশনের একপ্রান্তে সতরঞ্চি পাতিয়া বসিয়া চন্দ্রালোক উপভোগ করিতে লাগিলাম। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে ট্রেণ আসিল। রাত্রি ১১টার সময় আমরা কাটোয়ায় ফিরিয়া আসিলাম।

কাটোয়া হইতে তার পর দিন বহরমপুর যাত্রা করিলাম। মুর্শিদাবাদ দেখিবার আনন্দে আমরা সকলেই খুব উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম বেলা প্রায় ৩৷৷টার সময় আমরা খাগড়া ঘাট ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। এই ষ্টেশনটিও নবদ্বীপের ষ্টেশনের ন্যায় নীচু এবং লাল কাঁকড় ছড়ানো। খাগড়াঘাট হইতে খেয়া পার হইয়া বহরমপুর যাইতে হয়। ষ্টেশন হইতে গঙ্গার ঘাট অনেক দূরে। খাগড়াঘাটে অনেক কলার ও নারিকেল গাছ আছে। সেখানে এক জায়গায় এত বেশী গাছ পালা যে স্থানে স্থানে বন হইয়া গিয়াছে দেখিতে দেখিতে আমরা গঙ্গার ঘাটে আসিয়া পড়িলাম। ঘাটে আগে হইতেই নৌকা প্রস্তুত ছিল আমরা সেই নৌকায় চড়িয়া বহরমপুর চলিলাম। এখানেও গঙ্গা খুব পরিষ্কার নীল এবং স্থির। আমরা যখন নৌকায় উঠিলাম তখন সূর্য্যের তেজ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। গঙ্গার ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগিয়া খুব আরামও হইতেছিল। সেই সময় অনেক নৌকা যাওয়া আসা করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে আমরা আমাদের বন্ধুর নির্দ্দেশ মত একটি বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম।

পরদিন বেলা ৭টার সময় আমরা মুর্শিদাবাদ দেখিবার জন্য রওনা হইলাম। পথে রাজা নন্দকুমারের বাড়ী দেখিতে গেলাম। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্এর শাসনকালে যে সময় ইংরাজরা বাংলা দেশের বস্ত্র শিল্প নষ্ট করিয়া দিবার জন্য এদেশের তাঁতিদের বুড়ো আঙ্গুল কাটিয়া দিতেছিল সেই সময় তিনি প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বস্ত্র শিল্প রক্ষা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার হস্তলিপি দেখিলাম। রাজা নন্দকুমারের বাড়ীতে হাতের আঁকা চৈতন্য দেবের একটি ছবি দেখিলাম। শুনিলাম সে ছবি নাকি আর কোথাও নাই। তারপর আবার আমরা মুর্শিদাবাদের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। বহরমপুর হইতে মুর্শিদাবাদ অনেকটা দূর। মুর্শিদাবাদ পৌছিয়াই কাট্রা মসজিদ দেখিতে গেলাম। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হওয়ায় মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী মনে করিয়া একটি মসজিদ্ ও আপনার সমাধি স্থান নির্ম্মান করেন। তিনি খুব ভাল নবাব ছিলেন। ১১৩৯ সালে তাঁহার প্রিয়তম দৌহিত্র সরফরজখাঁ, কন্যা নিয়তন্নেসা ও একমাত্র পত্নী নসেরুবানের নিকটে মুর্শিদাবাদের স্থাপয়িতা নবাব মুর্শিদ

কুলিখাঁ মারা যান। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে কাট্‌রা মস্‌জিদের সোপানাবলীর নীচে তাঁহাকে সমাহিত করা হয় সাধুগণের পদধুলি তাঁহার মাথার উপর সঞ্চিত থাকিবে বলিয়া তিনি তথায় সমাহিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আজও কাট্‌রা মস্‌জিদের সোপানাবলীর নীচে মুর্শিদকুলি খাঁর সমাধি বর্ত্তমান আছে।

আমরা কাট্‌রা মস্‌জিদ দেখিয়া তোপ দেখিতে গেলাম। এই তোপটির নাম 'জাহানকোষা' অথবা জগজ্জয়ী তোপ। যে জায়গাটিতে তোপটি অবস্থিত রহিয়াছে সেইখানে আগে নাকি নবাব মুর্শিদ কুলিখাঁর তোপখানা ছিল। সেই হইতে এখনও সেই জায়গাটির নাম রহিয়াছে তোপখানা। জাহান-কোষা তোপটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২হাত ও বেড় ৩হাতের অধিক হইবে। ইহার মুখের বেড়টি প্রায় ১হাত। তোপটি মাটিতে পড়িয়াছিল। পরে তাহার পাশে একটি অশ্বত্থ গাছ জন্মিয়া তাহাকে আশ্চর্য্যরূপে তুলিয়া লইয়াছে। গাছ কাটিলেও বোধ হয় তোপটিকে বাহির করা যায় না। সেখানকার লোকেরা তোপটিকে পূজা করে।

সেখান হইতে আমরা "কাঠগোলা" নামক স্থানে জৈন-দের মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। একজন বড়লোক জৈন ২২লক্ষ টাকা খরচ করিয়া একটি বাড়ী ও মন্দির করিয়া-ছিলেন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে 'পরেশনাথ' বিগ্রহ আছেন। বিগ্রহটি স্ফটিক দিয়া তৈয়ারী। সেখানে আরও দুইটি বিগ্রহ আছে 'সুবুদ্ধিনাথ ও আদীশ্বর। ইঁহাদের কপালে হীরা বসান। মন্দিরে তিনটি দরজা আছে একটি রূপার, একটি পিতলের ও অপরটি কালো পাথরের। তখন বেলা প্রায় দেড়টা। তখন আমাদের এমন অবস্থা হইয়াছিল যে তখন আর বিশেষ কিছু দেখিবার ইচ্ছা রহিল না। আমরা বহরমপুরে যাহাদের বাড়ী উঠিয়াছিলাম মুর্শিদাবাদেও তাহাদের বাড়ী ছিল আমরা সেইখানেই গেলাম।

আহারাদির কিছুক্ষণ পরে আমরা এইবার নবাবের প্রাসাদ দেখিতে গেলাম। সেখানকার নিয়ম ৩টার মধ্যে ঢুকিতে হইবে ও ৬৷৷ মধ্যে বাহির হইতে হইবে। সেইজন্য আমরা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম। যতটা অবধি রাজপ্রাসাদের সীমানা ততটা প্রাচীর দিয়া ঘেরা। নবাব বাড়ীর সমস্ত সম্মুখটি সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত, পাশ দিয়া লাল রঙের রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। সেই রাস্তা দিয়া নবাবের লোকজন গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি চলে। নূতন প্রাসাদটি ইংরাজি ধরণে তৈয়ারী! তাহা সমস্ত ইংরাজি জিনিষ পত্রের দ্বারা সজ্জিত সেখানে বেশী সময় না কাটাইয়া আমরা পুরাতন প্রাসাদ দেখিতে গেলাম। এই প্রাসাদটি ভারতীয় ধরণে তৈয়ারী। পুরাতন প্রাসাদের সম্মুখ খুব চমৎকার করিয়া সাজান। একপাশ দিয়া নকল পাহাড় এবং তাহার গা বাহিয়া একটি ঝরণার মত চলিয়া গিয়াছে। তাহার সম্মুখটি নানা রকম ফুল ও পাতাবাহারের গাছ দিয়া ঘেরা প্রাসাদের ঠিক সম্মুখে একটি বাগান বসান ও পাশে একটি মসজিদ আছে। আমরা প্রাসাদে ঢুকিলাম। সেখানে দেখিলাম আগেকার নবাবের শীকার করা একটা বাঘ একটা কুমীর ও একটা কচ্ছপের খোলা রহিয়াছে। প্রাসাদে অনেক তৈলচিত্র, এক একটি ছবি এত বড় যে প্রায় প্রাসাদের একটি করিয়া দেওয়াল জুড়িয়া আছে। ভূতপূর্ব্ব নবাব যেখানে বসিয়া দরবার করিতেন সেই দরবার গৃহে একটি মখমলের সিংহাসন রহিয়াছে সেই সিংহাসনটি নাকি নূতন তৈয়ার করানো হইয়াছিল। নবাব একদিনও তাহাতে বসেন নাই।

সেই ঘরে একটা প্রকাণ্ড সোনা বাঁধান ঝাড় লণ্ঠন আছে। সিংহাসনের পাশেই চমৎকার কারুকার্য্য করা চৌকির মত আসন দেখিলাম। সেটিকি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। সে দিন শুক্রবার ছিল বলিয়া আমাদের অস্ত্রাগার ও পুস্তকাগার দেখা হইল না। শুনিলাম সেখানে সোনার অক্ষরে লেখা একখানি কোরাণ আছে। আমরা অনেকটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পরিয়াছিলাম, শীঘ্রই বাড়ী ফিরিলাম।

বাড়ী ফিরিয়া আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিবার পর আমরা সিরাজদৌল্লার সমাধিস্থান দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। আমাদের অর্দ্ধেক দল বহরমপুরে ফিরিয়া গেলেন ও অর্দ্ধেক

দল সমাধিস্থান দেখিতে গেলাম। গঙ্গা পার হইয়া সেই স্থানে যাইতে হয়। সেখানে গঙ্গা এতই চওড়া এবং এমনি গভীর যে আমরা হাঁটিয়াই পার হইলাম। আমরা যখন সমাধি স্থান দেখিতে যাত্রা করিলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। চতুর্দ্দিশীর চন্দ্র উদয় হইয়াছে। আমরা গঙ্গার অনেকটা বালুচর ভাঙ্গিয়া আল পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। আলপথের দুই দিকে বড় বড় ঘাস জন্মাইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে আমরা একটা চওড়া রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। সেই রাস্তা ধরিয়া আমরা একেবারে সমাধি স্থানে আসিয়া পৌছিলাম। সেখানে দুই চারি জন মালী রহিয়াছে। জায়গাটি বেশ বাগান দিয়া সাজান। সমাধি স্থানে তিনটি মহল। প্রথমটিতে অন্যান্য কয়েকজন ব্যক্তির সমাধি রহিয়াছে, দ্বিতীয় মহলে সিরাজদৌল্লা আলিবর্দ্দি খাঁ ও সিরাজের স্ত্রী লুৎফুন্নিসার সামাধি রহিয়াছে সিরাজদৌল্লা আলিবর্দ্দি খাঁর অতি প্রিয় দৌহিত্র ছিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁর পাশে সিরাজদৌল্লা ও তাঁহার পাশে লুৎফুন্নিসার সমাধি। সিরাজদৌল্লা যখন মারা যান তখন তাঁহার স্ত্রীর মাত্র ষোল সতের বৎসর বয়স ছিল। তিনি খুব সাধ্বী স্ত্রী ছিলেন। যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন তিনি সেই সমাধি স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তিনি রোজ সিরাজের কবর ফুল দিয়া সাজাইয়া রাখিতেন,—রোজ সন্ধ্যা বেলায় দীপ জ্বালাইয়া দিতেন। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে সিরাজদৌল্লার পাশে তাহাকে সমাহিত করা হয়।

শ্রীস্বর্ণরেখা দেবী

চিংড়ী মাছের নবান্ন

[সন্ধ্যাবেলায় দিদিমাকে গিয়ে ধরে পড়া গেল, একটা গল্প বলতেই হবে। অতি কষ্টে তাঁর নামজপ শেষ করা অবধি অপেক্ষা করে রইলুম পূজো শেষ হতেই আমরা তাঁকে ঘিরে বসলাম দিদিমা গল্প আরম্ভ করলেন—]

এক চিংড়ী মাছ পদ্মপাতার ওপর বসে নবান্ন করছিল। এমন সময় একটা কাক এসে বল্‌লে ওলো তোকে খাই ওলো তোকে খাই। তাই শুনে চিংড়ীর ভয়ানক রাগ হল। সে তখনি রুইমাছের কাছে গিয়ে বল্‌লে

রুইদাদা, রুইদাদা ঘরে ?

রুইমাছ বললে এত রাত্তিরে কে ডাকাডাকি করে ?

চিংড়ী বল্‌লে—আমি ইচলে রাণী।

রুই বল্‌লে—দাও বোনকে পিঁড়ে পানি।

চিংড়ী বল্‌লে—তোমার পিঁড়ে পানিতে আগুন লাগুক আমি এক কার্য্যে এসেচি।

রুই বল্‌লে—কি কার্য্য বোনটি ?

চিংড়ী বল্‌লে—আমি পদ্মপাতায় বসে নবান্ন করছিলাম আর একটা কাক এসে বল্‌লে ওলো তোকে খাই, ওলো তোকে খাই ? খেতো তো ভাল হত লো বল্‌লে কেন ?

রুই বল্‌লে—লো বলেচে ? তার তো ভারি বাড় হয়েচে ? আচ্ছা, তাকে টের পাওয়াচ্চি। কিন্তু কি জান বোন আমার আজ অনেক কাজ আছে। তুমি ইলিস দাদার কাছে যাও।

চিংড়ী ইলিস দাদার ঘরে গিয়ে বল্‌লে—

ইলিসদাদা; ইলিসদাদা ঘরে ?

ইলিস ভেতর থেকে বল্‌লে

এত রাত্তিরে কে ডাকাডাকি করে ?

না—আমি ইচ্‌লে রাণী

দাও বোনকে পিঁড়ে পানি।

তোমার পিঁড়ে পানিতে আগুন লাগুক, আমি এক কার্য্যে এসেচি।

কি কার্য্যে বোনটি ?

না আমি পদ্মপাতায় বসে নবান্ন করছিলাম, এমন সময় একটা কাক এসে বলে কিনা—ওলো তোকে খাই? ওলো তোকে খাই? খেতো তো ভাল হতো লো বল্‌লে কেন?

ইলিস বল্‌লে—লো বলেচে? তার তো ভারি বাড় হয়েচে? আচ্ছা তাকে টের পাওয়াচ্চি। কিন্তু কি জান বোন আজ আমার ভারি কাজ পড়েচে। তুমি কাত্‌লা দাদার কাছে যাও।

চিংড়ী কাত্‌লা দাদার কাছে গিয়ে বল্‌লে—

কাত্‌লা দাদা, কাত্‌লা দাদা ঘরে?

এত রাত্রিরে কে ডাকাডাকি করে?

না আমি ইচ্‌লে রাণী।

দাও বোনকে পিঁড়ে পানি।

তোমার পিঁড়েপানিতে আগুন লাগুক আমি এক কার্য্যে এসেচি।

কি কার্য্যে বোন্‌টি?

না আমি পদ্মপাতায় বসে নবান্ন করছিলাম, আর একটা কাক এসে বল্‌লে—ওলো তোকে খাই? ওলো তোকে খাই? খেতো তো ভাল হত লো বল্‌লে কেন?

কাত্‌লা বল্‌লে—লো বল্‌চে? তার তো ভারি বাড় হয়েচে? আচ্ছা তাকে টের পাওয়াচ্চি। কিন্তু কি জান বোন আমরা জলে থাকি ডাঙার জীবের সঙ্গে পারবো কেন? তুমি কাঁকড়াদাদার কাছে যাও।

কাঁকড়া নদীর পাড়ে মাটির গর্ত্তে থাকে। চিংড়ী তার কাছে গিয়ে বল্‌লে কাঁকড়াদাদা কাঁকড়াদাদা ঘরে?

এত রাত্রিরে কে ডাকাডাকি করে?

না আমি ইচ্‌লে রাণী।

দাও বোন্‌কে পিঁড়ে পানি

তোমার পিঁড়েপানিতে আগুন লাগুক এক কার্য্যে এসেচি।

কি কার্য্যে বোনটি?

না—আমি পদ্মপাতে বসে নবান্ন করছিলাম, আর তোকে খাই? খেতো তো ভাল হতো লো বল্‌লে কেন?

কঁকেড়া বল্‌লে—লো বলেচে? তার তো ভারি বাড় হয়েচে? আচ্ছা তাকে টের পাওয়াচ্চি। তুমি এক কাজ কর এক পয়সার মুড়ি মুড়কি এনে আমার গর্ত্তের চারপাশে ছড়িয়ে দাও তো।

চিংড়ী মুড়িমুড়কী এনে কাঁকড়ার গর্ত্তের চারিপাশে ছড়িয়ে দিলে। এখন হয়েচে কি—কাক আপনার সেই মুড়িমুড়কি খেতে এসেচে খেতে খেতে যেমন কাঁকড়ার গর্ত্তে তার পা পড়েচে অমনি কাঁকড়া দাঁড়া দিয়ে তার পা জোরে টিপে ধরেচে। তাই দেখে ইচলে রাণীর খুব আনন্দ—সে নাচচে আর বল্‌চে—

টেপদাদা কাঁকড়াদাদা, টেপদাদা
সকল দাদাই হারল, কাঁকড়াদাদা পারল

টেপদাদা—

কাক প্রথমে ভারি ভয় পেয়েছিল। শেষে তাকিয়ে দেখে একটা কাঁকড়া তার পা চেপে ধরেচে। এখন কাকেরা কাঁকড়া খেতে খুব ভাল বাসে। সে এক ঠোকরে কাঁকড়াকে মেরে তাকে মুখে করে নিয়ে উড়ে গেল।

আর চিংড়ীমাছ মনের দুঃখে জলে চলে গেল।

[আমরা এতক্ষণ গল্পটা বেশ মন দিয়ে শুনছিলাম। হতভাগা কাকের স্ত্রীলোককে অপমান করা, চিংড়ীকুমারীর এতটা আত্মসম্মানজ্ঞান, তার ভাই কাৎলা, রুই ইলিশ ইত্যাদির কাপুরুষতা, কাঁকড়া দাদার বীরত্ব, আর শেষকালে কাকের দুর্দশার কথা শুনতে শুনতে আমাদের শিশুচিত্ত বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠতো। কিন্তু হঠাৎ দিদিমার শেষের দুই একটি কথায় গল্পটার এত পরিবর্ত্তন হয়ে যেত—যে কোথায়ই বা থাকতো তার উচ্চ নৈতিক আদর্শ ও শ্রোত-বর্গের অদম্য উৎসাহ আর আশা ভরসা মনটা ভারি খারাপ হয়ে যেত। সেই থেকেই কেন জানি না এই পক্ষীটির ওপর আমাদের মন অত্যন্ত বিরূপ হয়ে গেল। মনে আছে

অভ্যর্থনার আয়োজন করতাম তাতে সে বেচারী পালিয়ে গিয়ে মনে মনে হাঁপ ছেড়ে নিশ্চয়ই ভাবতো এ যাত্রায় তার ভাগ্যটা নেহাৎ সুপ্রসন্ন, আর আমরা যে কি ভাবতাম তা আর না বলাই ভাল।]

আলোর রূপকথা

মনে হয় সৃজনের আদিম প্রভাতে, তরুণী বসুন্ধরা অনন্তের প্রাঙ্গণে স্বয়ম্বরা হবার জন্যে এসেছিলেন, অসীম আকাশ উদ্দাম সমুদ্র, চির চঞ্চল সমীরণ আর নির্ম্মল আলোক, তাঁর পাণি প্রার্থী হয়ে, বরসাজে, তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। বসুন্ধরা সবাইকে এক ২ বার ভাল করে দেখলেন, আকাশ প্রশস্ত উদাস, সমুদ্র অন্তহীন আবেগে উন্মত্ত—প্রায়, বাতাস নিরন্তর আশার উল্লাসে অধীর, আলোকেই জলে স্থলে, বিশ্বচরাচরে নির্ম্মল হাস্যে প্রকাশিত, নিঃস্বার্থ আনন্দে পরিব্যাপ্ত; তিনি তারই গলায় বরমাল্য দিলেন। সেই দিন হতে আকাশ বৈরাগ্য বিমুখ হয়ে বহুদূরে চলে গেল, সমুদ্র আরো অধীর প্রমত্ত, পৃথিবীর সন্তানদের প্রতি হিংসা পরায়ণ হয়ে উঠ্‌ল, তাদের গ্রাস করা, বিনাশ করাই তার কাজ, সমীরণ অবিরাম বিলাপ-রত। আলোক শুধু সুন্দরতর, উজ্জ্বলতর। আকাশ উজ্জ্বল করে, ধরণীকে পত্র পুষ্প ধান্য শস্য শোভায় মণ্ডিত করে, পৃথিবীর অন্তরতম অন্ধকার প্রদেশে, খনিতে মণি সঞ্চয় করে', তাঁর বসুন্ধরা নাম সার্থক করেছেন।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

বিদায়

শেষের যে সব শেষ কথা, বিদায়, বিদায়!
শেওলায় ছেয়ে পড়া পাচীরের গায়
সকল পাপড়ি ঝরা ফুলটি সে হায়,
পরবাসী বিহগের নীরব কুলায়, চারিদিক খানি;
জোয়ারের শেষে যেন কিণারার বালি!
শেষের যে সব শেষ কথা, বিদায়, বিদায়!
গোধূলির ধূলিমাখা প্রান্তর সীমায়
সাঁঝের আরতি আঁকা স্তব্ধ নীলিমায়
একা, ঘরে ফিরে আসা পাখীর গলায়
একখানি গান,
যখন সাগর পারে, যায় দিনমান!
শেষের যে সব শেষ কথা বিদায়, বিদায়!
নিভেছে তারার ভাতি জোছনা মিলায়,
গেল যে আঁধার রাতি, সাথী সে কোথায়?

তারকা নিমেষ মেলি নীরব কথায়
বলে চাহনিতে,
উষার স্বাগত হাসি পড়িল না চিতে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

শ্রেয়সী পত্রিকার নিয়মাবলী

১। শ্রেয়সীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা।

বৈশাখ মাস হইতে পর বৎসরের চৈত্র পর্য্যন্ত শ্রেয়সীর বৎসর গণনা করা হয়। যিনি যে বৎসরের গ্রাহক হইবেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে পত্রিকা দেওয়া হইবে।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে শ্রেয়সী প্রকাশিত হয়। কোন গ্রাহক সময় মত না পাইলে ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৩। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পত্রিকা প্রকাশের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমাদিগকে জানাইবেন নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী থাকিব না।

৪। শান্তিনিকেতনবাসীদের জন্য শ্রেয়সীর বার্ষিক মূল্য ১৷০ টাকা।

৫। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থাদি ও চিঠি পত্র পাঠাইবেন।

৬। ডাকমাশুল সমেত চিঠি না দিলে কাহারও চিঠির জবাব দেওয়া হয় না।

বীরভূম
শান্তিনিকেতন পোঃ

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীপ্রতিমাদেবী,
শ্রীরমাদেবী।

১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩২৯

মাসিক পত্র

সম্পাদিকা—শ্রীকিরণবালা সেন

মূল্য, বার্ষিক সডাক ২৲ টাকা।

শ্রেয়সী

মাসিক পত্র

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুর্ভবতি।
হীয়তেঽর্থাৎ য উ প্রেয়োবৃণীতে॥"

"শ্রেয়ঃ প্রেয় সবাইকে পায়।
দেখে' বেছে' ল্যায়, যে যেটা চায়॥
যে ল্যায় শ্রেয়—সে পায় কূল।
যে ল্যায় প্রেয়—খোয়ায় মূল॥"

কঠোপনিষদ্।
১ম অধ্যায়, ২য় বল্লী।

১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা | অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ সাল

চিঠি

কল্যানীয়াসু

আমি যে দৃষ্টি থেকে আমাদের সমস্ত ক্ষতি লাভ গণনা করতে চাচ্ছি সেটাকে আমার নিজের একটা বিশেষ নতুন জিনিষ বলে ধরে নিয়োনা। আমার নিজের বিশেষ দিকটাতে আমি খুবই ছোট সেখানে আমি বিষয়ী, সেখানে আমি হিসাবী, সেখানে আমি দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র এবং বিরাহিমপুরের জমীদার, সেখানে কোনো লোক্‌সানই আমার সহ্য হয় না। কিন্তু সেইখানেই আমি বাঁধা পড়ে থাকতে পারব না এবং কাউকে বাঁধা পড়ে থাক্‌তে বলব না। আমার সেই নিজের অন্দরের খিড়কির দরজায় বসে আমার ব্যবসায় চল্‌বে না, আমাকে সদর রাস্তায় বেরিয়ে আস্‌তে হবে। এই রাস্তাই সব চেয়ে পুরাতন এবং প্রশস্ত, এই রাস্তাই সকলের রাস্তা। যদি বল এ রাস্তায় ঠক্‌তে হবে সে আমি জানি। ঠকবার জন্যেই কোমর বেঁধে বেরতে হবে। এ রাস্তায় যাঁরা সম্পূর্ণ ঠকেছেন তাঁরাই সম্পূর্ণ জিতেছেন।

আমি তাঁদের দলের লোক নই, কিন্তু তবু বার বার মন বলে যে তাঁদেরই পদচিহ্ন ধরে চলতে হবে। এই বড় রাস্তাতেই তাঁদের পদচিহ্ন আছে, আমার খিড়কীর রাস্তায় নেই। কাযেই আমার সেরেস্তার খাতা খুলে এই বয়সে কেবল আমার জমা খরচের হিসাব মিলিয়ে চলতে পারব না। এরকম চলা পরিহার করাকে পাকা চালে চলা বলে না সে আমি কি জানিনে?

*　　*　　*　　*

কিন্তু তবু আমি তার দিকে ওকালতি করতে পারিনে।

আমাকে কাঁচতে হবে, আমাকে বোকা হতে হবে, বিবেচক লোকদের কাছে আমাকে উপহাস্য হতে হবে নইলে আমার পরিত্রাণ নেই। একদিনে হয়ে উঠবে না—বোধ হচ্চে শিশুর মত একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে টলতে টলতে চলা আরম্ভ করতে হবে, কিন্তু তবু সেই মাথা তুলে চলাই অভ্যাস করব, চিরদিনই ধুলোর দিকে মুখ করে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াতে পারব না। দাঁড়িয়ে চলবার চেষ্টায় বিপদ আছে, হয়তো পড়তে হবে, এবং পড়লেই মানুষ হাঁসে বলে "কেমন আমি আগেই বলিনি যার যেদিকে সামর্থ্য নেই তার সেদিকে বড়াই করতে যাবার দরকার কি?" সত্যি কথা।

কিন্তু তবুও শিশু চিরকালই নিরাপদে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াবে একথা বলা শোভা পায় না। বারবার পড়বার ভয় শিরোধার্য্য করে নিয়েই তাকে মাটির উপরেই ষোল আনা নির্ভর ত্যাগ করে আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হবে। সেই দিকেই তাকে উৎসাহ দাও, সাহায্য কর; তাকে নিরাপদের উপদেশ দিয়ো না, তাকে নির্ভরসার কথা বলো না। যেটা সব চেয়ে বড় পন্থা সেইটেই সব চেয়ে দুর্গম এই জন্যে ভরসা যদি দিতে হয় উৎসাহী যদি করতে হয় তবে সেই দিকেই করতে হবে। সুবিধা সুযোগের দিকে করবার কোনো দরকারই নেই। কেননা সে যে মাটির মত আপনিই নীচের দিকে টান্‌চে কারো ঘাড়ে ধরে সেদিকে চেপে রাখবার কোন প্রয়োজনই হয় না। এই কথা মনে নিশ্চয় জানতে হবে যে বড় পথে চলবার নিষ্ফলতারও মূল্য আছে। সেই নিষ্ফলতার বেদনা ও বিদ্রূপকে ভয় করাই হচ্চে তপোভঙ্গের প্রধান হেতু। এই রাস্তায় নিষ্ফলতার মূল্য এবং ঠকে যাবার পুরস্কার স্বয়ং অন্তর্যামীর কাছে থেকেই পাওয়া যায় মানুষ এখানে মাপ করে না, উপহাস করে এবং বলে বড় রাস্তায় চলবার ভড়ং করা ও একটা বড়াই মাত্র এবং হাতে হাতে তার পরিচয় পাওয়া গেল। মানুষ যেখানে অকৃতকার্য্য সাধারণ মানুষ সেই খান থেকেই তার বিচার করে আর মানুষ যেখানে কৃতার্থ ঈশ্বর সেইখানেই তাকে দেখেন। আমরা কথায় কথায় বলে থাকি অমুক লোকটা আইডিয়া নিয়ে বড় বড় কথা বলে কিন্তু ব্যবহারে তার পরিচয় পাইনে। কিন্তু মানুষ যেখানে সত্য সেখানে দৃষ্টি দেবার ক্ষমতা কি আমাদের আছে? বীজের মধ্যে যেখানে অরণ্য কাজ করচে সেখানকার খবর কি আমরা পাই?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অজানা দেশ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ছানাটির কাতর অনুনয় শেষ হলে পর তার মা বল্লো "বাছা তবে শোন আমি তোমাদের আরেকটি গান গেয়ে শোনাই।" এই বলে টুনটুনী তার গানের সুর বদলে তার যৌবন-সুখ-পূর্ণ দিনগুলির কথা ছন্দে গেঁথে গেয়ে গেলো। যখন এই নদীর বালুচরে বাবলা গাছের ঝোপটি তার জানা ছিল না তখনকার দিনগুলিও যে তার এমনি আনন্দেই কাটতো; তারপর একদিন তার সব আনন্দকে ডুবিয়ে দিয়ে এক বাণী তার হৃদয়ে জেগে উঠলো; বাণী তাকে ডেকে বল্‌লো "এখানেই তো তোমার ক্লান্তির অবসান হবে না, আনন্দের পূর্ণতা পাবে না, হৃদয়ের বিরাম তোমার এখানে নেই।" সে বাণী যে তার কাছে কি এক আশ্চর্য্য অভাবনীয় বাণী বলে বোধ হলো, টুনটুনির মনে হচ্ছে আজও স্পষ্ট সে বাণী তার কাণে বাজচে। সে বাণী ভুলে থাকবার চেষ্টায় রাত দিন সে গান গেয়ে বেড়ালেও এখানে যে তার হৃদয়ের পূর্ণতা প্রাণের আরাম পাবে না, সে কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারলো না। তারপর একদিন সন্ধ্যা যখন তার স্নিগ্ধ চরণে

তাদের নীড়ের উপর ছায়া কোলে এসে দাঁড়ালো তখন সে সঙ্গীটিকে সে এই জীবনের সর্ব্বস্ব বলে জানতো, তার সেই সঙ্গীটির হৃদয়েও তারই মতন এক বাণী জেগে উঠলো। সে বাণী তাকে ডেকে বল্লো "এখানে শান্তি নেই, শান্তি নেই।" তখন তারা যাত্রা করলো সেই দেশের উদ্দেশ্যে যেখানে তারা শান্তি পাবে, আনন্দের পূর্ণতা পাবে। যাত্রা করে নদীর এই ধারটিতে বাবলা গাছের ঝোপে এসে বাসা বাঁধলে। কিন্তু কি সুখেই তারা সেখানে ছিল।

তার মায়ের কথা শুনে ছানাটি বল্লো "মাগো যে দেশ থেকে যাত্রা করে তোমরা চলে এসেছো, সে দেশ এখান থেকে কতদূর? কাছাকাছি যদি কোথাও হয় তো চলনা আমরা গিয়ে একবার সে দেশ দেখে আসি?" টুনটুনী বল্লো "বাছা, সে যে এক অজানা দেশ; সে যে অ-নে-ক দূরে জানি; কিন্তু কোথায় কোন দেশে সে দেশটিকে খুঁজে পাওয়া হবে তাতো জানি না বাছা। শুধু এইটুকু জানি যে, যে বাণী বহু বৎসর আগে সে দেশ থেকে আমায় এই নদীর ধারে টেনে এনেছিলো, সেই বাণী আবার আমার হৃদয়ে জেগে উঠেছে। তখন সেই বাণী শুনে কত আশা বুকে বেঁধে এই নদীর ধারটিতে চলে এসেছিলাম, এখন তো সেই বাণীকে অগ্রাহ্য করতে পারবো না। এস বাছা আবার আমরা বুকে আশা বেঁধে, বিশ্বাস পূর্ণ হৃদয়ে আনন্দের সঙ্গে অজানা দেশের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়ি।" টুনটুনীর কথা শেষ হলে তার ছোট ছানাটি বল্লো "তুমি তো আমার সঙ্গে থাকবে মাগো? তাহলে তুমি যেখানে যাবে আমি সেইখানেই উড়ে যেতে রাজী আছি। এই বলে টুনটুনীর ছানা তার মায়ের সঙ্গে অজানা দেশের গান গাইতে গাইতে মায়ের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো।

গ্রীষ্মের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কাল বৈশাখীর রুদ্র মূর্ত্তি মাঝে মাঝে এসে যখন সন্ধ্যাকাশে ভৈরবের তালে নাচিয়ে দিয়ে যেতো, তখনকার তেমনি এক সন্ধ্যায় আকাশের গায়ে কালো ঘন মেঘের দিকে চেয়ে টুনটুনীর ছানাদের মন ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়লো। বৃষ্টির জল এসে তাদের নীড়টীকে ভিজিয়ে তুল্লে; মাঘ মাসের এক পশলা বৃষ্টির পর মধ্যাহ্ন সূর্য্য এসে যখন তাদের নীড়টীকে আবার বেশ উত্তপ্ত করে তুলতো সন্ধ্যা বেলাকার অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শেষে সে সুখটুকুও উপভোগ করা হবে না মনে করতেই ছানাদের মন ভাবনায় ভরে উঠলো। তাদের মধ্যে একজন বলে উঠলো "কেন আকাশে এত কালো মেঘ হয়েছে? কেন নদীটার উপর এমন নিবিড় কালো ছায়া পড়েছে; মাগো সূর্য্যের মুখ কি আর আমরা কখনও দেখতে পাবো না?" ছানাটীর কথা শুনে টুনটুনী বল্লে "বাছা, দুঃখ করোনা সূর্য্য কাল আবার নিশ্চয়ই আকাশের গায়ে দেখা দেবে। কিন্তু দিনগুলো যে ক্রমে ক্রমে ছোট হয়ে আসছে তাই আজকের এই মেঘ কাটিয়ে সূর্য্য তো আর দেখা দেবে না। যাক তার জন্যে দুঃখ করে আর কি হবে? বাছা তোমাদের জন্যে তো আর সূর্য্য বছরের বারটী মাসই আকাশের গায়ে কিরণ ছড়াতে পারে না। বৃষ্টির জল আমাদের নীড়ের মধ্যে বেশী প্রবেশ করতে পারে নি। যাও বাছা তোমরা সব নীড়ের মধ্যে ঢুকে নিজের নিজের শরীর গরম করে নাও গিয়ে। আমি ততক্ষণ তোমাদের অজানা দেশের যাত্রার গানটা গেয়ে শোনাই।" টুনটুনির কথা শুনে তার ছোট ছানাটী বল্লো "মাগো এতদিন আমি ভাবতাম সূর্য্য যেন চিরকালই সমান ভাবে আমাদের এই নীড়টীর উপর কিরণ ছড়াবে। কিন্তু আজকাল মেঘের দিকে চেয়ে আর নদীর গায়ে কালো ছায়া দেখে সে ভুল আমার ভেঙ্গে গেছে। সূর্য্য যখন কালো মেঘের আড়ালে মুখ লুকালো আমায় কি ২ [illegible] নি না মাগো সেই অজানা দেশের কথা মনে জেগে উঠলো।" ছানাটীর কথা শুনে টুনটুনীর মনে ভারী আনন্দ হলো। সে তার সঙ্গীটীকে নিয়ে ছানাদের সঙ্গে বসে বসে সেই অজানা দেশের গান গাইতে লাগল। সবাই গান ধরলে কিন্তু একটি ছানার মনে অজানা দেশ সম্বন্ধে তখনও যথেষ্ট সন্দেহ থাকাতে সে চুপটি করে এক কোনে বসে রইলো। তারপর গান গাইতে গাইতে সবাই যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লো তখন সে তার ছোট ছোট ভাই বোন গুলিকে ডেকে বল্লো "তোমরা তো সব বেশ অজানা দেশের

গান গাইছো, শুনতেও বেশ লাগছে। কিন্তু ভেবে দেখো তো, আমরা যদি জানতাম যে সত্যি অজানা দেশ বলে একটী দেশ আছে আর সে দেশটী এমনি এক নদীর ধারে গাছের ছায়ায় পূর্ণ একটী সুন্দর দেশ, তা হলে গানটী গাইবার সময় মনে আরও বেশী আনন্দ পেতাম না কি ?"

"আমরা যদি অজানা দেশের বিষয় সবই জানতাম তা'হলে হয় তো আমাদের জন্মে অবধি সেই দেশে যাবার জন্যেই মন কেমন করতো ; এই নদীর ধারে একদিনের তরেও আর ভাল লাগতো না।" এই বলে ছোট ছানাটী তার বড় ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো।

বড় ছানাটী বল্লো "কিন্তু আমরা যে একেবারে কিছুই জানি না ; অজানা দেশ বলে কোন দেশ আছে কি নেই তাও আমাদের জানা নেই।" তার ছোট বোনটী বলে উঠলো "আমার কিন্তু মনে হয় সেরকম একটী দেশ কোথাও না কোথাও আছে। কারণ আমিও যে আমাদের মায়ের মতন হৃদয়ে একটি বাণী অনুভব করেছি। তোমার মনে কি সে বাণী পৌঁছায় নি ?"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমালতী সেন

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

রবীন্দ্রনাথ শিশুকাল হইতে সাহিত্য আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত তাঁহার গদ্য ও পদ্য উভয়প্রকার রচনাই প্রকাশিত হইয়াছে রচনা হিসাবে তাহা ভাল কি মন্দ তাহার সমালোচনা করিবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু রচনার মধ্যে শুধু ভাল লাগা ছাড়া আরও এমন জিনিষ অনেক আছে যাহাতে করিয়া রচয়িতার পরিচয় আমাদের নিকট ঘনিষ্টতর হইয়া উঠে। বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ধারণা সকল সাহিত্যেই নিহিত আছে, তাহা আমাদিগের আলোচ্য।

রবীন্দ্রসাহিত্যে নারী কিরকম স্থান পাইয়াছে এইখানে তাহাই দেখাইবার ইচ্ছা আছে। তাঁহারই রচনার মধ্যে মধ্যে যে যে স্থানে তিনি নারী সম্বন্ধে কোন ও বিশেষ মত প্রকাশ করিয়াছেন সেই লাইন গুলি উদ্ধৃত করিয়াছি। ঠিক ধারাবাহিক তারিখ মিলাইয়া দেখিলে তাঁহার 'আইডিয়া'র একটি অবিচ্ছিন্ন মিল আছে কিনা দেখিবার সুবিধা হয়, কিন্তু তাঁহার অনেক শৈশব রচনা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই, এবং অনেক রচনায় তারিখ দেওয়াও নাই এক্ষেত্রে একটা মোটামুটি কাজ আরম্ভ করার চেষ্টা করিতেছি ভবিষ্যতে ইহাকে সুসম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা রহিল। নিম্নের অধিকাংশ অংশগুলি শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

এজগৎ কঠিন—কঠিন
কঠিন শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া
সেইখানে তুই আয় মা ফিরে আয়
এত ডাকে দিবিনে কি সাড়া ?

কড়ি ও কোমল

আকুল আহ্বান—পৃঃ ১১৮

মা, আমার এই জেনো হৃদয়ের সাধ
তুমি হও লক্ষ্মীর প্রতিমা ;
মানবেরে জ্যোতি দাও, কর আশীর্ব্বাদ
অকলঙ্ক মূর্ত্তি মধুরিমা !

মঙ্গলগীতি—পৃঃ ১২০

তোমার সৌন্দর্য্যে হোক্ মানব সুন্দর,
প্রেমে তব বিশ্ব হোক্ আলো—

*　　*　　*　　*

নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল—

স্তন পৃঃ ১২৮

এই যে জন্মের তরে জননী ঝাঁপিয়ে পড়ে,
কেন বাঁধে বক্ষোপরে সন্তান আপন।
মরণের মুখে ধায় সেথাও দিবে না তায়
কাড়িয়া রাখিতে চায় হৃদয়ের ধন।

মানসী

সিন্ধুতরঙ্গ ১২৯৪—পৃঃ ১৬৫

দুটি সমাযোগ্য নরনারীর মিলন দেখিতে রমণীর যেমন সুন্দর লাগে এমন আর কিছু নয়। এত রহস্য এত সুখ এত অতলস্পর্শ কৌতুহলের বিষয় তাহার পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। দালিয়া ১২৯৮

সাধনা পৃঃ ২০৬

বাস্তবিক সাধারণ স্ত্রীজাতির পরে পুরুষ মানুষের একটা নির্ব্বিচার পক্ষপাত আছে, এবং সেজন্য স্ত্রীলোকেরাই তাহাদিগকে অধিক অপরাধী করে।

জীবিত ও মৃত—১২৯৯

সাধনা পৃঃ ২৩৮

দেখেছিনু, কচি মেয়ে মায়ের বাহুতে শুয়ে
ঘুমায়ে করিছে স্তন পান
ঘুমন্ত মুখের পরে বরষিছে স্নেহ ধারা
স্নেহমাখা নত দুনয়ান,—

প্রভাতসঙ্গীত—গ্রন্থাবলী—পৃঃ ৬৫

মা আমার আজ আমি কত শত দিন পরে
যখনিরে দাঁড়ানু সম্মুখে, অমনি চুমিলি মুখ,
কিছু নাই অভিমান, অমনি লইলি তুলে বুকে।

পুনর্মিলন—পৃঃ ৬৯

মায়ের প্রাণে স্নেহ হয়ে শিশুর পানে ধাই

স্রোত—পৃঃ ৭৫

নারীর উক্তি—বাক্ত প্রেম—১৮—৮৮ বধূ—১৮৮৮

অহল্যার প্রতি—১৮৯০

মাতৃধৈর্য্যে মৌন মূক সুখ দুঃখ যত
অনুভব করেছিলে স্বপনের মত সুপ্ত আত্মা মাঝে।

* পৃঃ ১৬৮—

* বিচিত্র প্রবন্ধ—পঞ্চভূত—১২৯৯—১৩০৩

লেখক বলিতেছেন—

আমাদের সাহিত্যে স্ত্রীলোক যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের স্ত্রীলোক আমাদের দেশের পুরুষের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

লেখক আবার বলিলেন—

আমি তাহাকে সে কথা কহিলাম, এবং কহিলাম, স্ত্রীজাতি স্তুতিবাক্য শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসে।

ঐ, পৃঃ ১৬৯—

লেখকের নিজের কথা—

স্ত্রীলোকেরও প্রধান কার্য্য আনন্দ দান করা। তাহার সমস্ত অস্তিত্বকে সঙ্গীত ও কবিতার ন্যায় সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যময় করিয়া তুলিলে তবে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সেইজন্যই স্ত্রীলোক স্তুতিবাদে বিশেষ আনন্দলাভ করে।

ত্রুটি অসম্পূর্ণতা দেখাইলে একেবারে তাহাদের মর্ম্মের মূলে গিয়া আঘাত করে। এই জন্য লোকনিন্দা স্ত্রীলোকের নিকট বড় ভয়ানক।

ঐ, পৃঃ ১৬৯—

লেখক—

আর আমাদের বামপার্শ্বে আমাদের রমণীগণ নিম্নপথ দিয়া বিনম্র সেবিকার মত আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া স্বচ্ছ সুধাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে। তাহাদের একমুহূর্ত্ত বিরাম নাই। তাহাদের গতি, তাহাদের প্রীতি, তাহাদের সমস্তজীবন এক ধ্রুব লক্ষ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে আমরা লক্ষ্যহীন, ঐক্যহীন— * * * —

যেদিকে জলস্রোত, যেদিকে নারীগণ, কেবল সেই দিকে সমস্ত শোভা, ছায়া এবং সফলতা, এবং যেদিকে আমরা, সেদিকে মরুচাকচিক্য—ইত্যাদি।

ঐ, পৃঃ ১৭১—

বিচিত্র প্রবন্ধ—

মানব সমাজে স্ত্রীলোক সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন; পুরুষ নানা কার্য্য নানা অবস্থা নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে সর্ব্বদাই

চঞ্চলভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে; স্ত্রীলোক স্থায়ীভাবে কেবলি জননী এবং পত্নীরূপে বিরাজ করিতেছে, কোনো বিপ্লবেই তাহাকে বিক্ষিপ্ত করে নাই; এই জন্য সমাজের মর্ম্মের মধ্যে নারী এমন সুন্দররূপে সংহতরূপে মিশ্রিত হইয়া গেছে;—

পল্লিগ্রামে পৃঃ ১৮৩—

রূপকে যদি কাহারো আপত্তি না থাকে তবে আমি বলি আমাদের এই চঞ্চল বহিরাংশ পুরুষ, এই বৃহৎ গোপন অচেতন অন্তরংশ নারী।

অখণ্ডতা পৃঃ ২০৯—

সমাজের সমস্ত আহরণ, উপার্জ্জন, জ্ঞান ও শিক্ষা স্ত্রীলোকের মধ্যে গিয়া নিশ্চল স্থিতিলাভ করিতেছে। এই জন্য তাহার এমন সহজবুদ্ধি সহজ শোভা অশিক্ষিত পটুতা। মনুষ্যসমাজে স্ত্রীলোক বহুকালের রচিত; এইজন্য তাহার সংস্কারগুলি এমন দৃঢ় ও পুরাতন, তাহার সকল কর্ত্তব্য এমন চিরাভ্যস্ত সহজ সাধ্যের মত হইয়া চলিতেছে; পুরুষ উপস্থিত আবশ্যকের সন্ধানে সময়স্রোতে অনুক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিতেছে; কিন্তু সেই সমুদায় চঞ্চল প্রাচীন পরিবর্ত্তনের ইতিহাস স্ত্রীলোকের মধ্যে স্তরে স্তরে নিত্যভাবে সঞ্চিত হইতেছে।

পুরুষ আংশিক, বিচ্ছিন্ন, সামঞ্জস্যবিহীন। আর স্ত্রীলোকে এমন একটি সঙ্গীত যাহা সমে আসিয়া সুন্দর সুগোলভাবে সম্পূর্ণ হইতেছে।

অখণ্ডতা পৃঃ ২০৯—

কবি যেমন কাব্য গঠন করেন, তানসেন যেমন তান লয় ছন্দে এক একটি গান সৃষ্টি করিতেন, রমণী তেমনি আপনার জীবনটি রচনা করিয়া তোলে। বিচিত্র উপাদান লইয়া বড় সুনিপুণ হস্তে একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করে; কেবল গৃহ কেন, রমণী যেখানে যায়, আপনার চারিদিককে একটি সৌন্দর্য্যসংযমে বাঁধিয়া আনে। প্রকৃতিতে যাহা সৌন্দর্য্য মহৎ গুণিলোকে তাহাই প্রতিভা, এবং নারীতে তাহাই শ্রী, তাহাই

ইঙ্গিতকে একটি অনির্ব্বচনীয়, গঠন দান করে। তাহাকে বলে শ্রী।

অখণ্ডতা পৃঃ ২১১—

সোনার বাঁধন ১২৯৯—

বন্দী হয়ে আছ তুমি সুমধুর স্নেহে,
অয়ি গৃহলক্ষ্মি, এই করুণ ক্রন্দন
এই দুঃখ দৈন্যে ভরা মানবের গেহে;
তাই দুটি বাহু পরে সুন্দর বন্ধন
সোনার কঙ্কন দুটি বহিতেছ দেহে
শুভ চিহ্ন, নিখিলের নয়ন-নন্দন।
তুমি বদ্ধ স্নেহ প্রেম করুণার মাঝে,—
শুধু শুভকর্ম্ম, শুধু সেবা নিশিদিন।

গ্রন্থাবলী পৃঃ ৩০২—

সমাজ—১২৯৮

স্ত্রীলোক সমাজের কেন্দ্রানুগ (centripetal) শক্তি;

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পৃঃ ৪৩

আমরা ত দেখ্‌তে পাই আমাদের দেশের মেয়েরা তাঁদের সুগোল কোমল দুটি বাহুতে দু'গাছি বালা পরে সিঁথের মাঝখানটিতে সিঁদুরের রেখা কেটে' সদা প্রসন্নমুখে স্নেহ প্রেম কল্যাণে আমাদের গৃহ মধুর করে' রেখেছেন। কখনো কখনো অভিমানের অশ্রুজলে তাঁদের নয়নপল্লব আর্দ্র হয়ে আসে, কখনো বা ভালবাসার গুরুতর অত্যাচারে তাঁদের সরল সুন্দর মুখশ্রী ধৈর্য্য গম্ভীর সকরুণ বিষাদে ম্লানকান্তি ধারণ করে;—

ঐ, পৃঃ ৪৫

এখানে কথা হচ্ছিল, আমাদের স্ত্রীলোকেরা সুখী কি অসুখী। আমার মনে হয় আমাদের সমাজের যে রকম গঠন তাতে সমাজের ভাল মন্দ যাই হোক্ আমাদের স্ত্রীলোকেরা বেশ একরকম সুখে আছে। ইংরাজেরা মনে করতে পারেন লন্ টেনিস্ না খেল্‌লে এবং "বলে" না নাচলে স্ত্রীলোক সুখী হয় না, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস ভালবেসে এবং ভালবাসা পেয়েই স্ত্রীলোকের প্রকৃত সুখ। তবে সেটা একটা কুসংস্কারও হতে পারে।

ঐ, পৃঃ ৪৭

আমাদের পরিবারে নারী-হৃদয় যেমন বিচিত্রভাবে চরিতার্থতা লাভ করে এমন ইংরাজ পরিবারে অসম্ভব।

আমাদের বিধবার নারীপ্রকৃতি কখনো শুষ্ক শূন্য পতিত থেকে অনুর্ব্বরতা লাভের অবসর পায় না। তাঁর কোল কখনো শূন্য থাকে না, বাহু দুটি কখনো অকর্ম্মণ্য থাকে না, হৃদয় কখনো উদাসীন থাকে না, তিনি কখনো জননী, কখনো দুহিতা, কখনো সখী। এইজন্য চিরজীবনই তিনি কোমল সরস স্নেহশীল সেবা-তৎপর হয়ে থাকেন।

ঐ, পৃঃ ৪৮

ভালবাসাহীন বন্ধনহীন শূন্য স্বাধীনতা নারীর পক্ষে অতি ভয়ানক—মরুভূমির মধ্যে অপর্য্যাপ্ত স্বাধীনতা গৃহীলোকের পক্ষে যেমন ভীষণ শূন্য।

আমরা আর যাই হই আমরা গৃহস্থজাতি; অতএব বিচার করে' দেখ্‌তে গেলে আমরা আমাদের রমণীদের দ্বারেই অতিথি, তাঁরাই আমাদের সর্ব্বদা বহুযত্ন আদর করে রেখে দিয়েচেন। এমনি আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে' রেখেছেন যে আমরা ঘর ছেড়ে দেশ ছেড়ে দু'দিন টি'কতে পারিনে; তাতে আমাদের অনেক ক্ষতি হয় সন্দেহ নেই কিন্তু তাতে করে, নারীরা অসুখী হয় না।

ঐ, পৃঃ ৪৯

আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে যে কিছুই করবার নেই, আমাদের সমাজ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বসম্পূর্ণ এবং আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থা তার একটা প্রমাণ, একথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়। আমাদের রমণীদের শিল্পের অঙ্গহীনতা আছে এবং অনেক বিষয়ে তাঁদের শরীর মনের সুখ সাধন করাকে আমরা উপেক্ষা এবং উপহাসযোগ্য জ্ঞান করি। এমন কি, রমণীদের গাড়িতে চড়িয়ে স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবন করানকে আমাদের দেশের পরিহাস রসিকেরা একটা পরম হাস্যরসের বিষয় বলে স্থির করেন, কিন্তু তবুও মোটের উপর বলা যায় আমাদের স্ত্রীকন্যারা সর্ব্বদাই বিভীষিকা রাজ্যে বাস করচেন না, এবং তাঁরা সুখী।

ঐ, পৃঃ ৪৯

সাধনা—১৩০০

স্ত্রীলোক সমাজের শক্তিস্বরূপা। রমনী চেষ্টা করিলে বিরোধী পক্ষের মিলন সাধন করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় সংস্কারের বশ। তাঁহারা যুক্তি নামক প্রবল দানবটাকে সুমিষ্ট হাস্যে উড়াইয়া দিতে কুণ্ঠিত নহেন কিন্তু রুচি নামক সুকুমারী পরীটিকে কোনোমতেই উপেক্ষা করিতে পারেন না।

ইংরাজ ও ভারতবাসী পৃঃ ৫১৩

আধুনিক সাহিত্য—১৩০০

স্ত্রীলোক যখন কাজ করে তখন এমনি করিয়াই কাজ করে। তাহার সমস্ত মনপ্রাণ লইয়া বিবেচনা চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া একেবারে অব্যবহিত ভাবে উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়।

রাজসিংহ—পৃঃ ৮৮

লোক সাহিত্য—১৩০১

আমাদের বাংলা দেশে এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে—মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠানো। অপ্রাপ্তবয়স্ক অনভিজ্ঞ মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়, সেইজন্য বাঙালী কন্যার মুখে সমস্ত বঙ্গদেশের একটি ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতর স্নেহ বাংলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে।

চৈতালি—১৩০২

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী!
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য্য সঞ্চারি'
আপন অন্তর হ'তে।
অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা।

মানসী—পৃঃ ৪১৯

তুমি এ মনের সৃষ্টি তাই মনোমাঝে
এমন সহজে তব প্রতিমা বিরাজে।

নারী—পৃঃ "

তোমার মহিমা জ্যোতি তব মূর্ত্তি হ'তে
আমার অন্তরে পড়ি' ছড়ায় জগতে।

" —— " —— মানসী পৃঃ "

প্রিয়া—পৃঃ "

" —১৩০৩—শ্রেয়সী—পৃঃ ৪২৫

জননী জননী বলে ডাকি তোরে ত্রাসে
যদি জননীর স্নেহ মনে তোর আসে
শুনি আর্ত্তস্বর !

ভয়ের দুরাশা—পৃঃ ৩২২

কল্পনা—১৩০৫—বঙ্গলক্ষ্মী

কণিকা—সৌন্দর্য্যের সংযম

নর কহে—বীরমোরা যাহা ইচ্ছা করি।
নারী কহে জিহ্বা কাটি—শুনে লাজে মরি।
পদে পদে বাধা তব—কহে তারে নর।
কবি কহে—তাই নারী হয়েছে সুন্দর।

স্মরণ—১৮—

সংসার সাজায়ে তুমি আছিলে রমনী
আমার জীবন আজি সাজাও তেমনি
নির্ম্মল সুন্দর-করে ! ফেলে দাও বাছি
যেথা আছে যত ক্ষুদ্র তৃণ কুটা গাছি—
যেথা মোর পূজা গৃহ নিভৃত মন্দিরে
সেথায় নীরবে এস দ্বার খুলি ধীরে
মঙ্গল কণক-ঘটে পুণ্যতীর্থ জল
সযত্নে ভরিয়া রাখ, পূজা-শতদল
স্বহস্তে তুলিয়া আন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরমা দেবী

চিংড়ি মাছের পিটে খাওয়া

এক গেরস্তদের বউ আছে। সে এখন একদিন পুকুরে চাল ধুতে গিয়েচে—গিয়ে যেমনি চালগুলি ধুতে যাবে কি আর অমনি হাত ফস্‌কে সবকটি চাল জলে পড়ে গেল।

বউ বসে বসে কাঁদচে, চালধুয়ে না নিয়ে যেতে পারলে শাশুড়ী তাকে বক্‌বে। এখন সেই পুকুরে এক ঢেঁকি চিংড়িমাছ থাক্‌ত—সে রোজ চাল ধোবার সময় ঘাটের কাছে এসে খুদগুলি খুঁটে খুঁটে খেতো। বউকে কাঁদতে দেখে চিংড়িমাছ বল্‌লে—

বউ তুমি কাঁদ কেন ?

বউ বল্‌লে—আমার চাল ক'টি সব জলে পড়ে গেছেতাই আমি কাঁদচি শাশুড়ী বক্‌বে বলে। চিংড়ি বল্‌লে—

চাল দিয়ে কি হবে ?

বউ বল্‌লে পিটে গড়া হবে। চিংড়ি বল্‌লে আমি তোমার চাল তুলে দেব, আমাকে কিন্তু পিটে দিও।

বউ বল্‌লে আচ্ছা।

এই কথা বলে চিংড়ি শুঁয়ো ভাসিয়ে ভাসিয়ে—শুঁয়ো ভাসিয়ে ভাসিয়ে চালগুলি সব বউয়ের ঝুড়িতে তুলে দিলে বউ আপ্‌নার চাল নিয়ে খুসী হয়ে বাড়ী চলে গেল।

বাড়ী গিয়ে পিটে গড়ে কতক খেয়েচে—বাকিগুলি সকালে ছেলে মেয়েদের দেবে বলে হাঁড়িতে পু'রে সিকেয় তুলে রেখেচে। এদিকে চিংড়িকে পিটে দেবার কথা ভুলেই গিয়েচে।

রাত্তির হয়ে গেছে। চিংড়ি ভাব্‌চে আমি চাল তুলে দিলাম গেরস্তদের বউ যে বল্লে পিটে দিয়ে যাবে কৈতো দিলেনা ? তবে আমি যাই দিকি, বলে সে গেরস্থদের বাড়ীর দিকে চলছে—

ঠ্যাং গড়াগড় ঠ্যাং গড়াগড় ঠ্যাং গড়াগড়।

গেরস্তদের বাড়ীর দরজার কাছে গিয়ে সে বললে—

দরজাটি দরজাটি খোলোতো, আমিতো পিঠে পুলি খাবতো।

বলতেই দরজাটি আপনি খুলে গেল।

ঠ্যাং গড়াগড় ঠ্যাং গড়াগড় ঠ্যাং গড়াগড়

রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে চিংড়ি বল্‌লে—

দরজাটি দরজাটি খোলোতো, আমিতো পিঠে পুলি খাবতো

বলতেই দরজাটি আপনি খুলে গেল।

তারপর চিংড়ীমাছ ঘরের ভেতর ঢুকে বলছে হাঁড়িটি হাঁড়িটি নাবতো, আমি তো পিঠে পুলি খাবতো।

বলতেই হাঁড়িটি নেবে এল। আসতেই চিংড়িমাছ বেশ কোরে পিঠে খেল। খেয়ে দেয়ে বল্‌লে হাঁড়িটি হাঁড়িটি ওঠোতো আমার তো পিঠে পুলি খাওয়া হোলতো।

বলতে না বলতেই হাঁড়িটি উঠে শিকের ঝুলে রইল। চিংড়ী রান্না-ঘরের বাইরে গিয়ে বল্‌লে দরজাটি দরজাটি বন্ধ হও তো আমার তো পিটে পুলি খাওয়া হোলতো। তাই শুনে দরজাটি আপনি বন্ধ হোয়ে গেল। এই রকমে সদর দরজাটি বন্ধ করে চিংড়ি মাছ ঠ্যাং গড়াগড়, ঠ্যাং গড়াগড়, ঠ্যাং গড়াগড় করে ঝুপ করে পুকুরের জলে গিয়ে পড়লো।

এদিকে সকাল বেলা হয়েছে ছেলেরা বউকে বলছে পিটে দাওনা মা? বউ বল্‌লে দাঁড়া আগে কাপড় চোপড় কাচি তার পরে দেব। বলে কাপড় চোপড় কেচে পিটে পাড়তে গিয়ে দেখে ওমা কি হবে হাঁড়িতে একখানিও পিটে নেই।

তখন তার মনে পড়ল ঐ যাঃ চিংড়িকে তো পিটে দেওয়া হয়নি।

পিটে নেই দেখে শাশুড়ী বউকে বললে হাঁ বউ একহাঁড়ি পিটে তা কি হোল?

বউ বল্‌লে মা চাল ধুতে গিয়ে সব পুকুরে পড়ে গিয়েছিল একটা চিংড়ি মাছ তুলে দিয়ে বলেছিল বটে আমাকে পিটে দিস। তাকেত পিটে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম তাই সে হয়তো এসে সব খেয়ে গেছে। নইলে আর কি হ'বে হাঁড়িতে রেখে দিয়েছিলাম কোথায় আর যাবে?

বিকেল হোল শাশুড়ী বউকে বল্‌লে আজকেও চারটি চাল নিয়ে যাও দেখি। চিংড়িকে পিটে খেতে দেবে বলে এস। বলো যে রাত্তির হোলে যেন সে আমাদের বাড়ী আসে।

বউতো চাল ধুতে গেল। এদিকে গিন্নি কত্তাকে ডেকে বল্‌লে ওগো চিংড়ি মাছ খাবে?

কত্তা বল্‌লে খাব। গিন্নি বললে তাহলে তুমি বঁটী নিয়ে দোরের পাশে লুকিয়ে থেক। যেমনি চিংড়ি মাছ আসবে আর তাকে কেটে ফেলো।

বউ আপনার এদিকে সেদিন ইচ্ছে করে জলে চালক'টী ফেলে দিয়ে কাঁদচে। চিংড়ি এসে বল্লে ও বউ তুই কাঁদছিস কেন?

বউ বল্‌লে আমার চালগুলো সব ধুতে গিয়ে জলে পড়ে গেছে। চিংড়ি বল্‌লে চাল দিয়ে কি হবে? বউ বল্‌লে পিটে হবে।

চিংড়ি বল্‌লে আমাকে পিটে দাওঃ চাল তুলে দেব। বউ বল্‌লে আচ্ছা। চিংড়ি বল্‌লে কখন দেবে? বউ বল্‌লে তুই রাত্তির হলে আমাদের বাড়ী যাস তখন দেব।

তাই শুনে চিংড়ি শুঁড় ভাসিয়ে ভাসিয়ে সব চালগুলি বউকে তুলে দিলে।

চাল নিয়ে বউ বাড়ী আসতেই গিন্নী বল্‌লে কি হোল গো? বউ বল্‌লে মা চিংড়ি আজ রাত্তিরে আমাদের বাড়ী আসবে।

রাত্তির হয়েছে চিংড়ি, ঠ্যাং গড়াগড়, ঠ্যাং গড়াগড়, করে গেরস্তদের বাড়ীর কাছে এল। কত্তা আগে থেকে বঁটী নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যেই চিংড়ি দরজার কাছে এসেছে কি আর অমনি এক কোপে তাকে দু—' টুক্‌রো করে কেটে ফেলেছে। তার পরে বউকে ডেকে বল্‌লে ও বউ আজ ভাল করে লাউ-চিংড়ি রেঁধে দাওতো?

বউ সেই চিংড়ি মাছ কুটে দিব্যি করে তরকারী রাঁধ্‌চে আর একটু করে চেকে দেখ্‌চে কেমন হয়েছে— একটু একটু করে চাক্‌তে চাক্‌তে সব তরকারী ফুরিয়ে গেল। তাই দেখে বউ বল্‌লে ওমা তাইত এখন কি হবে? কত্তাকে কি খেতে দেব? বাড়ীতে ছিল একটা পোষা কুকুর। বউ করেছে কি তার লেজ চাকা চাকা করে কেটেছে—কেটে যেমন করে চিংড়ি মাছ রেঁধেছিল, তেমনি করে রেঁধে কত্তাকে ভাত খেতে দিয়েছে। কত্তা ভাত খাচ্ছে আর কুকুরটা সেখানে বসেছিল সে বলছে—

বউ খায় চিংড়ীর ঝোল আর কত্তা খায় কুকুরের ন্যাজ, ঘেউ ঘেউ।

কত্তা তাই শুনে বউকে বল্‌লে বউ কুকুরটা কি বল্‌ছে? বউ বল্‌লে কিছু নয়তো।

কত্তা বল্‌লে ও কুকুরের ন্যাজ খাবার কথা কি বলচে? বলে ভাল করে চেয়ে দেখে ওমা তরকারীতে কুকুরের ন্যাজ কাটাইত বটে। তখন কত্তা রেগে বউকে দূর করে তাড়িয়ে দিলে। বউ কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

ভক্তকথা

জেনভা ২০শে এপ্রিল ১৮৪৯—আমি শেষ যেবার জেনভা ছেড়ে গিয়েছিলুম সে আজ ছয় বৎসর। এর মধ্যে কত চিন্তা, কত দেখা, কত অনুভূতি, কত যাওয়া আসা, মানুষ ও বস্তুর কত প্রকারের মূর্ত্তি যে আমার চোখের সামনে দিয়ে মনের উপর দিয়ে ভেসে চলে গেছে তার আর অন্ত নেই। আমার জীবনে গত সাত বৎসর সব চেয়ে বড় স্মরণীয় ব্যাপার, কারণ এই কয় বৎসর ধরে আমার বুদ্ধি একটি নূতন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে এসেছে এবং আমার জীবন সত্যজীবনের মধ্যে দীক্ষালাভ করেছে।

আজ বিকালে তিনবার শিলাবৃষ্টি হয়ে গেল। আহা, মুকুলিত পাম গাছ আর পীচ গাছ গুলো! ছয় বৎসর আগে যখন ঐ চেরিগাছ গুলো বসন্তের নবীন পীত উত্তরীয় খানি অঙ্গের উপর টেনে দিয়ে নববিবাহের ফুল ভারে নত হয়ে, ভেভিয়াসের মাঠ দিয়ে, আমার চলে যাবার দিন বিদায়ের মিষ্টহাসি হেসেছিল, তার সঙ্গে আজকের কত তফাৎ। সেদিন বারগাণ্ডির লাইলাগুলো সৌরভের কি উচ্ছাসই আমার মুখের উপর প্রবাহিত করেছিল।

৩রা মে ১৮৪৯—আমার ভিতরে কোনদিনই আমি জিনিয়াস হবার কোন ভরসা পাইনি, নিজেকে ভবিষ্যতে খুব বড় কি খুব বিখ্যাত করে কল্পনাতেও কোনদিন দেখিনি, এমন কি কারো স্বামী বা পিতা অথবা গণামান্য হবার কথাও কোনদিন আমার মনে স্থান পায়নি। ভবিষ্যতের প্রতি এই ঔদাসিন্য, আত্মশক্তির প্রতি এই একান্ত অবিশ্বাস, নিঃসন্দেহ এগুলিকে ইঙ্গিত বলিয়া ধরিতে হইবে। আমার ভবিষ্যতের অল্প স্বল্প যা স্বপ্ন, তার সমস্তই ঝাপসা ও অনির্দ্দিষ্ট। আমার বেঁচে থাকা উচিত নয় কারণ আমার বাঁচবার যোগ্যতা আছে কিনা তাই সন্দেহ। নিজের স্থানটিকে চিনে নাও। যারা প্রাণের স্পন্দনে নিরন্তর জাগ্রত তারাই বাঁচুক। আর তুমি তোমার চিন্তা শক্তিকে একত্রিত করে তোমার ভাবের এবং অনুভূতির সম্পত্তিকে জগতে দান করে যাও, তাহলেই তুমি সব চেয়ে ভাল করে জগতের কাজে লাগতে পারবে। নিজেকে ত্যাগ কর। যে পাত্রটি তোমাকে দেওয়া হয়েছে তাতে গরলই উঠুক আর অমৃতই উঠুক সাদরে তাকে গ্রহণ কর। তোমার অন্তরের মধ্যে সেই দীপ্যমান পরমাত্মাকে প্রতিষ্ঠিত কর। তোমার আত্মা এখন হইতে তাঁরই দ্বারা অভিষিক্ত হোক্। তোমার চিত্তের মধ্যে সেই অপাপবিদ্ধ ভূমার পূজার মন্দির রচনা করে রাখ। মঙ্গল কর্ম্মে শ্রমনিষ্ঠ হয়ে সকলকে আনন্দ দান কর, সকলের কল্যাণ কর। ব্যক্তিগত স্বার্থকে একবার সরিয়ে ফেল্লে পর তখন জীবন মৃত্যু যাই আসুক না কেন সকল ঘটনার মধ্যেই তোমার একটি গভীর সান্ত্বনা থাকবে।

বার্লিন ১৯ শে জুলাই—একটি মাত্র জিনিষের আবশ্যক আছে সে হচ্ছে ঈশ্বরকে পাওয়া। আমাদের সকল ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, ও আত্মার শক্তি এবং বাহিরের সকল সঙ্গতি, এ সমস্তই সেই দেবাদিদেবের নিকটবর্ত্তী হইবার উপায় মাত্র, শুধু ভূমার রসাস্বাদন ও অর্চ্চনার বিভিন্ন প্রণালী। যাহা কিছু হারাইতে পারে তাহা হইতে নিজেকে নিরাসক্ত রাখিতে

শিখিতে হইবে, যাহা চিরন্তন এবং অসীম তাহার সহিত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিজেকে বাঁধিতে হইবে। এ ছাড়া আর যাহা কিছু তাহা ক্ষণিক এবং উপসত্ত্ব হিসাবেই ভোগ করিবে। পরমাত্মাকে, ঐকান্তিক প্রীতি করা, উপলব্ধি করা, পাওয়া এবং কর্ম্মের মধ্যে তাঁহাকে স্বীকার করা এই হইল আমার বিধি বিধান আমার কর্ত্তব্য আমার সুখ ও আমার স্বর্গ।

যাহা আসিবেই তাহা আসুক—এমন কি মৃত্যুও। কেবল নিজের মধ্যে যেন শান্তি থাকে, ঈশ্বরের সান্নিধ্যে, তাঁহারি মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যেন বাস করিতে পার এবং তাহার পর জীবনের পরিচালনার ভার, সেই সকল বিশ্বজনীন শক্তির হাতে ছাড়িয়া দাও—যাহার বিরুদ্ধে তোমার সংগ্রাম নিষ্ফল। মৃত্যু যদি আমাকে সময় দেয় বেশ সে ভাল কথা। তাহার আহ্বান যদি আসন্ন হয় সে আরও ভাল। জরা যদি অতর্কিত ভাবে আসিয়া আমাকে ধরে তবুও তাহাই ভাল কারণ তাহাতে এখন হইতে বীর্য্যের, চরিত্র মাহাত্ম্যের, ত্যাগের পথ আমার কাছে খুলিয়া যায়। কেবল সেইজন্যই যেন আমার বাহিরের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইতেছে।

প্রত্যেক জীবনের মধ্যেই মহৎ হইবার সম্ভাবনা সুপ্ত রহিয়াছে এবং সেই মহান্ ভূমার বাহিরে থাকা যখন সম্ভব নহে তখন জানিয়া শুনিয়া তাঁহার মধ্যে বাস করাই শ্রেয়।

শ্রীপ্রতিমা দেবী।

টোট্কা ঔষধ

চোখ ওঠা—

১। চোক উঠিলে একখানি 'রেড়ির' পাতায় ভাল করিয়া রেড়ির তেল মাখাইয়া গরম করিয়া চোখের উপরে দিলে যন্ত্রণার খুব শীঘ্র উপশম হয়।

২। মায়ের দুধে ফট্‌কিরি ঘষিয়া যখন সেটি চন্দনের মত ঘন হইবে তখন সেইটা চোখে কাজলের মত পরিলে খুব উপকার হয়। প্রথমে চোখে দিলে জ্বালা করে কিন্তু খুব শীঘ্র চোখের লাল ভাবটা কাটিয়া যায়।

৩। গুগ্‌লির খোলাটা ভাঙ্গিলে তাহার ভিতর যে জলটা থাকে সেইটা চোখের ভিতর দিলে চোখের আশ্চর্য্য উপকার হয়।

এই ঔষধগুলি আশু যন্ত্রণা নিবারণ করে।

খোস পাঁচড়া—

১। একখানি কাগজ নারিকেলের জলে খুব ভাল করিয়া ভিজাইয়া তাহার উপর গন্ধকচূর্ণ ছড়াইয়া দিবে। তার পর সেই কাগজখানি একটা কাঠিতে জড়াইয়া একটি মোমবাতির উপর ধরিলে তাহা হইতে টপ টপ করিয়া তেল পড়িবে। সেই তেলটা একটা বাটিতে ধরিয়া খোসের উপর দিলে খোস সারিয়া যায়।

২। আতার পাতা বাটিয়া খোসের উপর দিলে খোসের পোকা মরিয়া যায়।

৩। একটা পরিষ্কার কাগজ পুড়াইয়া সেই পোড়া কাগজটা খানিকটা নারিকেল তেলে দিয়া মাড়িতে হইবে। সেই জিনিষটা মাড়িয়া মলমের মত হইলে খোসের উপর দিলে উপকার হয়।

৪। খানিকটা নারিকেল তেল গরম করিয়া তাহাতে কিছু নিমপাতা ফেলিয়া দিতে হইবে। যখন পাতাগুলি ভাজা ভাজা হইয়া যাইবে তখন একটু কর্পূর ও খানিকটা খাঁটি মোম ফেলিয়া দিতে হয়। সে গুলি একেবারে গলিয়া গেলে নামাইয়া লইয়া সেই মলমটা খোসে লাগাইলে খোস ভাল হইয়া যায়।

শ্রীবাসন্তী দেবী।

আমের আচার

কাঁচা আম একটু বড় হইলে অর্থাৎ আঠি ঈষৎ শক্ত হইতে আরম্ভ করিলে এই আচার করিতে হয়।

আমগুলি খোসা শুদ্ধ চার ফালি কি ইচ্ছামত ছয় ফালি আর ছোট হইলে আধখানা করিয়া কাটিয়া ৩ ঘণ্টা চূণের জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পরে একটি এলুমিনিয়াম কি এনামেলের পাত্র চড়াইতে হইবে কারণ লোহার পাত্রে কাল হইয়া যাইবে। পাত্রে অনেকটা তেল চড়াইতে হইবে। যতটা তেলে আচার ডুবিয়া থাকিবে ততটা তেল চড়াইতে হইবে। তেল পাকিলে খানিকটা পাঁচফোড়ন দিয়া আমগুলি ছাড়িয়া তাহাতে আন্দাজ মত হলুদ, লঙ্কা ও সরিষার গুড়া ও অনেকটা চিনি কিম্বা গুড় দিতে হইবে। যখন আমগুলি শক্ত থাকিবে অথচ সামান্য একটু নরম হইবে তখন নামাইয়া ঠাণ্ডা করিতে হইবে। ঠাণ্ডা হইলে কাচের বুয়ামে ভরিয়া ১৫ দিন অন্তর রৌদ্রে দিতে হইবে।

এই আচার খাইতে যেরূপ ভাল দেখিতে ও সেরূপ সুন্দর।

শ্রীস্নেহলতা সেন।
(বুলু)

ওলের চাট্‌নি

ওল খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া জলে সিদ্ধ করিবে। সুসিদ্ধ হইলে উহা জল হইতে তুলিয়া ভাল করিয়া চটকাইয়া রাখিবে। একটা এলুমিনিয়ামের বাসনে তেল চড়াইয়া তাহাতে শুক্‌না লঙ্কা ও পাঁচ ফোড়ন অথবা সরিষা ফোড়ন দিয়া ওল ঢালিয়া দিবে ও নাড়িবে এবং একটু পরে সরিষা বাটা, ঘন তেঁতুল গোলা, লবণ ও চিনি দিয়া বেশ করিয়া ঘাঁটিবে। যখন মোহনভোগের মত শুক্‌না হবে তখন নামাইবে। এই চাট্‌নি রাঁধিয়া রাখিলে ২।৩ দিন বেশ থাকে।

শ্রীস্নেহলতা সেন।
(লটী)

অকিঞ্চনের ঝুলি

আমাদের দেশে, সময় অতীত হইয়া গেলে, যদি কাহারও কোনও প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়ে তাহা হইলে তাহাকে ঠাট্টা স্থলে বলা হইয়া থাকে—

ভাল কথা মনে পড়ল আঁচাতে আঁচাতে,
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে।

প্রবাদটির উৎপত্তি এইরূপ—

এক গৃহস্থের কন্যা ও পুত্রবধূ নদীতে স্নান করিতে গিয়াছে, এখন মেয়েটিকে কুমীরে টানিয়া লইয়া গেল। বধূ বাড়ী আসিয়া কাজে কর্ম্মে ব্যস্ত থাকায় কথাটির উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গেলেন (এরকম কর্ম্মিষ্ঠা, স্নেহময়ী বধূ খুবই কম দেখা যায়—গল্পটি ননদিনী-প্রীতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ)।

পল্লীগ্রামে বিবাহিতা কন্যারা যখন দু'চার দিনের জন্য পিতৃগৃহে আসে তখন এবাড়ী ওবাড়ী নিমন্ত্রণ খাওয়াতেই তাহাদের দিন কাটিয়া যায়—সেই মনে করিয়াই বোধ হয় বাড়ীর লোকেরাও মেয়েটির খোঁজ করা আবশ্যক মনে করিল না।

বধূ রাত্রে আহারাদি সারিয়া আঁচাইতে গিয়াছেন—এমন সময় হঠাৎ ননদিনীকে স্মরণ হইল—তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন—

ভালকথা মনে হলো আঁচাতে আঁচাতে
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে।

অকিঞ্চনের ঝুলি।

Printed & Published by Jagadananda Roy, at the Santiniketan Press, Santiniketan.

শ্রেয়সী পত্রিকার নিয়মাবলী

১। শ্রেয়সীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা।

বৈশাখ মাস হইতে পর বৎসরের চৈত্র পর্য্যন্ত শ্রেয়সীর বৎসর গণনা করা হয়। যিনি যে বৎসরের গ্রাহক হইবেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে পত্রিকা দেওয়া হইবে।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে শ্রেয়সী প্রকাশিত হয়। কোন গ্রাহক সময় মত না পাইলে ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৩। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পত্রিকা প্রকাশের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমাদিগকে জানাইবেন নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী থাকিব না।

৪। শান্তিনিকেতনবাসীদের জন্য শ্রেয়সীর বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

৫। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থাদি ও চিঠি পত্র পাঠাইবেন।

৬। ডাকমাশুল সমেত চিঠি না দিলে কাহারও চিঠির জবাব দেওয়া হয় না।

বীরভূম
শান্তিনিকেতন পোঃ

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীপ্রতিমাদেবী,
শ্রীরমাদেবী।

১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

পৌষ, ১৩২৯
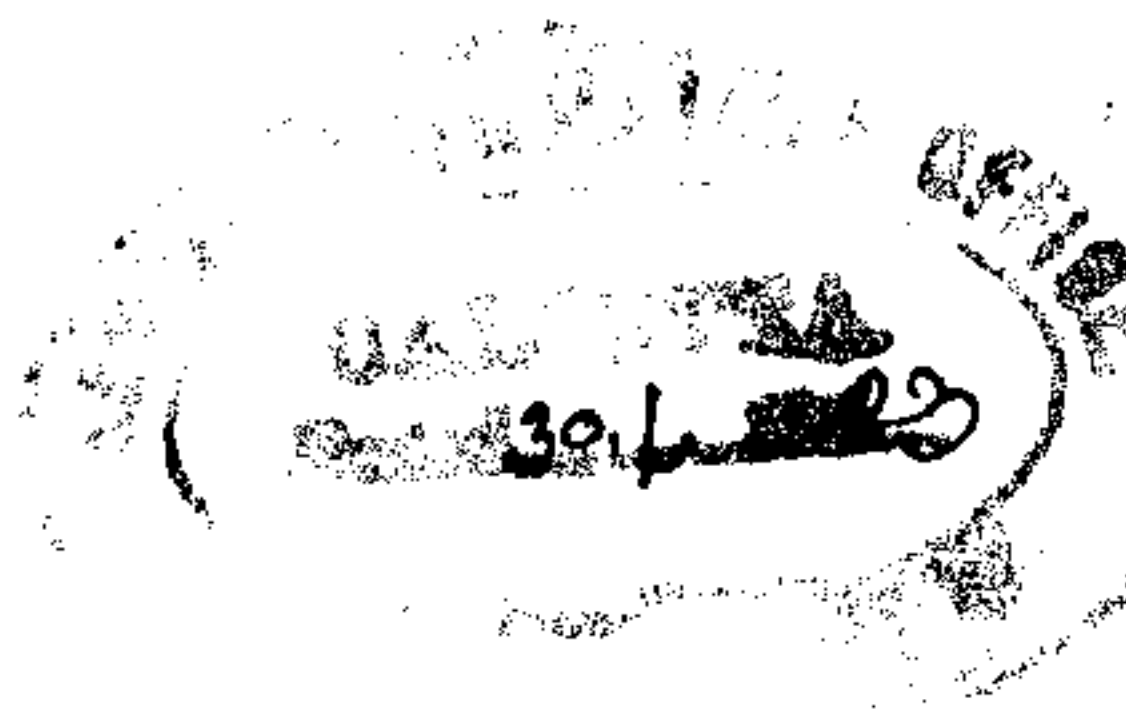
শ্রেয়সী

মাসিক পত্র

সম্পাদিকা—শ্রীকিরণবালা সেন

মূল্য, বার্ষিক সডাক ২৲ টাকা।

শ্রেয়সী

মাসিক পত্র

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্য মেত
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুর্ভবতি।
হীয়তেঽর্থাৎ য উ প্রেয়োবৃণীতে॥"

"শ্রেয়ঃ প্রেয় সবাইকে পায়।
দেখে' বেছে' ল্যায়, যে যেটা চায়॥
যে ল্যায়, শ্রেয়—সে পায় কূল।
যে ল্যায়, প্রেয়—খোয়ায় মূল॥"

কঠোপনিষদ্।
১ম অধ্যায়, ২য় বল্লী।

১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা।

পৌষ, ১৩২৯ সাল

নারীজাতির প্রকৃতিসুলভ জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি।*

নারীজীবনের উন্নতি সাধন করিতে হইলে নারী প্রকৃতির বিশেষত্ব কিরূপ তাহাই সর্ব্বাগ্রে ভাবিয়া দেখা উচিত। পতির প্রতি প্রেম, পুত্র কন্যা ও দাসদাসীগণের প্রতি স্নেহ মমতা, গুরুজনের প্রতি ভক্তি এবং দেব ভক্তি এই সকল হৃদয়ের সামগ্রীতেই নারী প্রকৃতির আপাদমস্তক পরিগঠিত। কিন্তু কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই একদিকে যেমন হৃদয়ের সম্বল যথোচিত পরিমাণে থাকা আবশ্যক আর একদিকে তেমনি জ্ঞানের সম্বলও তাহার সহিত যথোচিত পরিমাণে মিশ্রিত থাকা আবশ্যক।

নারীর প্রকৃতি যেমন হৃদয়ের উপাদানে পরিগঠিত পুরুষের প্রকৃতি তেমনি জ্ঞানের উপাদানে পরিগঠিত। দুইয়ের এই দুইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির উপরে ভর দিয়াই নরনারীর বিশেষত্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

হৃদয়ের মায়ামমতা নারীর স্বভাবসুলভ ধর্ম্ম হইলেও তাহাতে তাহারা একান্ত অন্ধভাবে আসক্ত হইয়া না পড়ে এজন্য তাহার উপরে জ্ঞান জ্যোতিকে সাধ্য সাধনা করিয়া আনিয়া হৃদয় মন্দির হইতে মোহান্ধকার সরাইয়া ফেলিতে হইবে।

* পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নারীগণের প্রতি উপদেশ। শ্রীযুক্ত হেমলতা দেবী লিখিত।

জ্ঞানালোককে অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়া হৃদয়ের মধ্যে বসাইতে হইলে গুরুজনদের প্রতি ভক্তির দ্বার বিধিমতে উন্মুক্ত রাখা চাই। ভক্তি জ্ঞানে পৌছিবার দ্বার বলিয়াই একনিষ্ঠ প্রীতি প্রেমকে আমাদের দেশে পতিভক্তি শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে হৃদয়বৃত্তি এক ধাপ উপরে উঠিয়া যায়। নারীজাতির প্রকৃতি সুলভ জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে হইলে তিনটি সোপানের ধাপ মাড়াইয়া ক্রমে২ উপরে উঠিতে হয়। সকলের নীচের ধাপ পুত্র কন্যার প্রতি স্নেহ মমতা, তাহার একধাপ উপরে পতিভক্তি আর একধাপ উপরে গুরুজনভক্তি এই তিন ধাপ মাড়াইয়া, গুরুজনভক্তির মধ্য দিয়া জ্ঞানদ্বারে পৌছাইতে হইবে এবং হৃদয়ের স্নেহ মমতা ও প্রীতিভক্তিকে সেই জ্ঞান দ্বারা পরিমার্জ্জিত করিয়া পরম পরিশুদ্ধ মঙ্গলভাবে পরিণত করিতে হইবে। এবং এই উপায়ে যে নারী যে পরিমাণে ভগবদ্‌ভক্তি উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন সেই পরিমাণে তাহার নারীজীবনের সর্ব্বাঙ্গীন সার্থকতা হইবে।

অজানা দেশ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[Mrs galtyr Parabels form nature হইতে অনূদিত]

টুনটুনীর ছানা তার ছোট বোনটীর কথা শুনে বল্লো "সেই অজানা দেশের গান আমাদের মায়ের মুখে শুনে শুনে তোমার মনে হচ্ছে যেন তোমার হৃদয়ে সে বাণী পৌঁচছে। আসলে এ সবই তোমার কল্পনা! আমিও যদি দিনরাত তোমার মতন বসে বসে সেই অজানা দেশের কথাই ভাবি, তাহলে আমারও মনে হবে যে সে বাণী আমার হৃদয়ে পৌঁচচ্ছে। কিন্তু আমি তো আর তোমার মতন ছেলেমানুষ নই যে মা যা বোঝাবেন তাই বুঝবো। আমি সে দেশের কথা ভাবতেও চাই না আর সে দেশে যাবার ইচ্ছেও কোনদিন আমার হবে না।" নীড়ের বাইরে ছায়ায় বসে টুনটুনী তার ছানাদের সব কথা শুনলো। তার মনে ভারি দুঃখ হ'লো। সে কিছু না বলে, নীরবে শুধু অজানা দেশেরই গান গেয়ে চল্লো। গানের শেষে সে বলে উঠলো "শান্তি নেই, এ দেশে শান্তি পাবে না।" টুনটুনীর সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গীটীও বলে উঠলো "নেই নেই এদেশে শান্তি নেই।" নীড়ের মধ্যে তাদের ছোট ছোট ছানাগুলিও গেয়ে উঠলো "নেই, এখানে শান্তি নেই।" তখন যে ছানাটির মন অল্পক্ষণ আগে সন্দেহের দোলায় দুলছিল, তারও মনে হলো তার অন্তরের ভেতর থেকে কে যেন গেয়ে উঠলো "নেই এখানে শান্তি নেই।" টুনটুনী গেয়ে চল্লো "এখানে শান্তি নেই, আরাম নেই। দেখছো না, এখানে শান্তি পাবে না বলেই তো নদীটা কুলকুল করে কোন এক অজানা দেশের উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে। মেঘগুলো আকাশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ভেসে চলেছে, স্থির হয়ে বসে তারা শান্তি পাচ্ছে না বলেই' তো? বায়ু ছুটে চলেছে কোন এক অজানা দেশের উদ্দেশ্যে শান্তির আশায়। নদী, বায়ু, মেঘ, সবাই আর এক দেশের উদ্দেশ্যেই ছুটে চলেছে, এদেশে তাদের শান্তি নেই স্থান নেই বলে। বাছা তোমরা সব মনে বল সঞ্চয় কর, বুকে আশা বাঁধো, যখন সময় আসবে আমরাও যেন সেই দেশের উদ্দেশ্যেই উড়ে যেতে পারি।" টুনটুনীর কথা শেষ হলে তার ছানাটির মন থেকে সব সন্দেহ দূর হয়ে গেলো। সে বল্লো "মাগো কোথায় তোমার সে দেশ? আর আমি তোমার কথায় অবিশ্বাস করবো না; আমায় নিয়ে চল তোমার সেই অজানা দেশে।"

অজানা দেশের কল্পনায় টুনটুনীর আর তার ছানাদের হৃদয় যখন একেবারে পূর্ণ, সেই সময় তাদের অজ্ঞাতসারে শরৎ এসে সেই নদীর কিনারার ছোট বনটীতে দেখা দিল।

শরতের এক পশলা বৃষ্টি এসে মাঝে মাঝে টুনটুনীর বাসাকে ভিজিয়ে দিয়ে যেতো। কিন্তু টুনটুনী আর তার ছানাগুলির মন তখন সেই অজানা দেশের চিন্তায় এমনি পরিপূর্ণ যে সে সব তাদের কিছুই খেয়ালে এলো না। এমনি করে দিন যায়। একদিন টুনটুনি তার ছানাগুলিকে নিয়ে আহার্য্য সংগ্রহ করতে বেড়িয়েছে। ক্রমে টুনটুনী তার ছানাগুলিকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে যেখানে তার সঙ্গীটী ধান থেকে খুদ খুঁটে খাচ্ছিল সেইখানে উড়ে চলে গেলো। গুরু গুরু মেঘের গর্জ্জনে ছানাদের হঠাৎ চমক ভাঙ্গতেই তারা আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে কাল মেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন। ছোট নদীর তীরটিকে কাঁপিয়ে দিয়ে, 'বজ্র,' গম্ভীর নিনাদে গর্জ্জন করে উঠলো। টুনটুনীর ছানারা তাদের ছোট নীড়টিতে আশ্রয়ের আশায় উড়ে চল্লো। বৃষ্টির পশলা এসে তাদের নীড়টিকে শুধু ভিজিয়েই দিয়ে যেতো। আজ ঝড়ের প্রচণ্ডবেগ তাদের বাসার খড়কুটো হাওয়ার মুখে উড়িয়ে নিয়ে গেল। তবু সেই ভাঙ্গা নীড়টীতেই গুড়ি সুড়ি মেরে ছানারা সেই ভীষণ রাত্রিটা কাটিয়ে দিলো। ভোরের আলোর সঙ্গে চোখ মেলে তারা চেয়ে দেখলো তাদের মা বাপ তো নেই! টুনটুনীর ছানারা উড়ে চল্লো তাদের মায়ের সন্ধানে! কত গাছপালা কত বনজঙ্গল পার হয়ে তারা মায়ের সন্ধানে চল্লো। কত ক্লান্তি কত অবসাদ! তাদের আদরের মা, ভোর না হতে যার মিষ্টি গলার স্বরে নীড়টী মুখর হয়ে উঠে, তাদের সে মা আজ কোথায়! কোথায় তাদের চিরকালের সেই ছোট্ট টুনটুনী মা-টী! অনেক সন্ধান হলো। টুনটুনীর ছানারা ক্লান্ত হয়ে যখন বাসায় ফিরছে তখন দেখলে কাঁটার বেড়ার ঝোপে তাদের মা, বাবা পড়ে আছে। তাদের বুড়ো বাপ ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে, প্রচণ্ড আঘাত সইতে না পেরে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু তাদের মায়ের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর না হওয়ায় অল্প অল্প জ্ঞান তার তখনও আছে। তাদের মা-টীও যে তাদেরছেড়ে পালাবার আয়োজন করছে টুনটুনীর ছানারা তা বুঝতে না পারলেও, টুনটুনী সে কথা স্পষ্টই বুঝতে পারলো। ছানাদের দেখেই টুনটুনী তার চোখ দুটী মেলে ক্ষীণকণ্ঠে বল্লো "যাও যাও বাছা তোমরা সেই অজানা দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাও। যে বাণী যুগযুগ ধরে আমাদের জাতির প্রত্যেকে অনুভব করে এসেছে সেই বাণী আজ তোমাদের হৃদয়ে জেগে উঠেছে। অবিশ্বাস করো না! বুকে আশা বেঁধে, যাও সব সেইদেশে উড়ে যাও।" টুনটুনীর কথা শেষ হতেই তার ছোট্ট ছানাটি বলে উঠলো "কিন্তু মাগো বাবা যাবে না? আর তুমি? তুমিও কি আমাদের সঙ্গে যাবে না?" টুনটুনী বল্লো, কেঁদোনা বাছা, আমরা সে দেশে তোমাদের সঙ্গে গিয়ে মিলতে পারবো না জানি। কিন্তু আমরা যে দেশে চলেছি সেখানে হয়তো আরেকটি অজানা দেশের সন্ধান মিলবে।" এই বলে টুনটুনী তার মাথাটি বুকের উপর রেখে তার ছানাদের ছেড়ে চলে গেলো কোন এক অজানা দেশে, সে দেশের সন্ধান টুনটুনীর ছানাদের মোটেই জানা ছিল না।

ভোর বেলা। সূর্য্য সবে মাত্র পূবদিকের মেঘের আবরণ ভেদ করে অল্প অল্প দেখা দিয়েছে, সেই সময় টুনটুনীর ছানারা তাদের অত আদরের নীড়টী ছেড়ে উড়ে চল্লো কোথায় কোন দেশের উদ্দেশ্যে তার কিছুই তারা জানলো না বুঝলো না; কিন্তু ছানাদের মনে একবারও সেই অজানা দেশ সম্বন্ধে কোন রকম সন্দেহ জেগে উঠলো না। তাদের মনে যে তখন কত আশা! সেই অজানা দেশে তাদের মা বাপের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে। কিন্তু তাদের আশা যখন নিরাশায় পরিণত হলো তখন টুনটুনীর ছোট্ট ছানাটী বল্লো "আমরা যে অজানা দেশে এসে পড়েছি, নিশ্চয়ই এর চাইতেও সুন্দর একটী অজানা দেশ কোথাও না কোথাও আছেই আছে; সেইখানেই আমাদের মা বাপ চলে গিয়েছে।"

সমাপ্ত।

শ্রীমালতী সেন

কলাবিদ্যা

(শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইংরাজি লেখা হইতে অনুবাদ)।

বিজ্ঞানের জগতে ব্যক্তিত্বের কোন স্থান নাই, ব্যক্তিগত জিনিষকে সেথান হইতে সযত্নে সরানো হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের জগৎকে আমাদের অনুভূতির দ্বারা আমরা কোথাও স্পর্শ করিতে পারি না। কিন্তু অন্য দিকে আর একটি যে বৃহৎ জগৎ আছে যেটা আমাদের ব্যক্তিত্বের জগৎ—তাহাকে আমরা যে কেবল মাত্র জ্ঞানের দ্বারা জানি তাহা নয়, তাহাকে আমরা হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করিয়াও থাকি এবং সেই অনুভূতির সাহায্যে আমরা প্রত্যেকে আপনাকেই উপলব্ধি করি। আমাদের অস্তিত্ব না থাকিলেও যে জগৎটা থাকিয়া যায় তাহাই বিজ্ঞানের জগৎ, কিন্তু আমরা যদি না থাকি তবে সে জগতের কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকে না তাহাই আর্টের জগৎ। একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে—আর্ট বলিতে আমরা কি বুঝি? এসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিয়াছেন। কিন্তু এই সকল আলোচনা আর্টের ক্ষেত্রে একটি সচেতন অভিপ্রায়ের ভাবকে আনিয়া ফেলিতেছে, যদি সে ক্ষেত্রে আমাদের সৃজনী শক্তি এবং রসোপলব্ধি স্বতউচ্ছ্বসিত এবং অস্ফুটচেতন ভাবেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কলাসৃষ্টিকে কি ভাবে বিচার করিতে হইবে সে সম্বন্ধও আমরা নানা প্রশ্ন করিতে সুরু করিয়াছি। কোন আর্ট সর্ব্বজনবোধগম্য কিনা, এই ভিত্তির উপর কি তাহার বিচার হইবে? কিম্বা তাহার মধ্যে আমরা কোন তত্ত্বের আভাস পাই কিনা ইহাই লইয়া তাহার মূল্য নিরূপণ করিব? অথবা বর্ত্তমান জগতের সমস্যা সে কতখানি পূরণ করিতে পারিল, ইহার দ্বারা তাহার তারতম্য স্থির করিতে হইবে? কিম্বা আর্ট স্রষ্টা যে জাতির অন্তর্গত, সেই জাতির বিশিষ্ট প্রতিভা আর্টে প্রকাশ পাইল কিনা এই দিক হইতে আর্টের বিচার হইবে? অতএব, মানুষ যখন এমন কোন মান দণ্ডের দ্বারা আর্টের মূল্য যাচাই করিবার চেষ্টা করিতেছে যে মান দণ্ডটা বাহিরের, আর্টের ভিতরকার জিনিস নয়,—অর্থাৎ যখন খালের দিক হইতে নদীর গৌরবের বিচার চলিতেছে, তখন এ প্রশ্নটাকে আর তুচ্ছ করা চলে না। এ সম্বন্ধে আলোচনায় আমাদিগকে যোগ দিতে হইল।

তবে কি আর্টের একটা সংজ্ঞা নিরূপণ দিয়া সুরু করিব? কিন্তু যে বস্তুর বৃদ্ধি আছে তাহার সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে গেলে আমাদের দৃষ্টিকে কোন একটা জায়গায় বদ্ধ করা দরকার হয়, কেন না তাহা না হইলে কিছুই পরিষ্কার করিয়া দেখা যায় না। সুস্পষ্টতাই ত সত্যের একমাত্র কিম্বা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দিক্ নয়। বুলস্-আই লণ্ঠনের দৃষ্টি স্পষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাকেই সমগ্র দৃষ্টি বলিতে পারি না। যেমন ধর, যদি একটা ঘূর্ণ্যমান চাকার সংজ্ঞা দিতে হয় তবে সব গুলিকে গণিতে না পারিলে কিছুই আসে যায় না। কারণ, চাকার গড়নের খবরের চেয়ে তার গতির খবরটাই যেখানে বেশী প্রয়োজনীয় সেখানে তার একটা অসম্পূর্ণ সংজ্ঞাতেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। জীবন্ত বস্তু মাত্রেই তার পরিবেষ্টনের সঙ্গে দূরবিস্তৃত নানা সম্বন্ধ সূত্রে জড়িত থাকে। সেই সূত্রগুলির অধিকাংশই আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া যায়। সুতরাং গাছের সংজ্ঞা দান করিবার উৎসাহে আমরা যদি গাছটার শিকড় ও শাখাগুলিকে কাটিয়া কুটিয়া তাহাকে একটা গুঁড়িতে পরিণত করি তবে সেটাকে ক্লাস হইতে ক্লাসে গড়াইয়া লইয়া যাওয়া সহজ হয় বটে এবং পাঠ্যপুস্তকের পক্ষে সেটা বেশ কাজের জিনিষও হয়। কিন্তু সেই গুঁড়ি জিনিষটাকেই অত্যন্ত স্পষ্ট দেখিতেছি বলিয়াই একথা বলিতে পারি না যে গুঁড়ির মধ্যেই গোটা গাছটাকেই আমরা সত্য করিয়া দেখিতেছি।

অতএব আমি আর্টের কোন সংজ্ঞা দিব না। শুধু আর্টের অস্তিত্বের কারণ কি সেই সম্বন্ধেই আমি প্রশ্ন করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব, যে, আর্ট জিনিষটা কোন শুভকর সামাজিক অভিপ্রায় হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে না আমাদের সৌন্দর্য্য উপভোগের উপকরণ জোগাইবার জন্যই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, কিম্বা আমাদের আত্মপ্রকাশের কোন অনির্ব্বচনীয় আবেগ হইতেই ইহার সৃষ্টি? আর্টের জন্যই আর্ট (Art for art's sake) এই কথাটা লইয়া একটা লড়াই চলিতেছে। একদল পাশ্চাত্য সমালোচকের কাছে এই কথাটা এখন আর আমল পায়না বলিয়া বোধ হইতেছে। এটা পিউরিট্যান যুগের ভোগবিমুখ আদর্শের পুনরাবৃত্তির একটা চিহ্ন, সে যুগে ভোগটাকে একটা চরম জিনিষ মনে করা পাপ বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু পিউরিটান নীরসতার আদর্শমাত্রেই একটা প্রতিক্রিয়া হইতেই উদ্ভুত হইয়া থাকে, সত্যকে তাহা স্বাভাবিক দিক্ হইতে প্রকাশ করে না। যখন জীবনের সঙ্গে রসভোগের অব্যবহিত যোগ থাকে না এবং রসোপলব্ধি বিচিত্র কলাসংস্কারের জালে আচ্ছন্ন হইয়া অদ্ভুত রুচি ও কল্পনার প্রাচুর্য্য ঘটাইতে থাকে, তখন একটা বৈরাগ্যের আহ্বান উপস্থিত হয় এবং তাহা আনন্দকেও একটা ফাঁদ মনে করিয়া বাদ দিবার চেষ্টা করে। আমি অবশ্য বর্ত্তমান য়ুরোপীয় আর্টের ইতিহাসের আলোচনায় যাইতে ইচ্ছা করি না। কারণ তাহা আলোচনা করিবার অধিকার আমার নাই। কিন্তু আমি ইহা সাধারণ সত্যের হিসাবে নিশ্চিত বলিতে পারি যে, কোন মানুষ যখন তার আনন্দ পাইবার ইচ্ছাকে আপনিই বাধা দেয় এবং সেই ইচ্ছাটাকে তাহার জ্ঞানলাভের ইচ্ছা কিম্বা মঙ্গলসাধনের ইচ্ছায় পরিণত করিবার চেষ্টা করে, তখন তার কারণ নিশ্চয়ই এই যে সেই মানুষের আনন্দ অনুভব করিবার শক্তি আর তার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যে প্রতিষ্ঠিত নাই।

প্রাচীন ভারতের আলঙ্কারিকেরা একথা বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই যে, রসই সাহিত্যের প্রাণ—অবশ্য যে রস নিরাসক্ত। কিন্তু রস কথাটাকে বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। কারণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে সূর্য্যালোক বিশ্লেষণের মত দৃশ্য ও অদৃশ্য ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে, ইহার নানা বিচিত্র বর্ণ ও বিচিত্র গতির অন্তহীন রশ্মিপর্য্যায় উদ্ঘাটিত হয়।

আর্টে যে সকল উপকরণ দেখা যায় সেগুলি বিশিষ্টভাবে তারই নিজস্ব জিনিস। সেখান হইতে যে আলো বিকীর্ণ হয় তার একটা বিশেষ ব্যাপ্তি আছে ও গুণ আছে। সেই বিশিষ্টতাটা কি তাহাই বাহির করা, সেই বিশিষ্টতার স্বরূপ এবং ইতিহাস আবিষ্কার করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

মানুষের সঙ্গে পশুর সব চেয়ে বড় পার্থক্য এইখানে যে পশু তার প্রয়োজনের সীমার মধ্যেই প্রায় আবদ্ধ থাকে এবং প্রধানতঃ আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার জন্যই তাকে কাজ করিতে হয়। খুচরা বিক্রয়কারী দোকানদারের মত জীবনের ব্যবসাতে তার লাভের অংশ বিশেষ কিছুই থাকে না এবং ব্যাঙ্কের সুদ জোগাইতেই সমস্ত উপার্জ্জনই নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু জীবনের বাণিজ্যক্ষেত্রে মানুষ যে বড় মহাজন। যাহা তাহাকে নিতান্তই বাধ্য হইয়া করিতে হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী সে উপার্জ্জন করে। মানুষের জীবনে তাই সম্পদের একটি প্রাচুর্য্য আছে, সেই প্রাচুর্য্য থাকার জন্যই মানুষের যথেষ্ট পরিমাণে অকেজো ও দায়িত্বহীন হইবার স্বাধীনতাও আছে। তার প্রয়োজনের সীমানার চতুর্দ্দিকে বড় বড় ফালতো জমি পড়িয়া আছে এবং মানুষ সেখানে যে সকল উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করে সেগুলি আপনার মধ্যেই আপনি পর্য্যাপ্ত। পশুদের জ্ঞান থাকা চাই, কারণ সেই জ্ঞানকে তাহাদের জীবনের বিবিধ প্রয়োজনে প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু সেই পর্য্যন্তই তাহাদের জ্ঞানের সীমানা। তাহাদের চতুর্দ্দিকে কি আছে না আছে প্রথমতঃ সেটা তাহাদের জানা চাই, কারণ তাহাদিগকে আশ্রয় খুঁজিয়া লইতে হইবে এবং খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। তারপর বাসা তৈরী করিতে গেলে দ্রব্যাদির গুণাগুণ তাহাদের জানা চাই এবং ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর পরিবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইতে গেলে ঋতুগুলির কতক কতক চিহ্ন তাহাদের জানা চাই।

জীবনধারণ করিবার জন্য এসকল জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন একটি বাড়্তি ভাগ আছে, সেখানে সে গর্ব্বের সঙ্গে এই কথা বলিতে পারে যে, জ্ঞান জ্ঞানেরই জন্য। কারণ সেখানে সে জ্ঞানের একটি বিশুদ্ধ রস উপভোগ করিতেছে, কেননা সেখানে জ্ঞান মানেই মুক্তি। বস্তুতঃ এই বাড়তি অংশের উপরেই মানুষের বিজ্ঞান ও দর্শন উন্নতি লাভ করিয়া আসিতেছে।

তারপর পশুদিগের মধ্যে কিছু পরিমাণে পরার্থপরতাও আছে। পিতা মাতা হইতে গেলে পরার্থপরতার দরকার হয়। দল বাঁধিয়া যারা বাস করে কিম্বা মৌমাছির মত চাক বাঁধিয়া যারা বাস করে তাদের দলের জন্য বা চাকের জন্যও কিছু পরিমাণে পরার্থপরতা চাই। বস্তুতঃ বংশরক্ষার জন্যই এই পরার্থপরতার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মানুষের মধ্যে পশুর চেয়ে যথেষ্ট বেশী পরিমাণে স্বার্থশূন্যতা দেখা যায়। যদিচ তাকে ভাল হইতে হয়, কারণ তার ভাল হওয়াটা তার স্বজাতির পক্ষেও বিশেষ দরকার—কিন্তু মানুষ সেটুকু সীমাকে অতিক্রম করিয়া বহু দূরে চলিয়া যায়। মানুষের মঙ্গল-শক্তি তার নৈতিক জীবনটাকে কোন গতিকে যাপন করিবার জন্য একটা বরাদ্দ মাত্র নয়—তাঁর এতটাই প্রাচুর্য্য আছে যে মানুষ একথা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারে যে মঙ্গল মঙ্গলেরি জন্য। মানুষের মঙ্গল শক্তির এই সম্পদের উপরেই মানুষের ধর্ম্মনীতিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেইজন্য মানুষের পক্ষে সততাটা উত্তম কৌশল বলিয়া মূল্যবান বস্তু নয়, কিন্তু সততা সকল কৌশলের বিরুদ্ধেও অনায়াসেই যাইতে পারে বলিয়াই তাহা মানুষের কাছে মূল্যবান।

মানুষের মধ্যে এই যে প্রাচুর্য্য, ইহারই উপর আমাদের সভ্যতার ভিত্তি এবং ইহাই নানাবিষয়ে সুবিধার খাতিরে একত্র সম্মিলিত পশু সমাজের চেয়ে মানব সমাজকে অনেক বেশী বড় করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের জীবন প্রতিনিয়ত তার প্রাচুর্য্যে আপনাকে আপনি ছাপাইয়া উঠিতেছে। নানাবিধ কর্ম্মের ভিতর দিয়া নিজের সেই আতিশয্যকে প্রকাশ করা ছাড়া জীবনের আর অন্য কোন উদ্দেশ্য দেখি না। যখনই তার এই প্রাচুর্য্যের বন্যা বাধা পায়, তখনই সে ক্রমশঃ মৃত্যুর মধ্যে নিমগ্ন হইতে থাকে।

এই প্রাচুর্য্যের ক্ষেত্রেই আর্ট আর্টের জন্য এই আইডিয়াটারও উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব যে শক্তির আতিশয্য হইতে আর্ট-সৃষ্টির উদ্ভব হয়, সেই শক্তিটা কি তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করা যাক্। যাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয় তাহা আমাদের বাহিরে থাকে তাহা যেন বাহিরের অপরিচিত ব্যক্তির মত। তার দুইটি মাত্র দিক আছে একটি দিক্ সে নিজে স্বয়ং—আর একটা দিকে বিশ্বনিয়ম সূত্রে অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ের সহিত তার সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ সে যেন সমতলের উপরে একটি রেখার মত। কিন্তু সেই জ্ঞানের বিষয় যখনি আমাদের অনুভূতির জিনিষ হইয়া উঠে, তখনি তাহা একটা গভীরতা পায়—আমাদের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্বন্ধটাই সেই গভীরতার কারণ। তখন তার আর দুটি মাত্র দিক্ নয়, তিন দিকেই তার প্রকাশ। একদিকে সে আপনাতে আপনি, দ্বিতীয় দিকে সে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত, তৃতীয় দিকে সে আমাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধে যুক্ত। উদ্ভিদ তত্ত্ব হিসাবে ফলকে জানিতে গেলে ব্যক্তিগত দিক হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়াও তাকে জানা যায়, কেননা তখন ফলটা তিক্ত কি মিষ্ট, সুখকর কি অন্য কিছু তাহা জানিবার দরকার করে না। কিন্তু ফলকে যখন আমরা অনুভব করি, তখন ফলইত শুধু একমাত্র বিষয় নয়, আমরাও সেখানে প্রধান বিষয় হইয়া দাঁড়াই।

আমরা যখন জ্ঞানের জগতে আসি, তখন সেখানে আমরা আমাদের নানা প্রশ্নের উত্তর পাইবার চেষ্টা করি। কিন্তু অনুভূতির জগৎ যে সব বিচিত্র খবর আমাদের হৃদয়ের কাছে পৌঁছাইয়া দেয়, আমাদের হৃদয় তার অনুরূপ সাড়া দিবে এইত তার দাবী। জন্তুদিগের মধ্যে এই সাড়াটা সহজ এবং ক্ষণিক; খানিকটা চিৎকার করিয়া দৌড়াইয়া গান করিয়া নাচিয়া তারা ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। কেননা, তাদের অনুভূতির অতিপ্রাচুর্য্য নাই, যাহা থাকিলে মনের ভাব বিচিত্র কলা-সৃষ্টিতে সহজেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে।

কিন্তু মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ব যখন সেই গভীর তল পর্য্যন্ত নাড়া পায় যেখানে তার অনুভূতি বিশ্বকে স্পর্শ করে এবং বিশ্বব্যাপী হইয়া উঠে, তখনি বিশ্বের আঘাতে তার হৃদয়াবেগ এমন রূপের ভিতর দিয়া আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা করে যে রূপ স্থায়ী এবং পরিপূর্ণ। সেই স্থায়ী এবং পরিপূর্ণ রূপগুলিই মানুষের আর্ট-সৃষ্টি।

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, যখন মানুষের অখণ্ড চৈতন্যের নিবিড়তা তার সমস্ত ব্যক্তিত্বকে প্রদীপ্ত করিয়া তোলে, তখন সেই অখণ্ড ব্যক্তিত্বের আত্ম-প্রকাশের উৎস হইতেই আর্ট উৎসারিত হয়।

একজন যোদ্ধা যে কেবল যুদ্ধটা প্রয়োজনীয় বলিয়া লড়াই করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে তা নয়। তার যোদ্ধৃত্বের সমুচ্চ চৈতন্যকে সঙ্গীত ও সাজ-সজ্জার সাহায্যে তাকে প্রকাশ করিতেও হয় এবং সেই প্রকাশটা যে যুদ্ধ হিসাবে কেবলমাত্র অপ্রয়োজনীয় তা নয়, কোন কোন সময় আত্মঘাতশীল ও হইয়া পড়ে।

তেমনি যে মানুষের মধ্যে প্রবল ধর্ম্ম-ভাব আছে, সে যে কেবল একান্ত মনে তার দেবতার আরাধনা করে তা নয়; তার ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশের জন্য পূজার-মন্দিরের ঐশ্বর্য্য এবং বিচিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং ক্রিয়া কলাপ কামনা করিয়া থাকে। দারিদ্র্যের অবস্থায় আমাদের সমস্ত মনোযোগ আমাদের বাহিরে অর্থাৎ আমাদের অভাব মোচনের জন্য যে বস্তুগুলি আমাদিগকে আহরণ করিতেই হইবে সেইগুলির উপরে নিবদ্ধ হয়। কিন্তু সম্পদের অবস্থায় যখন আমাদের ঐশ্বর্য্য আমাদের প্রয়োজনকে বহুদূরে ছাড়াইয়া যায় তখন তার আলো আমাদের উপর প্রতিফলিত হয়। তখন আমাদের মনে এই আনন্দ উচ্ছ্বাস জাগে যে, আমরা ধনী এবং নানা ব্যয়সাধ্য ক্রিয়ার মধ্য দিয়া সেই ধনিত্বকে প্রকাশ করিবার জন্য উৎসুক হই। সুতরাং আর্টে মানুষ আপনাকেই প্রকাশ করিতেছে, আপনার বস্তুকে নয়। বিজ্ঞানের গ্রন্থ অথবা বিবিধ সংবাদপূর্ণ পুস্তকে বস্তুর খবর মেলে, কেননা সেখানে যে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপেই আত্মগোপন করিতে হয়।

আমি জানি যখন আমি ব্যক্তিত্ব কথাটা ব্যবহার করিয়াছি তখন আমি বিনা প্রতিবাদে পার পাইব না কারণ এই ব্যক্তিত্ব কথাটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই রকমের কতকগুলি ঢিলাঢালা কথা আছে, যেগুলি শুধু যে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের আইডিয়ার মাপসই হয় তা নয়, ভিন্ন ভিন্ন আকারের আইডিয়ারও উপযুক্ত বাহন হয়। এই কথাগুলি যেন হলে ঝোলান বর্ষাতির মত, যে কোন অন্যমনস্ক ব্যক্তিই ইহাদের যে কোনটাকে টানিয়া লইয়া গেলেই হইল। আমি বলিয়াছি যে—জ্ঞাতা হিসাবে মানুষের সম্পূর্ণতা নাই, কেননা কেবলমাত্র নানা বিষয়ে জ্ঞান ত আর আসল মানুষটাকে প্রকাশ করে না, কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে মানুষ অখণ্ড সম্পূর্ণ মানুষ বটে। তখন সে আপনার অন্তর্নিহিতশক্তি দ্বারা আপনার চতুর্দ্দিক হইতে নানা জিনিষকে বাছিয়া লইয়া, তাহাদিগকে বিশেষ ভাবে আপনার জিনিষ করিয়া তোলে। তার ভিতরকার আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণ শক্তির যোগে সে কেবল বিচিত্র জিনিষকে স্তূপীকৃত করে না, সে তাহাদিগের সাহায্যে সৃজন করে। অতএব যে সকল সৃজনী শক্তি বাহিরের বস্তুকে আমাদের অংশরূপে পরিণত করিয়া তুলিতেছে, সেগুলি আমাদের অনুভূতির শক্তি। যেমনতর, মানুষ যেখানে আধ্যাত্মিক সেখানে সে পূর্ণভাবেই ব্যক্তি; কিন্তু সেখানে সে শুধু ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ যেখানে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পূরো নয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে তার অনুভূতি সৃজনক্ষম বটে কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে তার কেবলমাত্র জ্ঞান তার সমস্ত সত্তার অন্তর্ভূত হয় না, কারণ সেখানে যে অনুভূতির আগুন নাই।

এখন তাহা হইলে চিন্তা করিয়া দেখা যাক যে ব্যক্তিত্ব জিনিষটার মধ্যে কি কি বস্তু আছে এবং তার সহিত বাহিরের জগতের সম্বন্ধটাই বা কি রকমের? এই জগৎ আমাদের কাছে ব্যক্তিগতরূপেই প্রতিভাত হয়, কতকগুলি অদৃষ্ট শক্তির সমষ্টিরূপে নয়। অবশ্য সকলেই জানেন যে এজন্য এই জগৎ আমাদের মন এবং ইন্দ্রিয়ের কাছেই যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী। কারণ এই প্রাতিভাসিক জগৎই মানুষের জগৎ। মানুষের ইন্দ্রিয়বোধের বিশেষ পরিসর এবং গুণ হইতেই এই

জগৎ তার আকৃতি বর্ণ এবং গতির বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। ইহা সেই জগৎ যাহাকে আমাদের সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়গুলি বিশেষ-ভাবে আমাদের জন্য আহরণ এবং সৃজন করিয়া তুলিতেছে, বিশেষ করিয়া প্রাচীরের দ্বারা ঘিরিয়া লইয়াছে। সুতরাং এই জগতে সব চেয়ে বড় শক্তি জড়বিজ্ঞান বা রসায়নের শক্তিগুলি নয়; মানুষের ইন্দ্রিয় শক্তিও ইহার অন্যতম শক্তি। কেননা এই জগৎটা জড়বিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের একটা অবিচ্ছিন্ন জগৎ নয়, ইহা সম্পূর্ণভাবে মানুষেরই জগৎ।

যদি এই জগৎ কেবল মাত্র মানুষের ইন্দ্রিয় বোধের ছাঁচে রূপান্তরিত হয় তবে ইহা তার মন এবং ইন্দ্রিয়ের আংশিক জগৎ হইয়াই থাকে; কিন্তু যখন এই জগৎ মানুষের অনুভূতির সীমানায় ধরা দেয়, তখনই ইহা সম্পূর্ণরূপে মানুষের জগৎ হয়। বস্তুত এই জগতের উপর আমাদের প্রেম, ঘৃণা সুখ, দুঃখ ভয় ও বিস্ময় অনবরত কাজ করিতে থাকে বলিয়া ইহা ক্রমশঃ আমাদের ব্যক্তিত্বের অঙ্গীভূত হইয়া উঠে। ইহা আমাদেরি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠে এবং আমাদেরি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। যত বেশী পরিমাণে এই জগতকে আমরা আত্মসাৎ করি, ততই আমরা বড় হই এবং যত কম পরিমাণে ইহাকে আত্মসাৎ করি ততই আমরা ছোট হই। সুতরাং জগতের মধ্যে যাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রসার বৃহৎ গভীর ও ক্রিয়াবান, তাঁরাই মহাত্মা ব্যক্তি। অতএব, আমাদের হৃদয়াবেগ জারক রসের মত এই বাহিরের ইন্দ্রিয়গম্য জগৎকে অনুভবগম্য আত্মীয় জগৎ রূপে পরিণত করিয়া তোলে। অন্যদিকে ফলের মত বাহিরের জগতেরও নিজের কতগুলি রস আছে; সেই রস আমাদের রসানুভূতিকেও উদ্রেক করিয়া দেয়।

সংস্কৃত অলঙ্কারে যাকে রস বলা হয় তার তাৎপর্য্য এই যে, বাহিরে যেমন কতকগুলি রস আছে তেমনি হৃদয়াবেগেরও কতকগুলি রস আছে—বাহিরের আঘাতে হৃদয়াবেগের সেই রস সাড়া দিয়া উঠে। সুতরাং অলঙ্কারের সূত্র অনুসারে কাব্য বলিতে রসাত্মক একটি বাক্য বা বাক্যসৃষ্টি বুঝায় এবং সেই রসাত্মক কাব্য আমাদের হৃদয়াবেগের রসকেও জাগাইয়া তোলে। কাব্য অনুভূতির দ্বারা জীবন্ত করিয়া আমাদের কাছে কতকগুলি আইডিয়াকে বহন করিয়া আনে এবং সেগুলি পুনরায় আমাদের জীবন-বস্তুর অন্তর্ভূত হইয়া দাঁড়ায়।

কেবল মাত্র কতকগুলি তথ্যের খবর দেওয়াকে সাহিত্য বলা যাইতে পারে না, কেন না সেই তথ্যগুলি আমাদের কোন অপেক্ষাই রাখে না,—তারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সূর্য্য গোল, জল তরল, আগুন গরম, এইরূপ তথ্যমালার পুনঃ পুনঃ পুনরুক্তি একেবারে অসহ্য। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় মানুষের চিরন্তন ঔৎসুক্য আছে, কারণ তাহাতে ত শুধু সূর্য্যোদয়ের তথ্যের খবরটা থাকে না, তথ্য ছাড়া আমাদের নিজেদের কথা যে থাকে এবং সেই আমাদের সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্যের কি কোন কালে বিরাম হইতে পারে? সেইজন্য উপনিষদ বলিয়াছেন—"ধন আমাদের প্রিয় সে কেবল তার নিজের জন্য নয়, কিন্তু আমরা ধনের মধ্য দিয়া আপনাদিগকেই পাইতে ইচ্ছা করি বলিয়া ধন আমাদের কাছে প্রিয়।" এই কথা বলিবার মানে এই যে—ধনের মধ্যে আমরা আমাদিগকেই উপলব্ধি করি এবং সেই জন্যই তাকে আমরা ভাল-বাসি। যে জিনিষ আমাদের অনুভূতিকে জাগায় তাহাই আবার আমাদের আত্মানুভূতিকে জাগায়। এ যেন বীণার তারের উপর আমাদের স্পর্শের মত—স্পর্শ যদি ক্ষীণ হয় তবে শুধু স্পর্শেরই অনুভূতি হয় মাত্র কিন্তু স্পর্শ যদি প্রবল হয় তবে তাহা সুররূপে আমাদের কাছে ফিরিয়া আসে এবং আমাদের চেতনাকে নিবিড় করিয়া তোলে।

কিন্তু কেবল মাত্র যাহাকে অনুভূতির দ্বারাই আমরা জানিতে পারি, আমাদের সেই ব্যক্তিত্বকে আমরা কেমন করিয়া প্রকাশ করিব? বিশ্লেষণের দ্বারা পরীক্ষার দ্বারা বৈজ্ঞানিক যাহা আবিষ্কার করেন, তাহা তাঁর পক্ষে জানানো সহজ! কিন্তু আর্টিষ্টের যাহা বলিবার আছে তাহা তো কেবল খবর দেওয়া বা ব্যাখ্যা করার দ্বারা তিনি প্রকাশ করিতে পারেন না। একটা গোলাপফুল সম্বন্ধে আমি কি জানি সে কথাটা বলিতে গেলে অত্যন্ত সাদা ভাষার দরকার হয়, কিন্তু গোলাপফুল সম্বন্ধে আমি কি অনুভব করি সে কথা

বলিতে গেলে তার ভাষা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেখানে তো তথ্য কিম্বা নিয়মের কারবার নাই—সেখানে যে স্বাদের কথা, এবং স্বাদ জিনিষটাকে স্বাদের দ্বারাই বোঝা যায়। সেইজন্য সংস্কৃত অলঙ্কারিকেরা বলেন কবিতায় সেই সকল কথাই ব্যবহার হয় যে সব কথার ঠিক রস বা স্বাদ আছে অর্থাৎ যে সব কথা শুধু কথাই কয় না কিন্তু মন্ত্রবলে ছবিও গানকে জাগাইয়া তোলে। কেন না ছবি ও গান কেবল মাত্র বাহিরের তথ্য নয়, তারা ব্যক্তিগত সত্য। তারা কেবল মাত্র তারাই নয় তারা আমরা ও আমাদেরি অন্তর্গত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রতিমা দেবী

হারাই ডোরাই

এক সওদাগর ছিল। তার একটি ছেলে একটি মেয়ে। এখন কিছুদিন পরে সওদাগর মরে গেল আর তার বউও মরে গেল। মরে যেতে সেই ছেলেটি আর মেয়েটি বল্‌লে দেখ ভাই এ বাড়ী আর আমাদের ভাল লাগে না। আমরা ভাইবোনে বনে যাই চল্। এই বলে ভাইটি আর বোনটি বনে গেল। বনে দিব্যি সব ফুল ফুটেচে। বোনটি তাই দেখে খুসী হয়ে বল্‌লে দাদা বেশ বন দেখে এসেচ। ভাই বল্‌লে তুই এখানে থাক্ আমি চারিদিক বেড়িয়ে দেখে আসি। বোন বল্‌লে আমিও যাব। ভাই বল্‌লে তুই কোথা যাবি? তুই এই গাছতলায় বসে থাক্। এই বলে ভাইটি বেড়াতে চলে গেল।

বোনটি আপ্‌নার করেচে কি ভালভাল ফুল তুলে মালা গেঁথেচে। মালা গেঁথে বসে আছে—আর ভাব্‌চে দাদা এলে পরে তার গলায় পরিয়ে দেব। তারপর ভাইটি বেড়িয়ে এল। আসতেই বোনটি সেই ফুলের মালা আদর করে তার দাদার গলায় পরিয়ে দিল। যেমনি দেওয়া আর অমনি ভাইটি হরিণ হয়ে বনে দৌড়ে চলে গেল।

সেইখানে বসে মেয়েটি ভাইয়ের শোকে কাঁদতে লাগ্‌ল। হায় হায় কি হল? ভাইটি হরিণ হয়ে গেল! আমি তো জানিনা, কি করবো! এখন এক বাদশার পুত্তুর সেইবনে শিকার করতে গিয়েছিলেন। শিকার করতে করতে দেখেন এক পরমাসুন্দরী মেয়ে বসে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কে? মেয়েটি আর কথা কয়না। রাজপুত্তুর বল্‌লেন তোমার বিয়ে হয়েচে? মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বল্‌লে না। বাদশার ছেলে ভাবলেন নিয়ে যাই একে বাড়ী, বলে তাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে বিয়ে করলেন। সকলেই বল্‌লে মেয়েটি পরমাসুন্দরী, কিন্তু কথা কয়না কেন?

কিছুদিন পরে বাদশার পুত্তুরের একটি ছেলে হল। ছেলের ভাতের সময় সকলে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলে তোমার ছেলের কি নাম রাখবে? মেয়েটি মাটিতে একটি ডোরা কেটে দিলে। সকলে ছেলেটির নাম রাখলে ডোরাই। আবার কিছুদিন পরে রাজপুত্তুরের আর একটি ছেলে হল। ছেলের ভাতের সময় সকলে জিজ্ঞাসা করলে এর নাম কি হবে গো? মেয়েটি গলার হার দেখিয়ে দিলে। সকলে বল্‌লে তাহলে এর নাম থাক্ হারাই। এরপর তার আর একটি মেয়ে হল। মেয়েটির ভাতের সময় সকলে জিজ্ঞাসা করলে এর নাম কি রাখবে গো? মেয়েটি একটি কুসুমফুল দেখিয়ে দিলে। সকলে তখন বল্‌লে আচ্ছা এর নাম থাক্ কুসুমবতী।

রাজারছেলে অনেকগুলি পায়রা পুষেচেন। এখন রোজ তিনি তাদের মটর খেতে দেন। একদিন রাজপুত্তুর মাকে বল্‌লেন মা বউকে এবার কথা কওয়াতেই হবে। মা বল্‌লেন কি করে কওয়াবে বাবা? রাজার ছেলে বল্‌লেন তুমি এইখানে পায়রামটর ছড়িয়ে দাও, আর আমি তার উপর দিয়ে খড়ম পায়ে দিয়ে যেতে যেতে ইচ্ছে করে পড়ে যাব।

সেই সময় তোমরাও খুব কান্নাকাটি করো। এই বলে রাজারছেলে মটরের ওপর দিয়ে খড়মপায়ে যেতে যেতে ইচ্ছে করে পড়ে গেলেন। অমনি সকলে হায় কি হল গো বলে কাঁদতে লাগ্‌লো। রাজারছেলের আর জ্ঞান হয়না। হারাই ডোরাই কুসুমবতী সকলেই কাঁদচে। তাই দেখে মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে—

হারাই কাঁদে ডোরাই কাঁদে
কাঁদে আমার কুসুমবতী ঝি,
ভাইয়ের শোকে জর জর
আমার আবার হল কি !

এই শুনেই রাজার ছেলে বলে উঠ্‌লেন ওইতো কথা বলেচে। তাহলে বউ তো বোবা নয়। তিনি তখন মেয়েটির কাছে গিয়ে বল্‌লেন বল তোমার ভাইয়ের কি হয়েচে ? কন্যা বল্‌লে আমরা দুই ভাই বোনেতে বনে ছিলাম। বন আলো করে ফুল ফুটেছিল, সেই ফুল তুলে মালা করে ভাইয়ের গলায় পরিয়ে দিতে সে হরিণ হয়ে চলে গেছে। রাজার ছেলে বল্‌লেন—তা একথা তুমি আমাকে এতদিন বলনি কেন ? আমি তোমার ভাইকে এনে দিচ্চি। এই কথা বলে তিনি শিকার করতে বনে চলে গেলেন। বনে গিয়ে যত হরিণ দেখেন সব ধরতে লাগলেন। শেষে একটা হরিণের গলায় তিনি দেখেন শুক্‌নো একগাছি ফুলের মালা রয়েচে। সেই হরিণটি যেই বেরিয়ে এসেচে অমনি তিনি তাকে ধরে আদর করে তার গলা থেকে মালাটি খুলে নিলেন। নিতেই দেখেন হরিণটি দিব্যি একটি সুন্দর ছেলে হল। তাকে নিয়ে রাজার ছেলে বাড়ী এলেন। এসে মেয়েটিকে বল্‌লেন কেমন এই কি তোমার ভাই ? মেয়েটি তখন খুসী হয়ে বল্‌লে, হাঁ। তারপর তাঁরা সুখেস্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে লাগলেন।

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

স্মরণ ২২

হে-রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য আভাষে।

উৎসর্গ ৩৩

যদি ইচ্ছা কর তবে কটাক্ষে হে নারী,
কবির বিচিত্র গান নিতে পার কাড়ি
আপন চরণ প্রান্তে ; তুমি মুগ্ধ চিতে,
মগ্ন আছ আপনার গৃহের সঙ্গীতে।

* * * *

ভুবন তোমারে পূজে, জেনেও জান না,
ভক্ত দাসী সম তুমি কর আরাধনা
খ্যাতিহীন প্রিয়জনে।

উৎসর্গ ৪৬

সাঙ্গ হয়েছে রণ।
তুমি এস, এস নারী ;
আন তব হেম ঝারি !
ধুয়ে মুছে দাও ধূলির চিহ্ন,
জোড়া দিয়ে দাও ভগ্ন-ছিন্ন,
সুন্দর কর সার্থক কর
পুঞ্জিত আয়োজন।

* * * *

মঙ্গল কর সার্থক কর
শূন্য এ মোর গেহ !

এস কল্যাণী নারী
বহিয়া তীর্থ বারি !
বাজাও তোমার নিষ্কলঙ্ক
শত-চাঁদে-গড়া শোভন শঙ্খ,
বরণ করিয়া সার্থক কর
"পরবাসী পথিকেরে
আনন্দময়ী নারী,
আন তব সুধা বারি !

* * *

তোমার সজল কাতর দৃষ্টি
পথে করে' দিক করুণাবৃষ্টি,
ব্যাকুল বাহুর পরশে ধন্য
হোক্ বিদায়ের বেলা !

* * * *

অবারিত কার ব্যথিত বক্ষ
খোল হৃদয়ের গোপন কক্ষ,
এলো কেশপাশে শুভ্র-বসনে
জ্বালাও পূজার বাতি
এস তাপসিনী নারী,
আন তর্পণ বারি !

লোক সাহিত্য ১৩০১

এইখানে বোধ করি একটি কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে বহুল পরিমাণে যুক্তিহীনতা দেখা যায়, তাহা বুদ্ধি হীনতার পরিচায়ক নহে। তাঁহারা যে জগতে থাকেন সেখানে ভাল বাসারই একাধিপত্য।

তথাপি পৃথিবীতে যেটুকু স্বর্গ আছে সে কেবল রমণীতে বালকে, প্রেমিকে, ভাবুকে মিলিয়া সমস্ত যুক্তি এবং নিয়মের প্রতিকূল স্রোতেও ধরাতলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

" —— " পৃঃ ৩১

স্বল্প উপলক্ষ্যে অভিমান কখন স্ত্রীলোকদিগকে শোভা পায় !

চারিত্র পূজা ১৩০৫

লৌকিক প্রথার বন্ধন রমনীর কাছে যেমন হয় এমন আর কার কাছে ?

বিদ্যাসাগর চরিত পৃঃ ৩৫

ইতিহাস বাহিরের নানা কার্যে এবং জীবন বৃত্তান্তে স্থায়ী হয়, আর মহৎ নারীর ইতিহাস তাঁহার স্বামীর কার্য্যে রচিত হইতে থাকে, এবং সে লেখায় তাঁহার নামোল্লেখ থাকে না।

" পৃঃ ৩৭

স্ত্রীজাতির পরে বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহ অথচ ভক্তি ছিল। ইহাও তাঁহার সুমহৎ পৌরুষের একটি প্রধান লক্ষণ। সাধারণতঃ আমরা স্ত্রী জাতির প্রতি ঈর্ষাবিশিষ্ট, অবলা স্ত্রীলোকের সুখ-স্বাস্থ্য-স্বচ্ছন্দতা আমাদের নিকট পরম পরিহাসের বিষয়, প্রহসনের উপকরণ। আমাদের ক্ষুদ্রতা ও কাপুরুষতার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ইহাও একটি।

" পৃঃ ৪৩

স্ত্রী জাতির স্নেহ দয়া সৌজন্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, আমাদের মধ্যে এমন হতভাগ্য কয়জন আছে ?

আমরা এ সংসারে মাঝে মাঝে রাইমনিকে দেখিতে পাই, এবং তিনি যখন সেবা করিতে আসেন, তখন তাঁহার সমস্ত যত্ন এবং প্রীতি অবহেলা ভরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পরম অনুগৃহীত করিয়া থাকি। তিনি যখন চরণ পূজা করিতে আসেন, তখন আপন গর্বভরে সত্যসত্যই আপনাদিগকে নর-দেবতারূপে নারী সম্প্রদায়ের পূজাগ্রহণের অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করি।

তাহার কারণ, নারীদের কৃত সেবা কেবল আমরা আমাদের সাংসারিক স্বার্থসুখের সহিত জড়িত করিয়া দেখি, তাহা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃতজ্ঞতা উদ্রেক করিবার অবকাশ পায় না।

কারণ, দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের নহে; প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম্ম। দয়ার বিধান পালন করিতে হইলে দৃঢ় বীর্য্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক।

গ্রাম্য সাহিত্য ১৩০৫

হরগৌরী প্রসঙ্গে আমাদের একান্নপারিবারিক সমাজের মর্ম্মরূপিণী রমণীর এক সজীব আদর্শ গঠিত হইয়াছে। স্বামী দীন দরিদ্র বৃদ্ধ বিরূপ যেমনই হৌক্, স্ত্রী রূপ যৌবন ভক্তি প্রীতি ক্ষমা ধৈর্য্য তেজগর্ব্বে সমুজ্জ্বলা। স্ত্রীই দরিদ্রের ধন, ভিখারীর অন্নপূর্ণা, রিক্ত গৃহের সম্মান লক্ষ্মী।

লোকসাহিত্য পৃঃ ৬৩

সেই হরগৌরীর কথায় আমাদের বাংলা দেশের একটা বড় মর্ম্মের কথা আছে। কন্যা আমাদের গৃহের এক মস্ত ভার। কন্যাদায়ের মত দায় নাই! কন্যাপিতৃত্ব খলু নাম কষ্টং। সমাজের অনুশাসনে নির্দ্দিষ্ট বয়স এবং সঙ্কীর্ণ মণ্ডলীর মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে আমরা বাধ্য।

স্ত্রী যখন ব্রেসলেট প্রার্থনা করে কেরাণীবাবু তখন আয় ব্যয়ের সুদীর্ঘ হিসাব বিশ্লেষণ করিয়া আপন দারিদ্র্য প্রমাণ করিতে বসিলে কোন্ ধর্ম্মপত্নী তাহা অবিচলিত রসনায় সহ্য করিতে পারে?

" পৃঃ ৭৪

প্রাচীন সাহিত্য

ললিত দেহের সৌন্দর্য্যই নারীর পরম গৌরব চরম সৌন্দর্য্য নহে।

কুমার সম্ভব ও শকুন্তলা পৃঃ ১৯

জননীপদ আমাদের দেশের নারীর প্রধান পদ; সন্তানের জন্ম আমাদের দেশে একটি পবিত্র মঙ্গল ব্যাপার।

সেই জন্য মনু রমণীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ" তাঁহারা সন্তানকে জন্ম দেন বলিয়া মহাভাগা পূজনীয়া ও গৃহের দীপ্তিস্বরূপা।

" পৃঃ ২৩

নারীর সহিত নারীর যেরূপ লজ্জাবোধহীন সখী সম্পর্ক থাকিতে পারে পুরুষের সহিত তাহার সেইরূপ অসঙ্কোচ অনবচ্ছিন্ন নৈকট্যে পত্রলেখার নারীমর্য্যাদার প্রতি কাদম্বরী কাব্যের যে একটা অবজ্ঞা প্রকাশ পায় তাহাতে কি পাঠককে আঘাত করে না।

কাব্যের উপেক্ষিতা পৃঃ ৭৪

কাহিনী-পতিতা

* * * *

তা বলে নারীর নারীত্বটুকু
ভুলে যাওয়া সেকি কথার কথা!

* * * *

হৃদয়ে আমার নারীর মহিমা
বাজায়ে উঠিল বিজয় ভেরী
ধন্যরে আমি ধন্য বিধাতা
সৃজেছ আমারে রমণী করি!

* * * *

জননীর স্নেহ রমণীর দয়া
কুমারীর নব নীরব প্রীতি
আমার হৃদয় বীণার তন্ত্রে
বাজায়ে তুলিল মিলিত গীতি।

সাহিত্য—সাহিত্যের তাৎপর্য্য

মেয়েদের কাজ হৃদয়ের কাজ। তাহাদিগকে হৃদয় দিতে হয় ও হৃদয় আকর্ষণ করিতে হয়—এইজন্য তাহাদিগকে নিতান্ত সোজাসুজি সাদাসিধা, ছাঁটাছোঁটা হইলে চলে না। পুরুষদের যথাযথ হওয়া অবশ্যক কিন্তু মেয়েদের সুন্দর হওয়া চাই। পুরুষের ব্যবহার মোটের উপর সুস্পষ্ট হইলেই ভালো কিন্তু মেয়েদের ব্যবহারে অনেক আবরণ, আভাষ ইঙ্গিত থাকা চাই।

বিশ্বসাহিত্য

গৃহিণী ঘরের কাজের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু প্রকাশ করাটাই তাঁহার মনের স্পষ্ট উদ্দেশ্য নয়। গৃহকর্ম্মের ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার অভিপ্রায় সাধন করেন; সেইসকল অভিপ্রায় কাজের উপর হইতে ঠিকরাইয়া আসিয়া তাঁহার প্রকৃতিকে আমাদের কাছে বাহির করিয়া দেয়।

মা, তাঁহার কোলের শিশুর সেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু শুধু তাই নয়—কেবল কাজ করিয়া নয়, মায়ের স্নেহ আপনা আপনি বিনা কারণে আপনাকে ব্যক্ত করিতে চায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরমা দেবী

Printed & Published by Jagadananda Roy, at the Santiniketan Press, Santiniketan.

শ্রেয়সী পত্রিকার নিয়মাবলী

১। শ্রেয়সীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা।

বৈশাখ মাস হইতে পর বৎসরের চৈত্র পর্য্যন্ত শ্রেয়সীর বৎসর গণনা করা হয়। যিনি যে বৎসরের গ্রাহক হইবেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে পত্রিকা দেওয়া হইবে।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে শ্রেয়সী প্রকাশিত হয়। কোন গ্রাহক সময় মত না পাইলে ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৩। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পত্রিকা প্রকাশের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমাদিগকে জানাইবেন নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী থাকিব না।

৪। শান্তিনিকেতনবাসীদের জন্য শ্রেয়সীর বার্ষিক মূল্য ১৷৹ টাকা।

৫। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থাদি ও চিঠি পত্র পাঠাইবেন।

৬। ডাকমাশুল সমেত চিঠি না দিলে কাহারও চিঠির জবাব দেওয়া হয় না।

বীরভূম
শান্তিনিকেতন পোঃ

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীপ্রতিমাদেবী,
শ্রীরমাদেবী।

১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

মাঘ, ১৩২৯

শ্রেয়সী

মাসিক পত্র

সম্পাদিকা—শ্রীকিরণবালা সেন

মূল্য, বার্ষিক সডাক ২৲ টাকা।

শ্রেয়সী

মাসিক পত্র

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্য মেত
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুর্ভবতি।
হীয়তেহর্থাৎ য উ প্রেয়োবৃণীতে॥"

"শ্রেয়ঃ প্রেয় সবাইকে পায়।
দেখে' বেছে' ন্যায়্ যে যেটা চায়॥
যে ন্যায়্ শ্রেয়—সে পায় কূল।
যে ন্যায়্ প্রেয়—খোয়ায় মূল॥"

কঠোপনিষদ্।
১ম অধ্যায়, ২য় বল্লী।

১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

মাঘ, ১৩২৯ সাল

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

ধর্ম্ম—১৩১০

মাতা যেমন একমাত্র শিশু সম্বন্ধেই শিশুর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ। সংসারের সহিত তাঁহার অন্যান্য বিচিত্র সম্বন্ধ শিশুর নিকট অগোচর এবং অব্যবহার্য্য।

ধর্ম্মপ্রচার পৃঃ ৮৫

"—১৩১২

পতিব্রতা স্ত্রীর পক্ষে তাহার পতিগৃহের কর্ম্মই গৌরবের তাহা আনন্দের—সে কর্ম্ম তাহার বন্ধন নহে, পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহা প্রতিক্ষণেই মুক্তিলাভ করিতেছে।

মনুষ্যত্ব পৃঃ ৩১

রাজা প্রজা—১৩১২

কিন্তু স্বামী যতই কঠোর হউক না কেন সে স্ত্রীর কাছে যে কেবল বাধ্যতা চাহে তাহা নহে, স্ত্রীর হৃদয়ের প্রতিও তাহার ভিতরে ভিতরে আকাঙ্ক্ষা থাকে * *

* * * *

যদি তাহার সন্দেহ জন্মে যে স্ত্রী তাহাকে সহ্য করে কিন্তু ভাল বাসে না, তবে সে কঠোরতার মাত্রা বাড়াইতে থাকে।

রাজ ভক্তি পৃঃ ৯৫

ধর্ম—১৩১৩

পতিব্রতা স্ত্রী যেমন সমস্তদিন সংসারের নানা লোকের সহিত নানা সম্বন্ধ পালন করিয়া স্বামীরই কর্ম্ম করেন, স্বামীরই সম্বন্ধ যথার্থ ভাবে স্বীকার করেন, অবশেষে দিন অবসান হইলে একে একে কাজের জিনিষগুলি তুলিয়া রাখিয়া কাজের কাপড় ছাড়িয়া গা ধুইয়া কর্ম্মস্থানের চিহ্ন মুছিয়া নির্ম্মল মিলন বেশে একাকিনী স্বামীর সহিত একমাত্র পূর্ণ সম্বন্ধের অধিকার গ্রহণ করিবার জন্ম নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করেন,

ততঃকিম্ পৃঃ ১৭৯

কথা ও কাহিনী——

বুকভরা মধু বঙ্গের বধু জল লয়ে যায় ঘরে
মা বলিতে প্রাণ করে আন চান
চোখে আসে জল ভরে।

দুই বিঘা জমি।

শান্তিনিকেতন—১৩১৫ (১ম)

স্ত্রী তার স্বামীকে জ্ঞানের পরিচয়ে সকল দিক থেকে সম্পূর্ণ না জান্‌তে পারে কিন্তু প্রেমের জানায় আনন্দের জানায় এমন করে জান্‌তে পারে যে, কোনো জ্ঞানী তেমন করে জান্‌তে পারে না।

সামঞ্জস্ত পৃঃ ৬৩

"——" "

* * * *

মানুষের মধ্যে যে নারী রয়েছেন তিনিও সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমাদের অন্তর প্রকৃতির মধ্যে একটি নারী রয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে আমাদের সমুদয় সঞ্চয় এনে দিই। আমরা ধন এনে বলি এই নাও। খ্যাতি এনে বলি এই তুমি জমিয়ে রাখ। আমাদের পুরুষ সমস্ত জীবন..................স্ত্রীকে বলছে, এই নিয়ে তুমি ঘর বাঁধ, বেশ গুছিয়ে ঘর করা কর, এই নিয়ে তুমি সুখে থাক।

প্রার্থনা পৃঃ ৮৬

"——" "

এই যে বলা, এটি যখন রমণীর মুখের থেকে উঠেচে তখন স্পষ্ট, কি সত্য, কি মধুর হয়েই উঠেচে।

" পৃঃ ৮৫

"——" "

উপনিষদে পুরুষের কণ্ঠে আমরা অনেক গভীর উপলব্ধির কথা পেয়েছি কিন্তু কেবল স্ত্রীর কণ্ঠেই এই একটি গভীর প্রার্থনা লাভ করেছি। আমরা যথার্থ কি চাই অথচ কি নেই তার একাগ্র অনুভূতি প্রেমকাতর রমণী হৃদয় থেকেই অতি সহজে প্রকাশ পেয়েছে।

" পৃঃ ৮৭

"——" (৫ম)

যে বধূর মূঢ়তা ঘুচেছে, এই কথাটা যে জেনেছে, এই রস যে বুঝেছে, সেই "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।" যে না জেনেছে, যে সেই বরকে ঘোমটা খুলে দেখেনি—বরের সংসারকেই কেবল দেখেছে সে, যেখানে তার রাণীর পদ, সেখানে দাসী হয়ে থাকে—ভয়ে মরে, দুঃখে কাঁদে, মলিন হয়ে বেড়ায়—

পরিণয় পৃঃ ৭৫

প্রবাসী—১৩১৯—শ্রাবণ

মাটি যে বাঁধিয়া রাখে। সে অতি স্নেহশীলা মাতার মত সন্তানকে কোনো মতে দূরে যাইতে দেয় না।

জলস্থল পৃঃ ৪৩২

জীবনস্মৃতি—১৩১৯

মনে আছে, তখন দৈবাৎ যে দুই একজন মাত্র স্ত্রীলোক কবিতা লিখিতেন তাঁহাদিগকে বিধাতার আশ্চর্য্য সৃষ্টি বলিয়া সকলে গণ্য করিত। এখন যদি শুনি কোনো স্ত্রীলোক কবিতা না লেখেন তবে সেইটেই এমন অসম্ভব বোধ হয় যে

ছোটবেলায় মেয়েদের স্নেহযত্ন মানুষ না যাচিয়াই পাইয়া থাকে। আলো বাতাসে তাহার যেমন দরকার, এই মেয়েদের আদরও তাহার পক্ষে তেমনি আবশ্যক। কিন্তু আলো বাতাস পাইতেছি বলিয়া কেহ বিশেষভাবে অনুভব করে না —মেয়েদের যত্ন সম্বন্ধেও শিশুদের সেইরূপ কিছুই না ভাবাটাই স্বাভাবিক। ছেলেবেলায় চাকরদের শাসনে বাহিরের ঘরে মানুষ হইতে হইতে হঠাৎ এক সময়ে মেয়েদের অপর্য্যাপ্ত স্নেহ পাইয়া সে জিনিষটাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিতাম না। শিশুবয়সে অন্তঃপুর যখন আমাদের কাছে দূরে থাকিত তখন মনে মনে সেইখানেই আপনার কল্পলোক সৃজন করিয়াছিলাম।

পৃঃ ৭২

* * * *

শ্রীরমা দেবী

শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা

“শিক্ষিতা”দের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে সময়ে অসময়ে সর্ব্বদাই নানা অভিযোগ শোনা যায়। সেগুলির সম্বন্ধে সংস্কারমুক্ত হইয়া বিচার করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমতঃ “শিক্ষিতা” বলিতে কোন একটী অদ্ভুত জীব বোঝায় না। “শিক্ষিত”দের মধ্যে যেমন ব্যক্তিভেদে স্বভাব, চরিত্র, রীতিনীতির অসংখ্যরকম ভিন্নতা দেখা যায়, তাঁহাদের মধ্যেও তাহা না হইবার কোন কারণ নাই। কাজেই কোন একটী “শিক্ষিতা”র বিশেষ কোন ব্যবহার আমাদের চোখে ভাল না লাগিলেই যে তাহা সমস্ত “শিক্ষিতা”দের শিক্ষার বিরুদ্ধেই প্রধান যুক্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে ইহা মানিতে হইলে তথাকথিত “শিক্ষিত”দের শিক্ষাই বোধ হয় আগে বন্ধ করা উচিত হইবে। কারণ তাঁহাদের অনেকের মধ্যেই যেরকম গুরুতর পাপ, দোষ, কদভ্যাস ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়, শিক্ষিতাদের শত অপরাধ সত্ত্বেও বোধ হয় কেহই তাহার কাছেও আসিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষিতাদের যে আমাদের চোখে ভাল লাগে না, তাহার প্রধান কারণ কি দেখিতে হইবে। ইহাতে মনস্তত্ত্ব-বিদ্যার অনেকগুলি নীতিই ধরা পড়িতে পারে। আমরা যাহা দেখিতে অভ্যস্ত নই, তাহা আমাদের চোখে ও মনে বিনা কারণেই আঘাত করে, কোন জিনিষ চোখ সহা, গা-সহা হইতে সময় লাগে। “শিক্ষিতা”রা এখন যদিও সময়ের হিসাবে আর তেমন নূতন আছেন বলা যায় না, তবু তাঁহারা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্র হইতে এতই দূরে রহিয়া গিয়াছেন, যে তাঁহাদের সহিত আমাদের অধিকাংশেরই পরিচয় বাঙ্গালা থিয়েটারের প্রহসনগুলির মধ্য দিয়া মাত্র হইয়া আছে। তাহার পর মানুষের আর একটী প্রবল মনোবৃত্তি ঈর্ষা। এটীও জ্ঞাত অজ্ঞাতসারে “শিক্ষিতা”দের বিরুদ্ধে কাজ করিয়া থাকে। ঐ সকল প্রহসনগুলির সৃষ্টির মূলেও এই দুটী বৃত্তিরই লীলা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষেরা আপনারা যতই অজ্ঞ ও অশিক্ষিত হউন না কেন যাহাদের কাছে এপর্য্যন্ত প্রয়োজনমতে সত্য, মিথ্যা বলিয়া আপনাদের বিদ্যাবুদ্ধির বাহাদুরি দেখাইয়া আসিতেছেন, তাহাদের কাছে সমানে সমানে ধরা পড়িবার সম্ভাবনামাত্র বড়ই অপ্রীতিকর। তাই দেখিতে পাওয়া যায় শিক্ষিতাদের বিদ্রূপ করিয়া পুরুষেরা যত আমোদ উপভোগ করেন, অশিক্ষিতাদের মধ্যেও পূর্ব্বের কারণগুলি কমবেশী থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা ততটা করিতে পারেন না। তাঁহারা তাঁহাদের বড় জোর অপবিত্র জীব মনে করিয়া দূরে রাখিতে চান। তাহাও সময়ের পরিবর্ত্তন ও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে মেলামেশার সহিত ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে।

এইত গেল বিনা কারণে বিদ্বেষের কথা। কিন্তু কারণ না থাকিলেই যে তাহার প্রভাব কম হয় এমন নয়। সুতরাং পূর্ব্বের কারণগুলি বিনা হইলেও মুখ্য কারণ বটে। তাহার পর প্রথমেই ত স্বীকার করা হইয়াছে যে "শিক্ষিত" হইলেই পুরুষেরাও যেমন দেবতা হইয়া উঠেন না, শিক্ষিতাদের সম্বন্ধেও তাহার অন্যথা হইবার কোন কারণ নাই। সুতরাং "শিক্ষিতা" হইলেই যে তাহার সহিত দেবীত্ব প্রাপ্তির দাবী উপস্থিত হয় ইহাই আশ্চর্য্য। তাহার পর শিক্ষিতাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যেকের চরিত্রের প্রত্যেক দোষ, ত্রুটি সহজেই ধরা যায় এবং তাহা দেবীত্বের আদর্শ হইতে কতখানি দূরে অবস্থিত তাহার মাপ করাও কঠিন হয় না। তাহার পর ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ কোন অপরাধের জন্য সকলকেই একসঙ্গে ধরিয়া লইতে সকলেই বেশ একটু তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন।

এপর্য্যন্ত আমরা সাধারণভাবে শিক্ষিতাদের সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাবের কারণগুলি বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন সাধারণতঃ বিশেষ বিশেষ যে দোষগুলি তাঁহাদের উপর আরোপ করা হইয়া থাকে, তাহার একটু আলোচনা করিয়া দেখা যা'ক। তাঁহারা গৃহকর্ম্ম ও সন্তানপালনে অমনোযোগী ও অপটু ইহাই তাহার মধ্যে প্রধান। এই বিষয়টী আশৈশব শুনিয়া শুনিয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে একটু ভালরূপেই খবর লইবার চেষ্টা করা গিয়াছে। তাহাতে আমাদের পরিষ্কার ধারণা হইয়াছে যে এই অভিযোগটী সর্ব্বাপেক্ষা ভিত্তিশূন্য। ইহাতে যে আমাদের মনোগত সংস্কার কতদূর কাজ করে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। "শিক্ষিতা"দের আমরা সাধারণতঃ সুসজ্জিত এমন কি বায়ুসেবন করিতেও দেখিতে পাই। ইহার সহিত গৃহ ও সন্তানের যে কেমন করিয়া যোগ থাকিতে পারে তাহা আমাদের ধারণা করা সহজ হয় না। সুবেশের সহিত গৃহকর্ম্মের যোগ দেখা আমাদের অভ্যাস নাই, এবং গৃহকর্ম্ম করিলে যে তাহা শেষ হইতে পারে বা তাহা করিয়াও কেহ অন্য কিছু করিতে পারে ইহাও আমাদের অনেকেরই ধারণার অতীত। আমাদের সংসারে রান্না খাওয়ার আয়োজন দিনরাত লাগিয়া থাকে, বাড়ীশুদ্ধ সকলে ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১১৷১২টা পর্য্যন্ত বিষম ব্যস্ততা, হাঁকডাক করিয়াও তাহা সময়মত নিষ্পন্ন করিতে পারেন না। সুতরাং ইহার মধ্যে যাঁহারা সুসজ্জিত হইয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া থাকেন, তাঁহারা যে সংসারে কোন কাজ করিতে পারেন ইহা আমাদের ধারণা হইবে কি করিয়া? কিন্তু একটু খোঁজ করিয়া দেখিতে গেলেই জানা যাইবে যে তাঁহারা অনেকেই আমাদের ঘরের মেয়েদের অপেক্ষা গৃহকর্ম্ম অনেক বেশী করিয়াও কেবল শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থার গুণে আপনাদের এবং বাড়ীর সকলেরই যথাসম্ভব আরাম পাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন। বাস্তবিক শিক্ষাদ্বারা কার্য্যকারণবোধ, সময়ের মূল্য ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি জাগিলে যে রকম কাজ করা যায়, শতগুণে পরিশ্রমী হইলেও একজন অশিক্ষিতের তাহা করা সম্ভব হয় না। হাতী ওজনের জানাশোনা গল্পটী মনে করিয়া দেখিলেই হয়।

বাস্তবিক অশিক্ষিতা মহিলাদের গৃহকর্ম্মপটুত্ব সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা আছে, তাহা যে কতটা অতিরঞ্জিত একটু বিচার করিয়া দেখিতে গেলেই ধরা পড়িবে। তাঁহারা অনেকে "বজ্ঞির" রান্না করিতে সক্ষম ছিলেন, এবং সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত হাঁড়ি ঠেলিতে পারিতেন ইহা সত্য বটে। কিন্তু তাঁহাদের তাহা ছাড়া আর কি করিতে হইত, অন্য কি চিন্তা ছিল, তাহাও দেখা উচিত। মানুষের আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা কোন একটি উপলক্ষ্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইবেই। তাঁহাদের অন্য সকল ক্ষেত্রেই বন্ধ ছিল; কেবল এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে তাঁহারা আপনাদের নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া যশ ও সম্মানলাভের আশা করিতে পারিতেন। সুতরাং ইহার জন্য যে তাঁহারা প্রাণমন সমর্পণ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এই সকল গুণের কথাও প্রাচীনাদের সম্বন্ধেই খাটে। তখন জীবনযাত্রার প্রণালী ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া অন্যরকম ছিল, তাঁহারা তাহার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই গড়িয়া উঠিতেন, তাই তাঁহাদের অশিক্ষার মধ্যেও একটি সত্য তেজ ছিল। কিন্তু এখনকার অল্পশিক্ষিতা ও

অশিক্ষিতারা প্রকৃতির ব্যতিক্রম মাত্র। শিক্ষার অভাব তাঁহাদের স্বকৃত অপরাধ না হইলেও ইহারই জন্য তাঁহারা এই উন্নতিশীল জগতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া স্নেহ, দয়া ইত্যাদি অনেক সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াও পূর্ণমানুষ নামের অযোগ্য থাকিয়া যান।

আমরা অনেক ধনিপরিবারের মহিলাদের কথা জানি, তাঁহারা কোনমতে বিছানা হইতে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া সময় মত স্নানাহার কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁহাদের একজনার বায়ুসেবনের জন্য নদীর তীরের বাড়ীর ঘাটে ভাউলে বাঁধা থাকিত, কিন্তু সময় মত কাপড় পরিয়া বেড়াইতে যাওয়ার সময় তিনি কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারিতেন না। পূর্ব্ব বাংলার কোনো কোনো জেলার অনেক জমিদারগৃহেই রন্ধনাদি সকল গৃহকর্ম্মের ব্যবস্থা বাহিরে;— মেয়েদের তাহার কিছুতেই হাত নাই। তাঁহারা সকলে এক ঘরের মধ্যে একত্র জড় হইয়া এক এক পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া পরস্পর রঙ্গ, পরিহাস কলহাদিতে অথবা শুইয়া সময় কাটাইয়া দেন। তাঁহাদের কাহারও স্বতন্ত্র ঘরও নাই। শোওয়ার ঘর বাহিরে। ইহার আনুষঙ্গিক আরও যে সকল কুপ্রথা আছে তাহার উল্লেখ এখানে করিতে ইচ্ছা নাই। পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ জমিদারগৃহের আচার ব্যবহারও কতকটা এই রকম; অবশ্য ঠিক ঐ সকল প্রথা আর কোথায়ও নাই। কলিকাতা ও তাহার আশপাশের ধনীপরিবারের অবস্থার কথা প্রথম দৃষ্টান্তগুলি হইতে বোঝা যাইবে;—কারণ সেগুলি সেখান হইতেই লওয়া। এইসকল বড় বড় ঘরের মহিলাদের অসহায় অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি একান্ত দয়ার ভাব না আসিয়া পারে না। সমাজের কুপ্রথাগুলির ফল তাঁহাদের উপরই বেশীর ভাগ কাজ করিয়া থাকে। ইঁহাদের মত শূন্যজীবন কাহারও নাই। গৃহস্থঘরে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই ঘরে বাহিরে সাধ্যমত খাটিয়া থাকেন, কাজেই তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কতকটা সামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু ইঁহাদের সহিত এই শ্রেণীর পুরুষদের কথা ভাবিলেই ইঁহাদের প্রকৃত অবস্থা বোঝা যাইবে।

কথা প্রসঙ্গে আমাদের মূল বিষয় হইতে দূরে আসিয়া পড়িতে হইয়াছে। উঁহাদের কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে অশিক্ষার সহিত গৃহকর্ম্মপটুত্বের যে সংস্কার আছে, তাহা একান্তই মোহ মাত্র। পুরুষদের অর্থোপার্জ্জনে খাটুনির পরিমাণ যেমন প্রধানতঃ অবস্থার উপর নির্ভর করে, মেয়েদের গৃহকর্ম্ম সম্বন্ধেও তাহাই খাটে। একথা সকলেই জানেন, তবু শিক্ষিতাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রস্বরূপ ইহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারেন না। অবশ্য রুচি, প্রকৃতি ও শক্তির উপরও ইহা অনেকাংশে নির্ভর করে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ— তিনি শিক্ষিতাই হো'ন বা না হো'ন,—স্বভাবতঃ গৃহকর্ম্ম ভাল বাসেন ও করিতে পারেন। কাহারও বা শক্তি, প্রবৃত্তি অন্য বিষয়ে থাকিতে পারে। মেয়েদের বিষয় কিছু বলিবার সময় সকলেই ভুলিয়া যান যে তাঁহারা সমগ্র মনুষ্য— সমাজের অর্দ্ধাংশ, সুতরাং পুরুষদের মধ্যে যেমন শক্তি, প্রকৃতি, প্রবৃত্তির নানা বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের মধ্যেও তাহা না হইবার কোন কারণ নাই। তবে সমাজে তাঁহাদের সকলকেই একছাঁচে ঢালিয়া একগণ্ডীতে পুরিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় বাহির হইতে ঐ বিভিন্নতা ততটা চোখে পড়ে না, শিক্ষিতাদের ক্ষেত্রে তাহা যে প্রকাশ পাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

তাহার পর সন্তানপালনের কথা। এ বিষয়ে "শিক্ষিতা"-দের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। অনেকে বলেন তাঁহারা অতিরিক্ত বিলাসিতার মধ্যে সন্তানদের রাখিয়া তাহাদের শরীর অপটু করিয়া ফেলেন, এবং আগে-কার লোক এখনকার অপেক্ষা দৃঢ়স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইতেন ইত্যাদি। এ বিষয়ে নিবেদন এই যে আগেকার শ্রেষ্ঠত্ব সত্য কতদূর ছিল, শিশুমৃত্যু এখনকার অপেক্ষা কম কি বেশী ছিল ইত্যাদি প্রমাণ করিতে হইলে অনেক কথা বাহুল্যমাত্র বলিতে হয়, সত্যাসত্য নির্ণয়ও সহজ হয় না। সুতরাং প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহাদের কথা টানিয়া আনিয়া বর্ত্তমান অবস্থা চাপা দেওয়া ঠিক নয়। এখনকার "শিক্ষিতা" অশিক্ষিতার মধ্যে কাহার ভিতর শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বেশী ও

কাহার মধ্যে সন্তানেরা শরীর মনের স্বাস্থ্য বেশী পাইতেছেন তাহাই দেখা উচিত। আগে যে বিলাসিতার মধ্যে সন্তান-পালনের কথা বলা হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পরিষ্কার, পচ্ছিন্নতা ও শোভনতাই আমাদের দেশে অধিকাংশই স্থলে "বিলাসিতা" নামে অভিহিত হয়। "অশিক্ষিতা" মায়েরা ও যে তাঁহাদের সন্তানদের সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন না এমন নয়,—তবে পারিয়া উঠেন না। তাহার পর অতিরিক্ত আদরে আব্দারে করিয়া তাঁহারা যে সন্তানদের শরীর, মন কেমন নষ্ট করিয়া তোলেন তাহা ত জানা কথা। তাঁহারা এক সময়ে যেমন অন্যায়, আবদার সহ্য করেন, তেমনি আবার বিনাকারণে,—হয়ত কেবল আপনাদের আলস্য ও শৈথিল্যের জন্য গুরুতর শাসন করিয়া বসেন। এ সকলই কেবলমাত্র শিক্ষার অভাবের ফল,—এজন্য তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না,—কিন্তু তবুও যে ইহা সত্য তাহাও ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে সন্তানদের স্বাস্থ্যের জন্য পিতামাতার স্বাস্থ্যও যে প্রধানতঃ প্রয়োজন, তাহা যে শিক্ষিতাদের বেশী আছে একথা বলা যায় না। তাহার অন্যান্য কারণেই মধ্যে তাঁহাদের যে বায়ুসেবন আমাদের এতটা চক্ষুপীড়াজনক তাহা আমাদের সদাসতর্ক দৃষ্টির জন্য তাঁহারাও যে পুরামাত্রায় পাইয়া থাকেন এমন নয়। মানসিক পরিশ্রমের জন্য তাঁহাদের শরীরের যে ক্ষয় হয় তাহাতে মুক্ত আলো, বাতাস ব্যায়ামাদি তাঁহাদের অধিকতর প্রয়োজনীয় হইলেও তাহার উপযুক্ত সুযোগ না থাকায় যে তাঁহাদের শারীরিক ক্ষতি হয় তাহা সকলেই জানেন। অবস্থাপন্ন লোকেরা তাহা নানা উপায়ে তবু অনেকটা পূরণ করিয়া লইতে পারেন, মধ্যবিত্তদের তাহার কিছুই সম্ভব হয় না। তাহার উপর আমাদের মেয়েদের বোর্ডিংয়ে থাকা ও খাওয়াও যে ইহার জন্য কতটা দায়ী বলা যায় না। ছেলেদের বোর্ডিংয়েও এই সকল দোষের জন্য তাহাদের স্বাস্থ্যের ও যথেষ্ট ক্ষতি হয় সন্দেহ নাই, তবু তাহাদের বাহিরে বেড়াইবার ও ইচ্ছামত খাওয়ার অভাব পূরণের অনেক সুবিধা থাকায় এতটা হইতে পারে না। কিন্তু মনে রাখা উচিত এই সকল দোষের জন্য আমাদের সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থাই দায়ী, শিক্ষার অপরাধ নাই। বিলাতের আজকালকার মেয়ে গ্রাজুয়েটদের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলেই ইহার সত্যতা জানা যাইবে।

তাহার পর সন্তানের শারীরিক স্বাস্থ্যের সহিত তাহার মনের উন্নতিও মাতার কর্ত্তব্য। তাহা আমাদের বর্ত্তমান অশিক্ষিতা মায়েরা কতদূর কি করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন? এ বিষয়ে ভাল করিয়া সব বলিতে গেলে অনেক বলিতে হয়, সুতরাং আর সব ছাড়িয়া এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আজকালকার অর্থ সঙ্কটের দিনে মায়ের দ্বারা যদি গৃহশিক্ষকের কাজ চলে, তাহা হইলে শিক্ষাও যেমন সম্পূর্ণতর হইতে পারে একটী বড় খরচও তেমনি বাঁচিয়া যায়। স্বয়ং ছেলেদের রীতিমত পড়াইবার সময় অল্প পিতারই থাকে, থাকিলেও সে সময় তিনি অন্যত্র পড়াইয়া বা অন্যকাজের দ্বারা কিছু অতিরিক্ত উপার্জ্জন করিবার সুযোগ পাইলে সংসারের সুবিধা হইতে পারে। সুতরাং মেয়েদের শিক্ষার জন্য যে ব্যয় হয় তাহা অর্থনীতিহিসাবেও বৃথা নয়। সমাজের কুসংস্কারগুলি দূর হইতে থাকিলে তাহার দ্বারা ক্রমেই অধিকতর সাহায্য পাইবার আশা করা যাইতে পারে। এ সাহায্য আমাদের দেশেও ক্রমেই অধিকতর প্রয়োজন হইয়া আসিতেছে। সুতরাং এখনকার দিনে কেবলমাত্র "গৃহলুণ্ঠিত কোমলহৃদয়রাশি" হইয়া থাকিলে তাঁহাদের ও সমাজের কাহারও মঙ্গল নাই।

বঙ্গনারী—।

স্মৃতি

সেদিন গভীর রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। হঠাৎ মনে হল আমার বিছানার চারিদিকে কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে চমকে উঠে ডাকলুম "কে, কেগো ওখানে?" সে আমার মশারিটা তুলে আস্তে২ এসে আমার পাশে বসল আমি ঘরের কমানো দীপের আলোয় আর জানালা দিয়ে যে জ্যোৎস্নার আলো আসছিল তাতে দেখলুম কী তার চমৎকার মুখখানি। মুগ্ধ হয়ে দেখলুম মুখে তার হাসি চোখে তার দুফোঁটা অশ্রু। আমি আবার জিগ্যেস্ করলুম, "কেগো তুমি?" সে বল্ল, "আমি স্মৃতি।" এতদিন পরে আজ তাকে এমন রূপে দেখলুম মন আমার বেদনায় সুখে ভরে উঠল। সেই চাঁদের আলোয় তার সঙ্গে কত কথা হ'ল। কবে আমাদের আনন্দের উচ্ছ্বাসে সমস্ত আকাশ ভরে উঠেছিল, কবে আমরা কজন সঙ্গী মিলে জ্যোৎস্না রাতে মাঠে বেড়িয়ে পড়েছিলুম, কবে আনন্দের স্বপ্নে মনের মধ্যে কিসের ঘোর লেগে গিয়েছিল কবে বেদনায় সমস্ত প্রাণ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল কবে বিচ্ছেদে সমস্ত মন ব্যকুল হয়ে উঠেছিল কথা ফুরোতে চাইছিল না। তারপর সে বল্ল আজ তুমি শ্রান্ত এস আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা সকালে উঠলুম দেখি সে চলে গেছে। দিনের বেলা আমি কাজে ব্যস্ত সে এসে হঠাৎ ডাকলে, "বন্ধু"! আমার হাতের কাজ পড়ে রইল অবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলুম। তার হাসিভরা মুখখানা দেখিয়ে সে যেমনি এসেছিল তেমনি ভাবে চলে গেল কাজ পড়ে রইল মনে পড়তে লাগল তার মুখখানা। সব কাজে ভুল হয়ে যেতে লাগল। সন্ধ্যা হয়ে এল গভীর রাতে বন্ধু এসে ডাকল, আগের দিনের মতই অনর্গল গল্পে অনেকক্ষণ কেটে গেল তার পরে সে কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘুমিয়ে পড়লুম। পরদিন কাজের মাঝে তার ব্যথা ভরা স্বর কানে বাজল ফিরে দেখি সজল চোখে সে আমার দিকে চেয়ে আছে। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে ডাকলুম "বন্ধু" চেয়ে দেখি সে চলে গেছে, সেদিন আরো দুএকবার দেখলুম একবার সে হেসে চাইলে একবার সে কাতর দৃষ্টিতে চাইলে। সারাদিনে কিছু করতে পারলুম না রাত্তিরে সে যখন এল তাকে মিনতি কল্লুম, "বন্ধু তুমি ঠিক এমনি সময়ে এস আমার সব কাজ পড়ে থাকে চারদিকে লোকে আমায় বিদ্রূপ করে আমায় দেখে হাসে। আমার গভীর রাতের বন্ধু তুমি গভীর রাতেই এস"। সে বল্ল "আচ্ছা বন্ধু!" পরের দিন উঠে ভয়ানক বেশী মন দিয়ে আমার কাজে লাগলুম। তারপর থেকে সে আসে সেই প্রথম দিনকার মতই গভীর রাতে। তার স্পর্শে সব ক্লান্তি চলে যায়। তার নরম হাত সে আমার কপালখানিতে বুলিয়ে দিয়ে যায়, সব কষ্ট দূর করে দিয়ে।

শ্রী—দেবী

পটাচারা

আজকালকার দিনে বুদ্ধদেব ও তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মের কথা বোধ হয় সকলেই জানে। তিনি ত রাজার পুত্র ছিলেন, রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্যভোগ করাই ত রাজপুত্রের ধর্ম্ম; তাহা না করিয়া তিনি কেন যে ভিক্ষু সন্ন্যাসী হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া দুঃখী নরনারীর দুঃখের ভার বহন করিয়া জীবন কাটাইলেন, তাহা অতি আশ্চর্য্য। তাঁহার পিতা রাজা শুদ্ধোদন কপিলবাস্তুর রাজা ছিলেন, বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সন্তান জন্মে নাই ইহাই তাঁহার খেদ ছিল পরে

যখন এই পুত্র জন্মিলেন পিতা তাঁহার নাম রাখিলেন "সিদ্ধার্থ।" কিন্তু জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন তিনি বিশ্ব-প্রেমের বীজ, জগদ্ব্যাপী মৈত্রী ও করুণা অন্তরে লইয়া পৃথিবীতে আসিলেন। বাল্যে ও যৌবনে যখন মানুষ সংসারের আমোদ প্রমোদে রত থাকে সেই সময়েই তিনি সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা দেখিয়া উদাস হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া মানুষ ইহার হাত হইতে মুক্তি পায়। পিতা তাঁহার এই উদাস ভাব লক্ষ্য করিয়া সুন্দরী গুণবতী পত্নীর প্রেমের বাঁধনে বাঁধিয়া সংসারধর্ম্ম করাইতে চাহিলেন। কিন্তু ভগবান যাঁহাকে ডাকেন কেহই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। সিদ্ধার্থের ঔদাসীনতা ও বৈরাগ্যের ভাব না কমিয়া দিন দিন বাড়িতেই লাগিল। অবশেষে তাঁহার পুত্র রাহুল যখন জন্মিল, তিনি দেখিলেন সংসার তাঁহাকে ক্রমেই চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিতেছে, এখানে থাকিয়া জীবের দুঃখ নিবারণের উপায় তো খোঁজা হইতেছে না। শিশুর জন্মের কয়েকদিন পরেই একদিন গভীর রাত্রে তিনি গোপনে রাজপুরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রভাতে তাঁহার পলায়ন বার্ত্তা শুনিয়া সকলে হায় হায় করিতে লাগিল।

এদিকে সিদ্ধার্থ তাঁহার লক্ষ্য সাধনের জন্য মনপ্রাণ দিয়া সাধন করিতে লাগিলেন। বহু আরাধনা করিয়া বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল। তিনি "বোধি" অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান—ভব যাতনা নিবারণের উপায়—লাভ করিয়া "বুদ্ধ" হইলেন। তিনি বুঝিলেন, তৃষ্ণা অর্থাৎ আসক্তিই মানুষের সকল দুঃখের মূল, এই তৃষ্ণার হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই মানুষের মুক্তি, বাসনা বিলয়েই নির্ব্বাণ। তাঁহার নব ধর্ম্মের শান্তিময়ী বাণী কত শতসহস্র দুঃখী নরনারীর তপ্ত প্রাণ শীতল করিল, কত পথহারাকে জীবনের প্রকৃত পথ দেখাইল। জগতে নূতন আলোক বিকীর্ণ হইল। এই ধর্ম্মের আস্বাদ পাইয়া, সংসারের ভোগসুখের অসারতা ও অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া, মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হৃদ্গত করিয়া মানুষ এই পৃথিবীতেই স্বর্গ সুখ লাভ করিল। এই ধর্ম্ম সাধন ও প্রচারের জন্য বুদ্ধদেব যে মণ্ডলী গঠন করিলেন তাহারই নাম সংঘ। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে জ্ঞানিমূর্খ, ধনিনির্ধন, যুবাবৃদ্ধ, স্ত্রীপুরুষ সকলেই এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার ও সংঘভুক্ত হইবার অধিকারী। কত নরনারী সংসার ত্যাগ করিয়া, বাসনার জাল ছিন্ন করিয়া এই ধর্ম্মের পতাকা হাতে লইয়া দেশে দেশে ইহার বাণী শুনাইতে লাগিলেন, চারিদিকে মৈত্রী ও করুণার ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। কত নরাধম পাপী, সংসারে সকলের পরিত্যক্ত ঘৃণিত কত অভাগা নরনারী নবজীবন পাইল।

ব্রাহ্মণ্য যুগের প্রাধান্যের সময়ে স্ত্রীজাতির প্রকৃতশিক্ষা ও ধর্ম্মসাধন বা ধর্ম্মোপদেশ দানের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এমন কি উপনিষদের যুগেও গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র ব্রহ্মবাদিনীর নাম আমরা শুনি। কিন্তু বৌদ্ধযুগে যে কত রমণী ধর্ম্মের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, নিজে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ও সংঘের সুশীতল ছায়ায় আসিয়া শান্তি পাইয়া অন্য কত তাপিত জনকে ডাকিয়া আনিয়া শান্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহা আমরা অনেকেই জানি না। কত কুলত্যাগিনী এই ধর্ম্মের কৃপায় দেবী হইয়া গিয়াছে, তাহাদের উপদেশে আবার কত দুঃখিনী অপার দুঃখে শান্তি পাইয়াছে, তাহার ইতিহাস অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আজ তাহারই দু'একটি কথা আমরা আলোচনা করিব। বৌদ্ধসংঘভুক্ত বৃদ্ধদিগকে স্থবির (থের) ও স্থবিরা (থেরী) বলা হয়। যাঁহার কথা আজ বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাঁহার নাম থেরী পটাচারা। ইঁহার পূর্ব্বনাম কি ছিল জানা যায় না। ইনি শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠিকন্যা। উপযুক্ত বয়সে পিতামাতা স্বজাতীয় যোগ্যপাত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ করিলেন, কন্যা অন্য এক যুবকের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; বিবাহের আয়োজন দেখিয়া গোপনে পিতৃগৃহ ছাড়িয়া দরিদ্র-স্বামীর সহিত দূর বিদেশে চলিয়া গেলেন। তথায় তাঁহার একটি পুত্র জন্মিল, কিছুদিন পরে পুনরায় যখন তিনি অন্তঃসত্ত্বা হইলেন তখন পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিতে চাহিলেন, স্বামী সে প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না। তিনি তখন স্বামীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং তাঁহার অনুমতি না লইয়াই পিতৃ-

গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন স্বামীও তাঁহার সহিত আসিতে লাগিলেন, কিছুদূর অগ্রসর হইযাই পটাচারা আর একটি পুত্র প্রসব করিলেন, স্বামী কাঠ আনিতে বনে গিয়া সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিলেন। বনের মধ্যে আশ্রয়হীনা অনাথিনী পটাচারা পুত্র ছুইটিকে লইয়া অতিকষ্টে চলিতে চলিতে একটি নদীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছুটি শিশু লইয়া কি করিয়া নদী পার হইবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া একটিকে নদীতীরে শোয়াইয়া লতাপাতা ঢাকা দিয়া অন্যটিকে লইয়া নদীতে ঝাঁপ দিলেন, এমন সময়ে এক শকুনি আসিয়া তীরস্থিত শিশুকে লইয়া গেল, মাতা তাহা দেখিয়া অস্থির হইয়া গেলেন, ঠিক এই সময়ে নদীর খরস্রোতে দ্বিতীয় শিশুটিও ভাসিয়া গেল। ছুর্ভাগিনী জননী পাগলিনীর ন্যায় ছুটিতে লাগিলেন, শ্রাবস্তীর নিকটেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, পটাচারা পতিপুত্র হারাইয়া শান্তিলাভের জন্য শ্রাবস্তীতে পিতামাতার নিকটে ছুটিয়া আসিতেছিলেন, আসিয়া দেখেন বজ্রাঘাতে পিতামাতা ও ভ্রাতা একসঙ্গে প্রাণ হারাইয়াছেন। পটাচারা তখন যথার্থই উন্মাদিনী হইয়া গেলেন, তাঁহার পরিধেয় বসন যে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে সে জ্ঞানও হারাইয়া ফেলিলেন, আলুলায়িতকুন্তলে স্রস্ত-বসনে ক্রমাগত আপনার ছুঃখ কাহিনী কহিতে কহিতে চলিতে লাগিলেন ;—

উভোপুত্তাকালং কতা, পন্থে মষ্হিং পতিমতো।
মাতা পিতাচ ভাতাচ একচিতকস্মিং ডয়হরে॥

তাঁহার এই স্খলিত-বসনতা হেতুই পটাচারা নাম হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

ভগবান বুদ্ধদেব সেই সময়ে শিষ্যগণের সহিত শ্রাবস্তীতে ছিলেন, পাগলিনী স্খলিত বসনে একেবারে তাঁহাদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত। বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতে ছিলেন, বুদ্ধদেব তহোতে বাধা দিয়া নিজে সম্মুখে গিয়া পাগলিনীকে কহিলেন "ভগিনী, সংযত হও''। তাঁহার শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া এই একটিমাত্র কথাতেই যেন পটাচারার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, নিজের অবস্থা বুঝিয়া তিনি লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। তখন একব্যক্তি একখানি বস্ত্র ফেলিয়া দিল, তাহা দ্বারাই দেহ আচ্ছাদিত করিয়া পটাচারা বুদ্ধদেবের চরণে পতিত হইয়া আপন ছুঃখকাহিনী কহিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, "পটাচারে, পতি পুত্র ও অপর আত্মীয়গণকে হারাইয়া তুমি যে অশ্রু বিসর্জন করিতেছ, আসক্তিই উহার মূল এবং উহাই মানুষের সকল ছুঃখের হেতু। পরলোকে পুত্রকন্যাদি কোন আত্মীয়ই পরিত্রাণ করিতে পারে না. ইহলোকেও নয়, অতএব আসক্তির বন্ধন কাটিয়া চিত্তশুদ্ধি দ্বারা আপন মুক্তির উপায় আপনিই কর।'' ইহা বলিয়া নিম্নলিখিত গাথাটি গাহিলেন :—

ন সন্তি পুত্তা তাণায় ন পিতা ন পি বন্ধবা
অন্তকেনাধিপন্নস্‌স ন'থি ঞাতিসু তাণতা।
এতং অথবসং ঞত্বা পণ্ডিতো সীলসংবুতো
নিব্বানগমনং মগ্‌গং খিপ্‌পং এববিসোধিযে।

মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে আত্মীয় বন্ধু কেহই রক্ষা করিতে পারেনা, ইহা জানিয়া শীলসংবৃত (শীল আচরণ কারী) পণ্ডিত অবিলম্বে নির্ব্বাণমার্গ অবলম্বন করিবেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে আরো যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটি কথা ধম্মপদগ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে। তাহা এই :—

যোচ বস্‌সসতং জীবে অপস্‌সং উদয়ব্যয়ং।
একাহং জীবিতং সেয্যো পস্‌সতো উদয়ব্যয়ং॥

জন্মমৃত্যু না দেখিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকা অপেক্ষা জন্মমৃত্যুর মূল কারণ জানিয়া সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া একদিন জীবিত থাকাও শ্রেয়ঃ।

এই সকল উপদেশে পটাচারার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল, তিনি অর্হত্ব (সাধনের চরম অবস্থা) লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি একটি গাথা গাহিলেন ; তাহার অর্থ এই :—

"স্ত্রীপুত্র পালনের জন্য লোকে লাঙ্গলের দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া কতশ্রমে শস্য উৎপাদন করে ধন উপার্জ্জন করে, তবে আমি কেন ধর্ম্মোপদেশ পাইয়াও নির্ব্বাণ লাভ করিতে এত আলস্য করি। একদিন পাধোয়া জল নীচের দিকে যাইতে দেখিয়া ভাবিলাম, বাসনার স্রোত এমনি করিয়া

মানবকে নীচের দিকে লইয়া যায় তাহাকে অধোগামী করে। এইকথা চিন্তা করিয়া মনকে শাসিত করিলাম। তাহারপরে প্রদীপ লইয়া শয়নকক্ষে গিয়া প্রদীপের শিখার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম, বর্ত্তিকার তেল যেমন প্রদীপের শিখাকে জ্বালাইয়া রাখে, তৃষ্ণাও (বাসনা ও আসক্তি) তেমনি মানুষকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে লইয়া যায়। তাহারপর সূচ দিয়া যেমন সলিতাটি তেলে ডুবাইয়া দিলাম, দীপ নিবিয়া গেল। বাসনার হাত হইতে মুক্তি পাইলে আমিও মুক্তি পাইব, এই কথাটি তখন বুঝিলাম।"

পটাচারা যখন থেরী হইলেন তখন শতশত শোকাকুলা রমণী তাঁহার কাছে আসিয়া সান্ত্বনা পাইত। শোকার্ত্ত হইয়া যাঁহারা বুদ্ধদেবের নিকট সান্ত্বনা পাইতে আসিত, তাহাদের মধ্যে অনেকেই পটাচারার উপদেশে শোকদুঃখ ভুলিত। কথিত আছে, পটাচারার উপদেশে একসঙ্গে পাঁচশত নারী ধর্ম্মে দীক্ষিতা হন, এই সংখ্যা সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ করেন, যাহা হউক তাঁহার নিজ জীবনে লব্ধ ধর্ম্মের উপদেশে যে বহুসংখ্যক নরনারীর জীবনপরিবর্ত্তিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পটাচারা তাহাদিগকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি এই :—

"কি করিয়া জীবের জন্ম হয়, মৃত্যুর পরেই বা সে কোথায় যায়, ইহা যখন জান না তখন বৃথা রোদন কর কেন? জীবের ধর্ম্মই ত যাওয়া আসা, তবে আর বৃথা শোক করিওনা। অযাচিত আসিয়াছিল, আবার অজ্ঞাত পথে চলিয়া গিয়াছে। ইহাই জীবের যাতায়াতের বিবরণ, ইহাতে দুঃখ কি? পতিপুত্র হারাইয়া আমি কত দুঃখ সহিলাম, এখন দেখ, বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ লইয়া হৃদয় নিহিত শল্য অপগত হইয়াছে, অন্তরের জ্বালা দূরে গিয়াছে, নির্ব্বাণে মরণের দুঃখের অবসান হইয়াছে।"

পালি সাহিত্যে পটাচারার ন্যায় আরো কত থেরীর পবিত্র জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের বিমাতা দেবী গৌতমী যিনি মাতৃহারা সদ্যোজাত শিশুর মা হইয়া তাঁহাকে মানুষ করিয়াছিলেন, কিরূপ পুত্রের ধর্ম্ম গ্রহণ উন্নত ধর্ম্মজীবন পাইয়াছিলেন এবং স্ত্রীজাতির জন্য এই উন্নত অধিকারের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা অতিশয় হৃদয়-গ্রাহী। সুজাতা প্রভৃতি আরো কত পুন্যশীলা রমণীর জীবন কথা তাঁহাদিগেরই রচিত গাথায় পাওয়া যায়। এইসকল কাহিনী যদি আমাদের ঘরে ঘরে পঠিত ও আলোচিত হয় তাহাতে যে অশেষ কল্যাণ হয় সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীসরযূবালা দত্ত

পূজার আসন

পথ হয়েছে পূজার আসন
এই তো হল ভালো,
আস্‌ল নেমে পথের সহায়
সত্য পথের আলো।
পথে বসেই গাঁথছি আমার
নিত্য পূজার মালা,
পরাণ ফুলে,—গন্ধ কাহার
ভরছে বরণ ডালা।

বাজল্ ওকি মিলন বাঁশি
মোহন মধুর রবে,
আকুল করে গাইছে আজি
পথে পথেই সবে।
কোন বিরাগীর পূজার গন্ধ
অচিন পথে ভাসে,
উদাস পাগল পথিক বসে
আপন মনে হাসে।

ফুরিয়ে এল কান্না-হাসি
চিত্তে নূতন দোলা,
ঐ সুরে আজ পাগল হোয়ে
ছুট্‌ছে পথিক ভোলা।

মিটিয়ে দিল সকল দ্বন্দ্ব
'আমার' আমার সুর,
পথের পাশেই উঠল গড়ে
নিত্য অমর পুর।

শ্রীসরোজিনী দত্ত।

গান

নিশীথ রাতের প্রাণ
কোন সুধা যে চাঁদের আলোয়
আজ করেচে পান।
মনের সুখে তাই
আজ গোপন কিছু নাই।
আঁধার ঢাকা ভেঙে ফেলে
সব করেচে দান।

দখিন হাওয়ায় তার
সব খুলেচে দ্বার।
তারি নিমন্ত্রণে
আজি ফিরি বনে বনে,
সঙ্গে করে এনেছি এই
রাত-জাগা মোর গান॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রন্ধন

রন্ধন বলিতে যে কেবল ডাল ভাত সিদ্ধ করা তাহা নহে। রন্ধন, বা পাকবিদ্যা, জিনিষটি মোটেই অবহেলার জিনিষ নয়। রাঁধুনীর যদি পরিমাণ বোধ না থাকে, তাহা হইলে পুস্তক পাঠ করিয়া পাকবিদ্যা আয়ত্ত করা অসম্ভব।

সঙ্গীতজ্ঞের নিকট সুরের নাম করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিতে পারেন, তেমনি যিনি পাকবিদ্যায় পারদর্শী, তিনিই পুস্তক পড়িয়া যথার্থ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, আর যাঁহারা রন্ধন বিদ্যায় অপটু তাঁহারা সহজে কোনো সুবিধা করিতে পারেন না।

যা নহিলে একদিন চলেনা, এমন বিদ্যা সকলেরই জানা দরকার। দেখিয়াছি, ছাত্রাবাস প্রভৃতিতে একদিন পাচক না থাকিলে ছেলেদের কি কষ্ট! এ সব দেখিলে মনে হয় যাহারা বড় বড় পরীক্ষায় পাশ করিতেছে, তাহারা কি এই সামান্য ডাল, চচ্চড়ি, ডাল্‌না রাঁধিতে পারে না? কেবল না জানার জন্য কত কষ্ট সহ্য করিতে হয়।

যে প্রকার দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে সাধারণ লোকের পক্ষে পাচক রাখা বড় শক্ত।

অনেক জায়গায় এমনও দেখিয়াছি যে বাড়ীর বধূ রাঁধিতে জানেন না বা রাঁধিতে তাহার কষ্ট হয়, কাজেই পাচক রাখিতে হইয়াছে কিন্তু বাসন সেই বধূকেই মাজিতে হয়, তাহার কারণ দুইটি লোক রাখার সামর্থ্য নাই।

রন্ধন অতি প্রয়োজনীয় ও আনন্দপ্রদ বিদ্যা। নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া পাঁচজনকে খাওয়াইলে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায় তাহা অনির্ব্বচনীয়।

সেকালে রাজকন্যা ও রাজপুত্রেরাও পাকবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। দ্রৌপদী পাক-বিদ্যায় শ্রেষ্ঠা ছিলেন। পাণ্ডব ভ্রাতা ভীমসেন পাকবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

তখনকার দিনে অন্য পাঁচটি বিদ্যার মধ্যে পাকবিদ্যাও আর একটি বিদ্যা বলিয়া গণনা করা হইত।

রন্ধন, এমন হওয়া আবশ্যক, যাহাতে বায় বাহুল্য না

হয়, অথচ খাইতে সুস্বাদু হয় এবং সারবান হয়। এতটুকু ফোড়নের এদিক ওদিক হইলে জিনিষের স্বাদ বদলাইয়া যায়, সামান্য একটু চিনি কি লবণের পরিমাণ যোগের উপর সমস্ত রন্ধন নির্ভর করে। এমন অনেক রান্না আছে যাহাতে কোনো মসলা না দিয়া শুধু ফোড়ন দিয়া রাঁধিলেই অতি সুস্বাদু হয়।

এখনকারদিনে পাঁউরুটিটা করিতে শেখা বোধ হয় খুব উচিত। যখন মেয়েদের কেবল রান্না ও সংসারের কাজ করিলেই দিন চলিয়া যাইত, তখন কোনো কথা ছিল না, কিন্তু এখন যখন মেয়েদের লেখাপড়াও চাই, বাহিরের কাজও চাই আবার পরিবারের আহারের ব্যবস্থাও করিতে হইবে তখন একদিনে এক সপ্তাহের প্রয়োজন মত পাঁউরুটি করিয়া রাখিলে রন্ধন ব্যাপার অনেকটা সরল হইয়া আসে।

বাঙালীদের আহার ব্যাপার অতিশয় জটিল। আমাদের অপেক্ষা জটিলতা আর কোনো প্রদেশেই নাই।

শ্রীযুগলমোহিনী দেবী

পিঠে-পুলি

ছোলার দালের পিঠা

ছোলার দাল—এক সের
ময়দা—আধ পোয়া
ডেলা ক্ষীর—আধ পোয়া
ঘৃত—দেড় পোয়া
চিনি—এক সের
বাদাম—পনেরো ষোলটি
ছোটএলাচ—ষোলটি
নারিকেল—একটি

প্রথমে দালগুলি সিদ্ধ কর। জল যেন বেশী না হয়, ঠিক সমান জল হওয়া চাই। ময়দায় বেশ করিয়া ময়ান দাও। তাহার পর ঐ সিদ্ধ দালের সহিত নরম থাকিতেই তাহার সহিত ময়দাগুলি মাখিয়া ফেল। আড়াই পোয়া আন্দাজ রস কর। পরিমাণ মত চিনির সঙ্গে নারিকেল বাটিয়া পাক করিয়া লও। তাহার পর ময়দা মিশ্রিত দালকে ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া তাহাতে ক্ষীর নারিকেল পুর দিয়া পুলির আকারে গড়িয়া ঘিয়ে ভাজ। ভাজিয়া রসে ফেল। ১০।১৫ মিনিট রসে থাকার পর পুলিগুলিকে উঠাইয়া তাহাদের গায়ে বাকী চিনি ছড়াইয়া দাও।

মুগতক্তি

সোনামুগের দাল—এক সের
চিনি—এক সের
চাউলগুঁড়ি—তিন ছটাক
মৌরী—
বড়এলাচ—চারি পাঁচটি
ছোটএলাচ—আট দশটি
ঘৃত—আধ সের
কতকগুলি গোলমরিচ
একটু গোলাপ জল।

জল সমান করিয়া দিয়া দাল সিদ্ধ কর, তাহাতে অল্প একটু হলুদ দিও। যখন বেশ সিদ্ধ হইবে, অথচ গলিয়া যাইবে না সেই সময় নামাইয়া উহার সহিত চালের গুঁড়ি মিশাইয়া দাও, গোলমরিচ প্রভৃতি মশলাগুলিও গুঁড়াইয়া উহাতে মিশাইয়া দাও।

চিনির রস কর—রস খুব পুরুও হইবে না খুব পাৎলাও হইবে না। রসের সহিত গোলাপজল মিশাইয়া দাও। থালায় ঘি মাখাইয়া ঐ দাল থালায় ঢালিয়া হাতে একটু ঘি লাগাইয়া দালকে চাপড়াইয়া সমান করিয়া দাও। ঠাণ্ডা হইলেই দাল জমিয়া যাইবে। তখন ছুরি দিয়া বরফির আকারে কাটিয়া তাহাদের রসে ফেল। ৪।৫ মিনিট পরে রস হইতে উঠাইয়া রাখ।

শ্রীযুগলমোহিনী দেবী

Printed & Published by Jagadananda Roy, at the Santiniketan Press, Santiniketan,

শ্রেয়সী পত্রিকার নিয়মাবলী

১। শ্রেয়সীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা।

বৈশাখ মাস হইতে পর বৎসরের চৈত্র পর্য্যন্ত শ্রেয়সীর বৎসর গণনা করা হয়। যিনি যে বৎসরের গ্রাহক হইবেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে পত্রিকা দেওয়া হইবে।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে শ্রেয়সী প্রকাশিত হয়। কোন গ্রাহক সময় মত না পাইলে ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৩। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পত্রিকা প্রকাশের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমাদিগকে জানাইবেন নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী থাকিব না।

৪। শান্তিনিকেতনবাসীদের জন্য শ্রেয়সীর বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

৫। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থাদি ও চিঠি পত্র পাঠাইবেন।

৬। ডাকমাশুল সমেত চিঠি না দিলে কাহারও চিঠির জবাব দেওয়া হয় না।

বীরভূম
শান্তিনিকেতন পোঃ

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীপ্রতিমাদেবী,
শ্রীরমাদেবী।

১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩২৯

শ্রেয়সী

মাসিক পত্র

সম্পাদিকা—শ্রীকিরণবালা সেন

মূল্য, বার্ষিক সডাক ২৲ টাকা।

শ্রেয়সী

মাসিক পত্র

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্য মেত
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুর্ভবতি।
হীয়তেঽর্থাৎ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥"

"শ্রেয়ঃ প্রেয় সবাইকে পায়।
দেখে' বেছে' ল্যায়, যে যেটা চায়॥
যে ল্যায়, শ্রেয়—সে পায় কূল।
যে ল্যায়, প্রেয়—খোয়ায় মূল॥"

কঠোপনিষদ্।
১ম অধ্যায়, ২য় বল্লী।

১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা — ফাল্গুন, ১৩২৯ সাল

গান

গানগুলি মোর শৈবালেরি দল—
ওরা বন্যাধারায় পথ যে হারায়
উদ্দাম চঞ্চল।
ওরা কেনই আসে যায় বা চলে,
অকারণের হাওয়ায় দোলে,
চিহ্ন কিছুই যায় না রেখে
পায় না কোন ফল॥

ওদের সাধন ত নাই
কিছু সাধন ত নাই
ওদের বাঁধন ত নাই
কোন বাঁধন ত নাই।
উদাস ওরা উদাস করে
গৃহ হারা পথের স্বরে,
ভুলে যাওয়ার স্রোতের পরে
করে টলমল॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবীনার প্রতি

শ্রেয়সীর মুখবন্ধে প্রকাশ ছিল, যে, ইহা বঙ্গের নবীনা-গণের মনের ভাব, আশা, আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিতে থাকিবে। ইহা বড়ই আশা ও সুখের কথা কারণ তাঁহাদের উপর দেশের ভবিষ্যৎ বিশেষরূপেই নির্ভর করিতেছে, অথচ এরূপভাবে তাঁহাদের মনের পরিচয় দিবার বা পাইবার কোন আয়োজনই এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

নরনারী কাহারও মধ্যেই নবীনাদের উপদেষ্টাও শাসয়িতার অভাব কোনকালেই নাই, সুতরাং তাহার দল ভারী করিতে সহজে মন সরে না। তবে আজ যাহার জন্য তাঁহাদের সম্মুখীন হইতেছি, তাহা নিছক উপদেশ নয় ;—আর তাঁহাদের সব খারাপ ও আমাদের সবই আদর্শ এমন কথা বলিবার স্পর্দ্ধাও আমাদের নাই। ইহার ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ আমরা যাহা হইতে পাই নাই, চেষ্টা করিয়া পারি নাই, বিলম্বে বুঝিয়া যাহার জন্য চেষ্টাও করিতে পারি নাই, তাহাই যাহাতে তাঁহারা হইতে, করিতে ও প্রথম হইতে বুঝিয়া লইতে, এবং পুরাণের নকল মাত্র না হইয়া সত্যই "নবীনা", নবযুগের আশা আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিতে পারেন, তাহার জন্যই এই নিবেদন।

নবীনার নিকট নবযুগের বা র ব্যাখ্যা করিবার সাহসও আমাদের নাই। সে বাণীর আহ্বান তাঁহার কাছে যেন বিফল না হয়, তাহারই আদর্শ জীবনে গ্রহণ করিয়া চলিতে যেন তাঁহার সাহস হয়, এই আমাদের প্রার্থনা কবিও ঋষির বাণী :—

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।"

তিনিও যেন বলিতে পারেন।

এই মৃত্যু ছিঁড়িতে হবে এই মোহজাল
এই পুঞ্জ পুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জ্জনা। ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাতকালে, এ জাগ্রত ভবে
এই কর্ম্মধামে। দুই নেত্র করি আঁধা
জ্ঞানে বাধা, কর্ম্মে বাধা, গতিপথে বাধা,
আচারে, বিচারে বাধা করি দিয়া দূর
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর
আনন্দে উদার উচ্চ।"

এই তাঁহাদের মন্ত্র হউক। কিন্তু তাই বলিয়া এখনই আপনাদের শিক্ষাসাধনা ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের দেশের কাজে লাগিয়া যাইতে বলাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আপনি 'মানুষ' না হইলে দেশকেই হউক, সন্তানকেই হউক, কাহাকেও কেহ "মানুষ" করিতে পারে না। আপনি "মানুষ" না হইয়া কাহাকেও মানুষ করিবার ভার না লইবার সাহসই যেন তাঁহাদের হয়।

আমাদের অনুরোধ এখন তাঁহারা আপনারাই মানুষ হইতে থাকুন। পূর্ণমানুষ হইতেই হইবে এই তাহাদের সাধনা হউক। তাঁহাদের পথ সহজ নয়, কারণ আমরা তাঁহাদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য করিতে পারি নাই। আমরা নিজে "মানুষ" হইতে পারি নাই, তাই তাঁহাদের "মানুষ" হইবার সুবিধা দিতেও অক্ষম হইয়াছি। তাঁহাদের নিজেদেরই অনেক বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়া "মানুষও" হইতে হইবে আবার ভবিষ্যৎকেও "মানুষ" করিয়া তুলিতে হইবে ; এই দুই বিষম কর্ত্তব্যের ভারই তাঁহাদের উপর পড়িয়াছে। পথ দেখাইতে, সাহায্য করিতে তাঁহাদের কেহ নাই, কিন্তু বাধা দিবার, নিন্দাও নিরুৎসাহ করিবার লোক ও কারণ অসংখ্য। পথ তাঁহাদের আপনিই দেখিয়া ও কাটিয়া লইয়া চলিতে হইবে। দেশ, নেত্রীর অপেক্ষায় আছে, সে অভাবও তাঁহাদেরই পূরণ করিতে হইবে।

অন্যের প্রতি, ভবিষ্যতের প্রতি কর্ত্তব্যের উপদেশও কবির কথায় শ্রাবণের ধারার মতই তাঁহাদের মস্তকে ঝরিয়া

আসিতেছে, সুতরাং তাহার স্রোত আর বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাদের ভয়াকুল করিয়া তুলিতেও প্রবৃত্তি হয় না। কর্ত্তব্যের ভার তাঁহাদের ত আছেই, যে কোন মূল্যবান জীবনেই ত তাহা থাকিবে, কিন্তু তাঁহাদের নিজের প্রতি কর্ত্তব্য সকলের আগে, কারণ তাহাই সকল কর্ত্তব্যের মূলে। তাঁহারা আপনারা আপনাদের স্বরূপে বিকাশ পাইয়া না উঠিলে, অন্যের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্যও কখন সত্য হইতে পারে না। তাঁহারা আপনারাই আগে মুক্ত স্বপ্রকাশ ও সুখী হউন, তাহা হইলে পৃথিবীর পাপদুঃখ, মলিনতা আপনিই তাঁহাদের কাছে দাঁড়াইতে পারিবে না। আপনারা জ্ঞান, মুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিলে তাঁহারা কি অপরকে, বিশেষতঃ আপনাদের সন্তানদের তাহা না দিয়া থাকিতে পারিবেন? সুতরাং তাঁহারা জ্ঞানী, ধনী, মুক্ত ও সুখী হওয়ার অর্থ একসঙ্গে মানবজাতির বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ঐ সকল কাম্যবস্তুলাভ ও তাহার আশা। মানুষের ক্ষুদ্র, সংস্কারান্ধদৃষ্টি এখনও তাহা দেখিতে পাইতেছে না, তাই ইহাও তাঁহাদের পরম দুঃখের মধ্য দিয়া লাভ করিয়া তাহার চক্ষু খুলিতে হইবে।

হৃদয় বেদনায় ভরিয়া উঠে যে, তাঁহাদের যে নবীন যৌবনাবেগ আনন্দের উচ্ছলতায় ভরিয়া ঝরিয়া সম্পূর্ণ হইবার কথা, তাহাকে প্রথম হইতেই এত কঠিন সাধনার জন্য প্রস্তুত করিতে হয়। কিন্তু যুগসন্ধির এই বিষম ভার যেমন তাঁহাদের মস্তকে পড়িয়াছে, ইহার গৌরবও তেমনি তাঁহাদের জন্যই অপেক্ষা করিতেছে।

তাহার পর অন্যের জন্য ও ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাদের জীবনের প্রয়োজনীয়তার কথাই তাঁহারা আবহমানকাল শুনিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাহা যেমন সত্য, এই শব্দরস গন্ধপূর্ণ সসাগর বিচিত্র পৃথিবী, তাহার সকল ধনরত্ন এবং নানা বৈচিত্রপূর্ণ সম্বন্ধযুক্ত এই মনুষ্যসমাজ ও তাহার জ্ঞানকর্ম্ম-ভাণ্ডার ও যে তাঁহাদের জন্য। ইহাও তাহাপেক্ষা কম সত্য নয়। তাঁহারা এ পৃথিবীতে বন্দী ক্রীতদাস নহেন, ইহার সাম্রাজ্ঞী! কথাটীর অনেক অপব্যবহার এ পর্য্যন্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার সত্য অর্থই তাঁহাদের কাছে সার্থক হউক। যুগযুগান্ত ধরিয়া তাঁহাদের এই সাম্রাজ্যে তাঁহারা নাবালিকা মাত্র রহিয়া গিয়া ইহা কুশাসনে, পাপতাপের হাহাকারে ভরিয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ক্রমেই ইহাকে উদ্ধার করাও তাঁহাদেরই উপর নির্ভর করিতেছে।

যথার্থ সবলতার মধ্যে যে কোমলতা ও বিনয়, তাহাই তাঁহাদের অধিগত হউক। Henleyর প্রসিদ্ধ কবিতাটীর কথায় তাঁহারা আপনাপন আত্মার বিচক্ষণ নাবিক হইয়া আপনার অদৃষ্টকেও নিয়মিত করুন। কিন্তু তাঁহার উক্তির অনুযায়ী তাঁহাদের মস্তক যেন নত হইতে ভুলিয়া না যায়। দুঃখ ও বিফলতা যেমন তাঁহাদের অবসন্ন করিতে অসমর্থ হইবে, তাঁহাদের সুখ ও কৃতকার্য্যতার মধ্যেও তেমনি দম্ভের যেন স্থান না হয়। অশ্রুবিগলিত কৃতজ্ঞতায় তাহা পুষ্পিত হউক।

পুরাতনের ছাপমাত্র না হইয়া তাঁহাদের যথার্থই নবীনা হইতে বলা হইয়াছে। কিন্তু পুরাতনের ও তাঁহারা উত্তরাধিকারী, সুতরাং তাহারও সকল সম্পদ তাঁহাদের ভূষণ হউক। তবে তাহা ভূষণই হইবে, শৃঙ্খল নয়।

বঙ্গনারী।

ফাগুন

ফাগুন আমার মনে জ্বালেনি আগুন,
কোনো কথা বলে নাই করিয়া দ্বিগুণ,
সে শুধু চাহিয়াছিল, নীরবে বিজনে,
সে শুধু আঁকিয়াছিল নিরালা নিজনে
সেই তার ছবি,
যে আমার সব ছিল, আজো মোর সবি!
ফাগুন খোলেনি মনে হাসির ফোয়ারা,
সুরের তুবড়ি খেলা রাগিণী পিয়ারা,
সে এল নীরব পায়ে, নীরব কুলায়ে,
কি মন্ত্র পড়িয়া দিল মলয় বুলায়ে,
একখানি নাম,
জেগে জেগে জপি ভোর নিশীথ ত্রিযাম!
মুখ চেয়ে বলে ফুল কোথায় শিশির,
শীতল আঁচল ছায়া কোথায় নিশির?
কিশলয় কচি হাত রাখিয়া কপোলে,
চুপি চুপি তারি নাম কাণে গেল ব'লে
ফুলের সুবাস,
কাঁপিয়া ফেলিল শুধু নিঃশ্বাস উদাস!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

কলাবিদ্যা

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

একথা মানিতেই হইবে যে মানুষ ব্যবহারিক জগতের মধ্যেও তার নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু সেখানে তার আত্ম প্রকাশটা তার গোড়াকার উদ্দেশ্যের বিষয় নয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা অভ্যাসের দ্বারাই প্রধানতঃ চালিত হই বলিয়া আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধে আমরা খুব হিসাবী। প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের আত্ম চৈতন্য খুব নীচের স্তরে নামিয়া পড়ে বলিয়া আমাদের আত্মপ্রকাশ অভ্যস্ত পথেই গড়াইয়া চলে। কিন্তু যে দিন আমাদের হৃদয়, প্রেম কিম্বা অন্য কোন বৃহৎ হৃদয়াবেগে সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া উঠে, তখন আমাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যেন বন্যা বহিয়া যায়। তখন সে প্রকাশের খাতিরেই প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখনি আর্ট দেখা দেয়। তখন প্রয়োজনের দাবী আমরা ভুলিয়া যাই, প্রয়োজনের হিসাব ঘুচিয়া যায়। তখন আমাদিগের মন্দিরের চূড়া আকাশের নক্ষত্রকে চুম্বন করিবার জন্য উদ্যত হয়, এবং আমাদের সঙ্গীতের সুরগুলি অনির্ব্বচনীয়ের অতলস্পর্শ গভীরতাকে স্পর্শ করিবার জন্য চেষ্টা করে। তবেই দেখা যাইতেছে যে প্রয়োজন এবং আত্ম প্রকাশ এই দুই সমান্তরাল ধরিয়া মানুষের শক্তি ধাবিত হইয়া অবশেষে মিলিবার উপক্রম করে। আমাদের ব্যবহারিক বস্তুগুলির চারিদিকে ক্রমাগত নানা অনুবন্ধিতা সূত্রে, ভাবের সৌন্দর্য্য জমিয়া উঠে এবং তারা আত্ম-প্রকাশের জন্য আর্টকে আমন্ত্রণ করিয়া আনে। যেমন ধর একজন যোদ্ধার দম্ভ এবং যুদ্ধপ্রীতি তার কারুখচিত তরবারীতে প্রকাশ পায় কিম্বা

উৎসবের সম্মিলন, সঙ্গীত ও সাজ সজ্জার ভিতর দিয়া আপনাকে ঘোষণা করে।

সাধারণত উকিলের আপিসকে সুন্দর পদার্থ বলা চলে না এবং তার কারণটাও সুস্পষ্ট। কিন্তু নাগরিক বলিয়া মানুষ নিজের মধ্যে একটি গৌরব বোধ করে, সেই জন্য নগরের সৌধমালা তার গঠন সৌষ্ঠবে মানুষের সেই নগর-প্রীতিকে প্রকাশ না করিয়া পারে না। যখন কলিকাতা হইতে দিল্লীতে ইংরাজ রাজধানী সরানো হইল, তখন, দিল্লীর নূতন হর্ম্যাগুলিতে কোন্ স্থাপত্য রীতি অবলম্বিত হইবে সে বিষয়ে একটা সমালোচনা উপস্থিত হয়। কেহ কেহ মোগল বাদশাহী আমলের সৌধ-নির্ম্মাণ প্রণালী সেখানে প্রবর্ত্তিত হওরা উচিত মনে করিয়াছিলেন। আমরা সকলেই জানি যে মোগল ও ভারতীয় প্রতিভার মিলনে সেই স্থাপত্য রীতির উদ্ভব ঘটিয়া ছিল কিন্তু যে কথাটা তাঁরা ভুলিয়া বসিয়া ছিলেন তাহা এই যে, সত্যকার আর্টমাত্রই একটা 'সেন্টিমেন্ট' বা মনের অনুরাগ হইতেই জন্মলাভ করে। মোগল দিল্লি ও মোগল আগ্রা তাহাদের সৌধ রাজির মধ্যে তাহাদের ব্যক্তিত্বকেই প্রকাশ করিতেছে, কেননা মোগল বাদশাহেরা মানুষ ছিলেন তাঁরা ত কেবল মাত্র শাসন কর্ত্তা ছিলেন না। তাঁরা এই ভারতবর্ষেই জীবন যাপন করিয়াছিলেন এবং এই খানেই জীবন লীলা সাঙ্গ করিয়াছিলেন, এই মাটিতেই তাঁহাদের প্রেমলীলা এবং এই মাটিতেই তাহাদের রণলীলা দুয়েরি অভিনয় ঘটিয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের রাজত্বের স্মৃতি কতকগুলি কারখানা ও আপিসের ধ্বংসাবশেষকে আঁকড়িয়া নাই তাহা অমর আর্ট-সৃষ্টিতে চির প্রতিষ্ঠিত। কেবল যে বড় বড় সৌধমালা সেই স্মৃতির সাক্ষ্য বহন করিতেছে তা নয়; কিন্তু চিত্র সঙ্গীত, প্রস্তর এবং ধাতুর কারু-শিল্প এবং পরিচ্ছদাদিও সেই স্মৃতির সাক্ষী। অথচ এদিকে, ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজ সরকার একেবারেই ব্যক্তিত্বহীন একটা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রবদ্ধ প্রণালী মাত্র। সেটা একেবারেই আপিসী জিনিষ এবং মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে নানা সম্বন্ধ স্থাপন করা তার কাজ নয় সে তার যন্ত্রের ব্যবস্থায় নির্দ্দিষ্ট ফলের প্রত্যাশী। সেই জন্য শাসনের ক্ষেত্রেই তার সব প্রকাশ, আর্টের ক্ষেত্রে নয়। আইন, সুদক্ষ শাসন এবং শোষণ এতো আর প্রস্তর হর্ম্ম্যের অপূর্ব্ব মহাকাব্যে মুখর হইয়া উঠিতে পারে না। দুর্ভাগ্য বশতঃ লর্ড লিটন ইংরাজ রাজার নায়েবের পক্ষে যতটা কল্পনা শক্তির প্রয়োজন তার চেয়ে একটু বেশী মাত্রায় ঐ শক্তিটা লাভ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য বাদশাহী আমলের দরবারের নকল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এসব রাজকীয় দরবার বা অনুষ্ঠানও যে আর্টের ব্যাপার। ইহা তো শুধু শক্তির দম্ভপ্রচার নয়; ইহারা তো ফলের হিসাব সূক্ষ্মভাবে গণনা করিতে বসে না। ইহারা বদান্যতার বেহিসাবী আতিশয্যের স্বতোচ্ছ্বসিত প্রকাশ এবং ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য একটি ঐক্যকে অনুভব করা—রাজার প্রজার সম্বন্ধ যে ব্যক্তিগত আদান প্রদানের সম্বন্ধ তাহাই অনুভব করা। সেই আদান প্রদানই এই সকল উৎসবের মূলউৎস। সুতরাং যখনি ইহারা নকল হইয়া দাঁড়ায়, তখন ইহারা উদ্ভট অনাসৃষ্টি হইয়াও দাঁড়ায়।

প্রয়োজনের প্রকাশ এবং হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ যে স্বতন্ত্র তাহা পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ তুলনা করিলেই দেখা যাইতে পারে। যাহা বাহুল্য কিম্বা অলঙ্কার মাত্র সাধারণতঃ পুরুষের পোষাক তাহা বর্জ্জন করিয়া চলে। কিন্তু স্ত্রীলোক শুধু তার পোষাকে নয় তার ব্যবহারেও অলঙ্কারকে স্বভাবতই গ্রহণ করিয়াছে। তার সত্যকার প্রকৃতিকে প্রকাশমান করিতে গেলে তাকে ছবি ও গানের মত হইতে হয়, কেননা পুরুষের চেয়ে সংসারের সঙ্গে স্ত্রীলোকের সম্বন্ধ বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত। শুধু প্রয়োজন হিসাবে তার মূল্য নয় কিন্তু আনন্দ দানের শক্তি হিসাবেই তার আসল মূল্য। এবং সেই কারণেই স্ত্রীলোক শুধু তার কাজকে নয়, তার সমস্ত ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করিবার জন্য অসীম ক্লেশ স্বীকার করে। এই ব্যক্তিত্বকেই প্রকাশ করা আর্টেরও প্রধান উদ্দেশ্য। কোন অবচ্ছিন্ন বা বিশ্লেষণমূলক বস্তুকে প্রকাশ করা তার উদ্দেশ্য নয় বলিয়াই আর্টও ছবি ও গানের

ভাষাকেই অবলম্বন করিয়া থাকে। বোধ হয়, ইহা হইতেই এই ভুল ধারণাটার উৎপত্তি হইয়াছে যে, সৌন্দর্য্যকে জাগাইয়া তোলাই আর্টের উদ্দেশ্য। অথচ সৌন্দর্য্য আর্টের কেবল মাত্র উপরকরণ, তাহা কখনই আর্টের সম্পূর্ণ বা চরম অর্থ নয়।

ইহার ফলে প্রায়ই আমরা দেখি যে, আর্টের আসল জিনিষ প্রকাশের ভঙ্গী, না প্রকাশের বিষয়, ইহা লইয়া একটা তর্ক উঠিয়া পড়ে। এরকম তর্কের আর শেষ নাই, কেননা এ যেন একটা ফুটা পাত্রে জল ঢালার মত। সৌন্দর্য্যই আর্টের বিষয়—এই আইডিয়াই ঐ সকল তর্ক বিতর্কের মূল; অতএব যখন কেবলমাত্র একটা বিষয়ের মধ্যে সৌন্দর্য্যের গুন থাকিতে পারে না, তখন আর্টে ভঙ্গীটাই প্রধান জিনিষ কিনা এ প্রশ্ন স্বভাবতই জাগিয়া উঠে। কিন্তু সত্য কথা এই যে,' বিশ্লেষণের দ্বারা আর্টের আসল জিনিসটা যে কি তাহা আমরা আবিষ্কার করিতে পারিনা: কারণ, আর্টের আদর্শ একটি অখণ্ডতার আদর্শ।

আমাদের খাদ্যের খাদ্য হিসাবে মূল্য স্থির করিতে গেলে তার ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের মধ্যে সেই মূল্য দেখা যাইতে পারে। কিন্তু খাদ্যের স্বাদ হিসাবে মূল্য স্থির করিতে গেলে তাকে ত টুকরা টুকরা করা চলে না, অখণ্ড ভাবেই তখন খাদ্যকে জানিতে হয়। কেবলমাত্র যেটা বিষয় সেটা একটা অবচ্ছিন্ন পদার্থ এবং সেটা বিজ্ঞানের আলোচ্য; কেবলমাত্র যেটা ভঙ্গী সেটাও একটা অবচ্ছিন্ন পদার্থ এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচ্য। কিন্তু যখন বিষয় ও ভঙ্গী অবিচ্ছেদ্য ভাবে মিশিয়া থাকে, তখনি আমাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে তার একটা সুরসঙ্গতি ঘটে। কেননা, আমাদের ব্যক্তিত্বও, এক জটিল ভঙ্গীর ন্যায়। ভাব এবং ভঙ্গী, চিন্তা এবং বস্তু, উদ্দেশ্য এবং কাজ এই সমস্তকেই তার অঙ্গহিসাবে অন্তর্গত করিয়া লইয়াছে।

সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই আর্টের মধ্যে অ্যাবষ্ট্রাক্ট আইডিয়া একেবারে অচল—অন্তত সেখানে প্রবেশ লাভের জন্য তাহাকে ব্যক্তিত্বের ছদ্মমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া উপস্থিত হইতে হয়। এই কারণে কবিতা এমন সব কথা বাছিয়া লয় যারা প্রাণ-রসে সরস। অর্থাৎ সে সকল কথা কোন খবর দেয় না; তারা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্বভাবতই স্থান পাইয়াছে এবং সংসারের হাটে ক্রমাগত ব্যবহারের দ্বারা একেবারে জীর্ণ হইয়া যায় নাই। যেমন ধর, ইংরাজি "consciousness" কথাটা—ইহা এখনো পণ্ডিতী বিদ্যার গুটির আবরণ কাটাইয়া বাহির হইতে পারে নাই—সেইজন্য কবিতায় ইহা প্রায় ব্যবহৃত হয় না। অথচ ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ "চেতনা" কথাটা একটা প্রাণবান্ কথা এবং কাব্যে সর্ব্বদাই এ কথাটার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে ইংরাজি feeling কথা একটা প্রাণবান কথা। কিন্তু তার বাংলা প্রতিশব্দ অনুভূতি কথাটা কবিতায় অচল, কেননা ইহার কেবলমাত্র অর্থই আছে কিন্তু স্বাদ নাই। সেইরূপ বিজ্ঞান ও দর্শনের কতকগুলি তত্ত্বে প্রাণের রং ধরিয়াছে এবং প্রাণের স্বাদ ভরিয়া উঠিয়াছে, আবার কতক-গুলি তত্ত্বে তাহা হয় নাই। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তারা জীবনের রংএ রঞ্জিত ও জীবনের স্বাদে সরস না হইয়া উঠে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আর্টের হিসাবে ঐ সকল তত্ত্ব গুলি অরন্ধিত তরকারির মত ভোজের সময় পাতে দিবার যোগ্য বলিয়া গণ্য হয় না।

ইতিহাস যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানকে নকল করে এবং অবচ্ছিন্ন উপাদান লইয়া কারবার করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে সাহিত্যের এলাকার বাহিরে থাকে। কিন্তু যেখানে ইতিহাস ঘটনার বিবৃতি, সেখানে তাহা বড় বড় মহাকাব্যের পাশে আসন গ্রহণ করিবার যোগ্য। ঐতিহাসিক তথ্যের বিবৃতি এমন একটি যতিতে ছন্দিত হয় যে তাহার ভিতর হইতে যেন ব্যক্তিত্বের আস্বাদ পাওয়া যায়। তার তালগুলি জীবন্ত হৃদয়ের স্পন্দনের মত আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।

কোন গৃহনির্ম্মাতার চিত্রিত ট্রেড্-পঞ্জীতে আমরা যে ছবি দেখি সেটা অবচ্ছিন্ন ছবি, কেননা সেটা কেবল মাত্র একটা বাড়ীর ছবি। সাধারণত সৌন্দর্য্য বলিতে যাহা বুঝায়

এই সকল ছবিতে আমরা সেই জিনিষ দেখিতে পাই বটে। অর্থাৎ পরিমাণের সামঞ্জস্য অথবা গঠন এবং তার অভিপ্রায়ের সুসঙ্গতি দেখিতে পাই। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্বের কোন চিহ্ন পাই না বলিয়াই ইহাকে আর্টের সৃষ্টিরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। মানুষের জগৎ ব্যক্তিত্বকে এই প্রশ্ন জানায়:—"বন্ধু, তুমি কি আমাকে দেখিয়াছ? তুমি কি আমাকে ভাল বাসিয়াছ? আমার সেই-আমিকে ভালবাস কি না জানিতে চাহিতেছি না। যে-আমি তোমাকে ফল শস্য সম্ভাবের দ্বারা পোষণ করি যে-আমির বিধান নিয়মাদি তুমি আবিষ্কার করিয়াছ। কিন্তু আমার সেই-আমাকে কি তুমি ভালবাস যে-আমি ব্যক্তিগত, যে-আমি বিশিষ্ট আমি?"

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রতিমা দেবী।
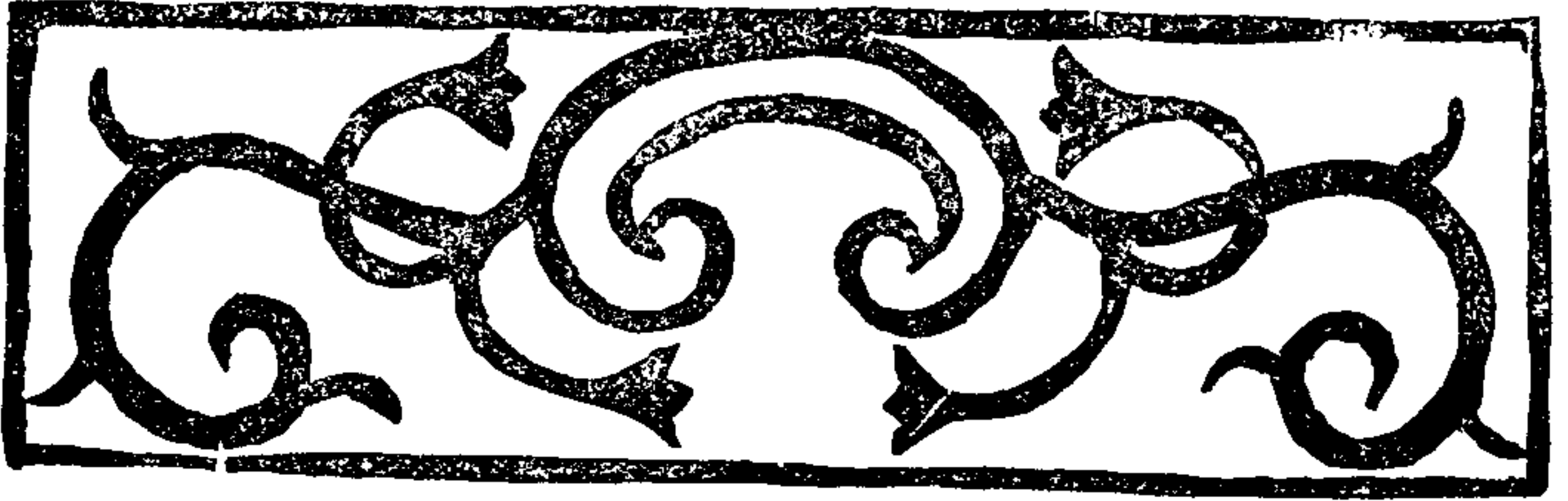
রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

জীবনস্মৃতি—১৩২৯

মার কাছে যশস্বী হইবার প্রলোভন ত্যাগ করা কঠিন, এবং যশ লাভ করাটাও অত্যন্ত দুরূহ নহে।

"——" পৃঃ ৭৪

তাঁহার সেই আত্ম বিসর্জ্জনপর মধুর নম্রতা স্মরণ করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারি স্ত্রীলোকের প্রেমের স্বাভাবিক চরম পরিণাম ভক্তি। যেখানে তাহাদের প্রেম আপনার বিকাশে কোনো বাধা পায় নাই সেখানে তাহা আপনিই পূজায় আসিয়া ঠেকে। যেখানে ভোগবিলাসের আয়োজন প্রচুর, যেখানে আমোদ প্রমোদেই দিনরাত্রিকে আবিল করিয়া রাখে সেখানে এই প্রেমের বিকৃতি ঘটে, সেখানে স্ত্রীপ্রকৃতি আপনার পূর্ণ আনন্দ পায় না।

পৃঃ ১১৮

"——"

কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রী যেমন স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিয়াই স্বামীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে, এদেশে গানও তেমনি বাক্যের অনুবর্ত্তন করিবার ভার লইয়া বাক্যকে ছাড়াইয়া যায়।

জাপানযাত্রী—১৩২৩

আধুনিক বাঙালীর ঘরে মাঝে মাঝে খুব ফ্যাশানওয়ালা মেয়ে দেখ্‌তে পাই; তারা খুব গট্ গট্ করে চলে, খুব চট্‌পট্ করে ইংরেজি কয়—দেখে মস্ত একটা অভাব মনে বাজে, মনে হয় ফ্যাশানটাকেই বড় করে দেখ্‌চি; বাঙালীর মেয়েটিকে নয়; এমন সময় হঠাৎ ফ্যাশান-জালমুক্ত সরল সুন্দর বাঙালী ঘরের কল্যাণীকে দেখ্‌লে তখনি বুঝিতে পারি এত মরীচিকা নয়, স্বচ্ছগভীর সরোবরের মত এর

মধ্যে একটি তৃষাহরণ পূর্ণতা আপন পদ্মবনের পাড়টি নিয়ে টলমল করচে।

পৃঃ ২৬

"——"

লোকের কাছে শুনতে পাই, এখানকার পুরুষেরা অলস ও আরামপ্রিয়; অন্য দেশের পুরুষের কাজ প্রায় সমস্তই এখানে মেয়েরা করে থাকে। হঠাৎ মনে আসে এটা বুঝি মেয়েদের উপরে জুলুম করা হয়েচে। কিন্তু ফলে ত তার উল্টোই দেখ্‌তে পাচ্চি এই কাজ কর্ম্মের হিল্লোলে মেয়েরা আরো যেন বেশি করে বিকশিত হয়ে উঠেচে। কেবল বাইরে বেরতে পারাই যে মুক্তি তা' নয়, অবাধে কাজ করতে পাওয়া মানুষের পক্ষে তার চেয়ে বড় মুক্তি।

পৃঃ ২৮

"——"

রমণীর লাবণ্যে যেমন তারা প্রেয়সী, শক্তির মুক্তি গৌরবে তেমনি তারা মহীয়সী। কাজেই যে মেয়েদের যথার্থ শ্রী দেয়, সাঁওতাল মেয়েদের দেখে তা আমি প্রথম বুঝ্‌তে পেরেছিলুম। তারা কঠিন পরিশ্রম করে—কিন্তু কারিগর যেমন কঠিন আঘাতে মূর্ত্তিটিকে সুব্যক্ত করে তোলে' তেমনি এই পরিশ্রমের আঘাতেই এই সাঁওতাল মেয়েদের দেহ এমনি নিটোল এমন সুব্যক্ত হয়ে ওঠে, তাদের সকল প্রকার গতি ভঙ্গীতে এমন একটা মুক্তির মহিমা প্রকাশ পায়।

পৃঃ ২৯

"——"

মানুষের মন বোঝা এবং মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করা স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ এই মেয়েটির মধ্যে আমরাই তার পরিচয় পেয়েছি। তার পরে কর্ম্মকুশলতা মেয়েদের স্বভাবিক। পুরুষ স্বভাবতঃ কুড়ে, দায়ে পড়ে তাদের কাজ করতে হয়। মেয়েদের একটা প্রাণের প্রাচুর্য্য আছে, যার স্বাভাবিক বিকাশ হচ্ছে কর্ম্মপরতা। কর্ম্মের সমস্ত খুঁটি-নাটি যে কেবল ওরা সহ্য করতে পারে তা নয়—তাতে ওরা আনন্দ পায়। তা ছাড়া দেনা পাওনা সম্বন্ধে ওরা সাবধানী। এই জন্যে যে সব কাজে দৈহিক বা মানসিক সাহসিকতার দরকার হয় না, সে সব কাজে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে ঢের ভাল করতে পারে, এই আমার বিশ্বাস। স্বামী যেখানে সংসার ছারখার করেচে, সেখানে স্বামীর অবর্ত্তমানে স্ত্রীর হাতে সংসার পড়ে সমস্ত সুশৃঙ্খলায় রক্ষা পেয়েচে, আমাদের দেশে তার বিস্তর প্রমাণ আছে·········· যে সব কাজে উদ্ভাবনার দরকার, সেই যে সব কাজে পটুতা, পরিশ্রম, ও লোকের সঙ্গে ব্যবহারই সবচেয়ে দরকার, সে সব কাজ মেয়েদের।

পৃঃ ৫৩

"——"

আমি আমার অভ্যাসবশতঃ ভোরে উঠে জানালার বাইরে চেয়ে দেখলুম, প্রতিবেশীদের বাড়ীতে ঘরকন্নার হিল্লোল। ঘরে ঘরে এই মেয়েদের কাজ এমন বিচিত্র বৃহৎ এবং প্রবল করে সচরাচর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। কিন্তু এটা দেখ্‌লেই বোঝা যায় এমন স্বাভাবিক আর কিছুই নেই। দেহযাত্রা জিনিসটার ভার আদি থেকে অন্ত পর্য্যন্ত মেয়েদেরই হাতে এই দেহযাত্রার উদ্যোগ মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সুন্দর। কাজের এই নিয়ত তৎপরতায় মেয়েদের স্বভাব যথার্থ মুক্তি পায় বলে শ্রীলাভ করে। বিলাসের জড়তায় কিম্বা যে কারণেই হোক্, মেয়েরা যেখানে এই কর্ম্মপরতা থেকে বঞ্চিত সেখানে তাদের বিকার উপস্থিত হয়, তাদের দেহ মনের সৌন্দর্য্য হানি হতে থাকে, এবং তাদের যথার্থ আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে।

* * * *

মাঝে মাঝে পাশের ঘর থেকে এদের গলার আওয়াজ এবং হাসির শব্দ শুনতে পাচ্চি, আর মনে মনে ভাবচি মেয়েদের কথা এবং হাসি সকল দেশেই সমান। অর্থাৎ সে যেন স্রোতের জলের উপরকার আলোর মত একটা ঝিকিমিকি ব্যাপার, জীবন চাঞ্চল্যের অহেতুক লীলা।

পৃঃ ৭৫

"——"

এই জন্যে জাপানের সহরের রাস্তায় বেরলেই প্রধানভাবে

চোখে পড়ে জাপানের মেয়েরা। তখন বুঝতে পারি এরাই জাপানের ঘর, জাপানের দেশ। কারো কারো কাছে শুনতে পাই, জাপানের মেয়েরা এখানকার পুরুষের কাছ থেকে সম্মান পায় না। সে কথা স·্য কি মিথ্যা জানিনে, কিন্তু একটা সম্মান আছে সেটা বাইরে থেকে দেওয়া নয়—সেটা নিজের ভিতরকার। এখানকার মেয়েরাই জাপানের বেশে জাপানের সম্মান রক্ষার ভার নিয়েচে। ওরা দরকারকেই সকলের চেয়ে বড় করে খাতির করে, নি, সেইজন্যেই ওরা নয়ন মনের আনন্দ। পৃঃ ৮০

"———"

এখানে মেয়েদের কাপড়ের মধ্যে নিজেকে স্ত্রীলোক বলে বিজ্ঞাপন দেবার কিছুমাত্র চেষ্টা নেই। প্রায় সর্ব্বত্রই মেয়েদের বেশের মধ্যে এমন কিছু ভঙ্গী থাকে, যাতে বোঝা যায় তারা বিশেষভাবে পুরুষের মোহ দৃষ্টির প্রতি দাবী রেখেচে। এখানকার মেয়েদের কাপড় সুন্দর, কিন্তু সে কাপড়ে দেহের পরিচয়কে দেখাবার কোনো ইঙ্গিত নেই।

শ্রীরমা দেবী

ক্ষণিকা

আমাদের দেশের প্রকৃতিতে বসন্তের প্রাদুর্ভাব বড় কম, সে আসে আর যায়, অশোক ফুটে ওঠে, আবীরের ছড়াছড়ি পড়ে যায়, বাঁশী বাজতে থাকে, তবে সে কদিনের জন্যে? হয় এক পক্ষ হয়ত দিন বিশেকের মত! তাই হোরির আমোদটায় একটু-বাড়াবাড়ি, কিছু অধিক চেঁচাচেঁচি শোনা যায়। যা ফুরিয়ে যাবার ভয়ে ভঙ্গুর যা ক্ষণিকের আনন্দে স্বপ্নময় তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, মাঝে হতে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। বাকী থাকে শ্রান্তি, গ্লানি, দীর্ঘ জাগরণের রাঙা চোখ আর ভাঙ্গা গলা!

* * * *

শীতের পরে রুদ্ধ প্রকৃতি যখন প্রথম ছাড়া পায়, তখন আমরা দোল পূর্ণিমায় মহা উৎসাহে ফাগ খেলি, তারপর গ্রীষ্ম যায়, বর্ষা গত হয়, শ্রাবণের শেষ পূর্ণিমায়, নীরবে হাত বাড়িয়ে এক এক খানি রাখী পরি।

বসন্তের দিনে যাদের সঙ্গে আবীর খেলি, তাদের সঙ্গে হয় কোন সম্বন্ধ থাকে না নয় তো কৌতুকের সম্পর্ক, আর যে রং গায়ে ছড়িয়ে দি' তা ঝরে ঝরে পড়ে যায়, বা কুম্ কুম্ ছুঁড়ে মারি তারো দাগ বড় বেশী দিন থাকে না, শুধু ধুয়ে ফেলতে যা দেরী, কিন্তু বর্ষার দিনে যাঁর হতে রাখী বেঁধে দি, তার সঙ্গে বড় একটি পবিত্র মধুর সম্বন্ধের স্থাপনা হয়—তিনি আমাদের রাখী-ভাই রাঙারেশমের সুকুমার বাঁধনটি খুলে ফেলে দিলেও, সে সম্বন্ধ ঘোচে না। রাজপুতনায় রাখী-ভাই তাঁর বোনের চির-জীবনের আর্ত্ত সহায়!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

শিক্ষা কাহাকে বলে

(Miss Flaumএর Lectureএর অনুবাদ।)

সকল গৃহের আর বিদ্যালয়েরই প্রধান কাজ হল শিশু পালন করা, আর সেই শিশুকে যত ভাল করে গড়ে তোলা হবে, তার শরীর যতই সুস্থ সবল হবে, তার বুদ্ধি যতই সজ্জিত হবে, তার চিত্ত যতই সরল ও মধুর হবে মানব সমাজের পক্ষে সেটা ততই মঙ্গল। শিশুকে এমনি ভাল করে গড়ে তুলতে তার স্বভাব তার প্রয়োজন ও তার চিত্তের

ক্রমবিকাশ ভাল করে পর্যাবেক্ষণ করা দরকার, ও তার সঙ্গে অন্তরে অন্তরে গভীর সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন।

এমন কোনই শিশু নেই যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। তারা সকলেই বেশ ভাল করে শিক্ষা গ্রহণে সফল হতে পারে ও তাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। গৃহ আর বিদ্যালয় এই দুটী স্থানেই তারা তাদের শিক্ষা লাভ করে।

শিক্ষার মুখ্য লক্ষ্য হল তিনটী—সুস্থ, কর্মঠ ও সুন্দর শরীর, বুদ্ধিতে উজ্জল ও সহানুভূতিতে কোমল মন, ও মধুর শ্রদ্ধা নম্র চিত্ত।

যে গৃহে বা বিদ্যালয়ে এই ফল পাওয়া যায় সেই হল যথার্থ শিক্ষার ক্ষেত্র, আর যেখানে এই ফল পাওয়া যায় না সে যতই শিক্ষার ভাণ্ডার হউক না কেন সে কখনই যথার্থ শিক্ষা ক্ষেত্র নয়।

শিক্ষা বলিতে বিশেষ কোনও একটা বিষয় বোঝায় না, শিক্ষা বলিতে বোঝায় নিজের বিশেষ ক্ষমতাটীকে লক্ষ্য করিয়া বাইরের কার্য্যক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ করা। বর্ত্তমান যুগের মা বা শিক্ষয়িত্রীর প্রধান উদ্দেশ্য হল এই যে তাঁরা শিশুর বুদ্ধির গতির অনুসারে ও প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসারে তাদের চালনা করেন। ভিন্ন ভিন্ন শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন রূপে সৃজন করবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রকাশ দেখা যায়। তাদের প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসারে চালনা করবার জন্য বর্ত্তমান যুগের মা বা শিক্ষয়িত্রী তাদের পছন্দ আর অপছন্দ মন দিয়া লক্ষ্য করেন। যে কোনও বস্তুর প্রতি তাদের মনের ভাব লক্ষ্য করে তিনি তার প্রকৃতির প্রয়োজনের অনুসারে তাকে চালনা করেন।

এই ভাবে শিশুকে চালনা করলে তার পর্য্যাবেক্ষনের শক্তি গঠিত হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে তার সাধারণ জ্ঞানও বাড়িতে থাকে। যারা শিশুদের নিয়ে কোনও কাজ করতে চায় তাদের প্রকৃতি প্রফুল্ল আর সজীব হওয়া উচিত। তার মনোরঞ্জনের ক্ষমতা থাকা দরকার আর সব চেয়ে দরকার হল তাদের 'একাই একশো' হওয়া। সেই শিক্ষয়িত্রীরই ক্ষমতা সব চেয়ে বেশী যিনি শৈশবে নিজের মনের ভাব কি রকম ছিল স্মরণ করে তাদের সঙ্গে সমান হতে পারেন। শিক্ষয়িত্রীর শিশুর দোষ ধরতে তৎপর হওয়া উচিত নয়, বরং যেখানে সামান্য কিছু প্রশংসা করবার আছে সেখানে প্রশংসা করতেই তৎপর হওয়া উচিত। তাঁর উচিত হল যে তিনি তাদের সঙ্গে খেলা করবেন তাদের চালনা করবেন্ অথচ সেই সঙ্গেই প্রত্যেক শিশুর স্বভাবের বিশেষত্বটী লক্ষ্য করে যাবেন, কিন্তু শিশুরা যেন টের না পায় যে তাদের এত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করা হচ্ছে, কারণ এই কথা জান্তে পারলেই তাদের কাজ আর স্বাভাবিক থাকে না, কৃত্রিম হয়ে পড়ে।

শিশুদের মা বা শিক্ষয়িত্রী যদি সকল শিশুর সাহায্য করতে চান্ তাহলে তাঁর একটা জিনিষ জানা দরকার। তাঁর মানুষের প্রকৃতি চেনবার ক্ষমতা থাকা দরকার যাতে তিনি মানুষের মুখ দেখে মনের কথা ধরতে পারেন—অর্থাৎ এক কথায় তাঁর মনস্তত্ত্ববিৎ হওয়া দরকার। শিশুর মনের আদর্শটীকে কাজে ফুটিয়ে তোলার ও তাদের কাজে একটা আগ্রহ জাগিয়ে তোলার সাহায্য করাই হল তার কাজ।

শিশুদের মা বা শিক্ষয়িত্রী যেন ইংলণ্ডে বা জার্ম্মানীতে লেখা বইয়ের অনুসারে তাদের শিক্ষা না দেন। সেই সব দেশের শিক্ষা আমাদের দেশের ছাঁচে ফেলে বদলে নিতে হবে।

ভারতবর্ষে নানারকমের পশু পক্ষী আর গাছ আছে এ দেশের শিশুদের লক্ষ্য করবার অনেক বিষয় আছে, তাই ভারতবর্ষের শিশুশিক্ষার ক্লাস যেমন সহজে খোলা যায় এমন আর কোথায়ও নয়। শিশুদের শিক্ষার কারখানা ঘরে কিছু মূল্যবান যন্ত্রপাতির দরকার হয় না। তালপাতা, কাদা কাঠ ইত্যাদি ভারতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, এই সব রঙীন কাগজ ইত্যাদির পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যায়। বিদেশ থেকে কোনও জিনিস আনাবার প্রয়োজন নাই। অতি অল্প দামের সামগ্রী ব্যবহার করা উচিত। যদি সমান বুদ্ধির দুটী ছেলের মধ্যে একটিকে কাজের মধ্যে দিয়ে আর একটীকে শুধু জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে শেখানো হয় তাহলে অতি অল্পদিনের

মধ্যেই আমরা দেখ্‌তে পাই যে প্রথমটী দ্বিতীয়টীর চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর হয়েছে। কারণ প্রথম শিক্ষাটী তার নিজের অনুভূতি আর সৃজনীশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

যদি প্রত্যেক শিশুকে তার সৃজন করবার প্রবৃত্তি অনুসারে চালনা করা হয় তাহলে সে বুঝবে কেন সে এ সংসারে এসেছে, আর কোন কাজটী করলে সে বড় হবে। শিশুটীকে যদি তার সৃজনশক্তি আর বুদ্ধির অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হয় তা হলেই সে বুঝতে পারে যে তার চারধারে যে সকল জিনিস ছড়ান আছে, সেগুলি কেন আর কোথা থেকে এসেছে। তাহলে শিশুটী তার নিজের কাজের উপর নির্ভর করে, আর স্বাধীনভাবে চিন্তা করে ও চিন্তার প্রকাশ করে।

এই স্থানের শিশুদের অনুভূতি আর সৃজনীশক্তির অনুসারে শিক্ষা দেওয়া আর তাদের প্রত্যেকের মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি লক্ষ্য করা উচিত ও তাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার আয়োজন করা উচিত।

আজকাল সব আধুনিক স্কুলের শিক্ষার মধ্যে হাতের কাজের ব্যবস্থা থাকে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে আর প্রত্যেক গৃহেই একটী করে কারখানা ঘর থাকা উচিত আর সেখানে শিশুদের হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া উচিত।

শ্রীআশা দেবী

রাখাল ছেলে

এক রাখাল ছেলে আছে। সে এখন একদিন বলছে মা আমি পিঠে খাব। তাই শুনে তার মা পিঠে করে তাকে খেতে দিয়েচে। সে হাতে করে দুখানি পিঠে নিয়ে এসেচে, এসে মাঠে গর্ত্ত খুঁড়েপিঠে দুখানিকে পুঁতেচে। পুঁতে বল্‌চে—

পিটে কাল যদি তুমি না কলা বেরোও তাহলে তোমাকে মামাদের কোদাল এনে তুলে ফেল্‌বো।

এই বলে, সে বাড়ী চলে গেল।

সকালবেলা এসে দেখে কি পিটে গাছের কলা বেরিয়েচে।

তাই দেখে সে খুসী হয়ে বল্‌লে—

পিটে কাল যদি তুমি না পাতা বেরোও তাহলে তোমাকে মামাদের কোদাল এনে তুলে ফেলে দেব।

এই বলে সে বাড়ী চলে গেল। সকালবেলা এসে দেখে কি পিটে গাছের পাতা বেরিয়েচে।

তাই দেখে খুসী হয়ে বল্‌লে—

পিটে কাল যদি তুমি না বড় হও তাহলে মামাদের কোদাল এনে তোমাকে তুলে ফেলে দেব।

এই বলে সে বাড়ী চলে গেল। সকাল বেলা এসে দেখে কি মস্ত বড় এক পিটে গাছ হয়ে রয়েচে। তাই দেখে খুসী হয়ে সে বল্‌লে—কাল যদি না তুমি পিটে হওতো তোমাকে মামাদের কোদাল এনে তুলে ফেল্‌বো।

সকালে এসে সে দেখে গাছভরা পিটে হয়ে রয়েচে।

এক ডালে সরুচুক্লি, একডালে আস্কে, একডালে সেদ্ধ পিটে, একডালে ভাজা পিটে, একডালে রসবড়া।

রাখাল ছেলে আপনার করেচে কি একমালা গুড় নিয়েচে নিয়ে গাছে বসে পিটে খাচ্চে।

এমন সময় এক বুড়ি এসে বল্‌লে বাবা আমায় একটা পিটে দেনা ?

রাখাল ছেলে বল্‌লে হাত পাত্‌
বুড়ি বল্‌লে হাত পুড়ে যাবে।
রাখাল ছেলে বল্‌লে তবে পা পাত্‌
বুড়ি বল্‌লে পা—পুড়ে যাবে।
রাখাল ছেলে—বল্‌লে মাটিতে দিই
বুড়ি বল্‌লে—পিঁপড়েয় খাবে।
রাখাল ছেলে বল্‌লে—তবে তোর মাথায় দি
বুড়ি বল্‌লে—উকুনে খাবে।
রাখাল ছেলে বল্‌লে তবে কোথায় দেব ?

বুড়ি বল্‌লে বাবা আমার ঝোলার ভেতর দে।

রাখাল ছেলে যেমন তার ঝুলির ভেতর পিটে দিতে গেছে অমনি বুড়ি তার ঘাড়মোড় মুচুড়ে তাকে ঝুলির মধ্যে পুরে নিলে। নিয়ে যেতে যেতে বুড়ির খুব জল তেষ্টা পেয়েচে। সে একটা পুকুর পাড়ে ঝুলিটা রেখে জল খেতে গেল। রাখাল ছেলে ঝুলির ভেতর থেকে বেরিয়েছে – বেরিয়ে তার ভেতর ইঁট পাটকেল পুরে একটা হুঁকোর খোলে করে একটু জল রেখে দিয়ে পালিয়ে গেল।

বুড়ি জল খেয়ে এসে ঝুলি কাঁধে করে চলেচে চল্‌তে চল্‌তে হুঁকোর জল বুড়ির গায়ে পড়্‌চে—সে বল্‌চে তুই কাঁদচিস্? এখন হয়েচে কি, তোকে আগে নিয়ে যাই নিয়ে গিয়ে জব্দ করবো। এই বলে বুড়ি ঝুলি নিয়ে বাড়ী গেল। গিয়ে বউকে ডেকে বল্‌লে ও বউ কি শিকার করে এনেচি আগে দেখ্। বউ এসে ঝুলি খুলতেই দেখে ইঁট পাটকেল। বুড়ি তাই দেখে বল্‌লে এ্যাঁ, আমি জল খেতে গিয়েছিলাম সেই সময়েই বেটা পালিয়েচে। দাঁড়াও আবার তাকে ধরে নিয়ে আসচি। এই বলে বুড়ি চলে গেল।

এদিকে রাখাল ছেলে আবার পিটে গাছে উঠে মজা করে পিটে খাচ্চে। বুড়ি পিটে গাছের তলায় গিয়ে বল্‌চে ওরে বাবা আমাকে একটা পিটে দেনা?

রাখাল ছেলে বল্‌লে দূর বুড়ি তুই আমাকে ধরে নিয়ে গিছ্‌লি না?

বুড়ি বল্‌লে—না বাবা, আমি নয়।

রাখাল ছেলে বল্‌লে—তবে হাত পাত

হাত পুড়ে যাবে
পা পাত্
পা পুড়ে যাবে
মাটিতে দিই
পিঁড়্‌ড়েয় খাবে
মাথায় দিই
উকুনে খাবে।

রাখাল ছেলে বল্‌লে তবে কোথায় দেব?

বুড়ি বল্‌লে আমার ঝুলির ভেতর দে।

রাখাল ছেলে বল্‌লে হাঁ, আবার আমায় ধরে নিয়ে যা?

বুড়ি বল্‌লে—না বাবা আমি তোকে ধরবো কেন?

রাখাল ছেলে যেমনি ঝুলির ভেতর পিটে দিতে যাবে কি অমনি বুড়ি তাকে ধরে তার ঘাড়মোড় মুচুড়ে তাকে ঝুলির মধ্যে পুরে নিলে।

এবারে সে আর কোথাও থাম্‌লে না।

বাড়ী গিয়ে বউকে বল্‌লে ও বউ এবার এনেচি এই নে।

বউ ঝুলি খুলে দেখে খাসা একটি ছেলে।

বুড়ি বল্‌লে—তুই বেশ করে ঢেঁকি পেড়ে কেটে কুটে একে রাঁধ্, আমি তোর বাপের বাড়ী নেমন্তন্ন করে আসি। এই বলে বুড়ি চলে গেল।

বউ যেমন ঢেঁকি পেড়ে রাখাল ছেলেকে কুট্‌তে যাবে কি অমনি সে ফিক্ করে হেসে ফেলেচে।

বউ বল্‌লে হাঁ, গা তোমার ও রকম দাঁত কি করে হোল? আমাকে ঐ রকম করে দাও না?

রাখাল ছেলে বল্‌লে তবে তুমি ঢেঁকিতে শোও। বউ গয়নাগুলো খুলে রেখে যেমন ঢেঁকির তলায় শুয়েচে অমনি রাখাল ছেলে ঢেঁকিতে করে তাকে কুটে ফেলেচে। কুটে এক গা গয়না পরে বউ সেজে বেশ করে তাকে রেঁধেচে রেঁধে বসে আছে।

বুড়ি বউয়ের বাপের বাড়ীর সকলকে নেমন্তন্ন করে এনেচে, এনে বল্‌লে ও বউ তুমি এবার পরিবেশন কর।

রাখাল ছেলে ঘোমটা দিয়ে সকলকে পরিবেশন করে খাওয়ালে। খাইয়ে দাইয়ে বসে আছে। বুড়ী বল্‌লে বউ যাও তুমি পুকুরে গিয়ে নেয়ে এসো। রাখাল ছেলে একটা ঘড়া নিয়ে ভাস্‌তে ভাস্‌তে পুকুরের ওপারে গিয়ে গয়নাগুলো কাপড়ে বেঁধে বল্‌চে—

ও বুড়ি তোর বউ তোকে খাইয়ে
এই দেখ মোর কলা।

বুড়ি তাড়াতাড়ি পুকুর পারে ছুটে এসে দেখে সত্যিই তো রাখাল ছেলে ওপারে বউএর গয়নাগাটি নিয়ে পালিয়ে গেল।

তখন সে হায় হায় করতে লাগলো। আর রাখাল ছেলে মজা করে পিটে গাছে উঠে আবার পিটে খেতে লাগ্‌লো।

Printed & Published by Jagadananda Roy, at the Santiniketan Press, Santiniketan.